

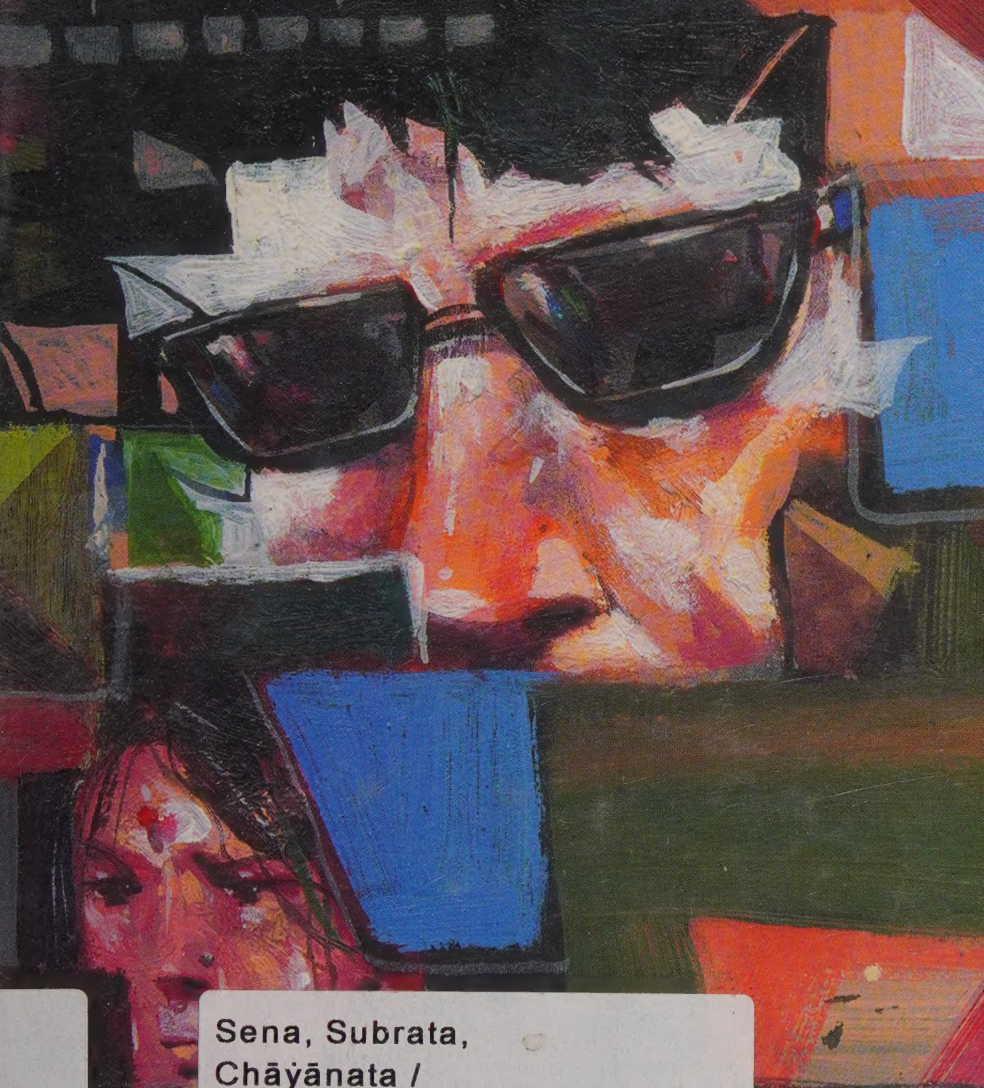
TORONTO PUBLIC LIBRARY



37131 168 128 338
PL Parliament Street

সেন

চায়ানাট



Sena, Subrata,
Chāyānaṭa /

জটিল এক গোলোকধাঁধা!

সফল অভিনেতা অরিন্দম আর
নন্দিতার সুখী পরিবারে একমাত্র
হতাশা—সন্তানহীনতা।

নন্দিতার বাবা রাজনীতিক শঙ্করলাল।
স্বামীর মৃত্যুর পরে বিজ্ঞানী দেবারতির
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
দেবারতির মেয়ে তিতির। মায়ের
ওপর তিতিবিরক্ত।

গ্ল্যামার-দুনিয়ায় ঢুকে পড়ল তিতির,
জড়িয়ে পড়ল অসৎ সঙ্গে। কাজ
জুটিয়ে নিয়েছে অরিন্দমের প্রোডাকশন
কোম্পানিতে।...

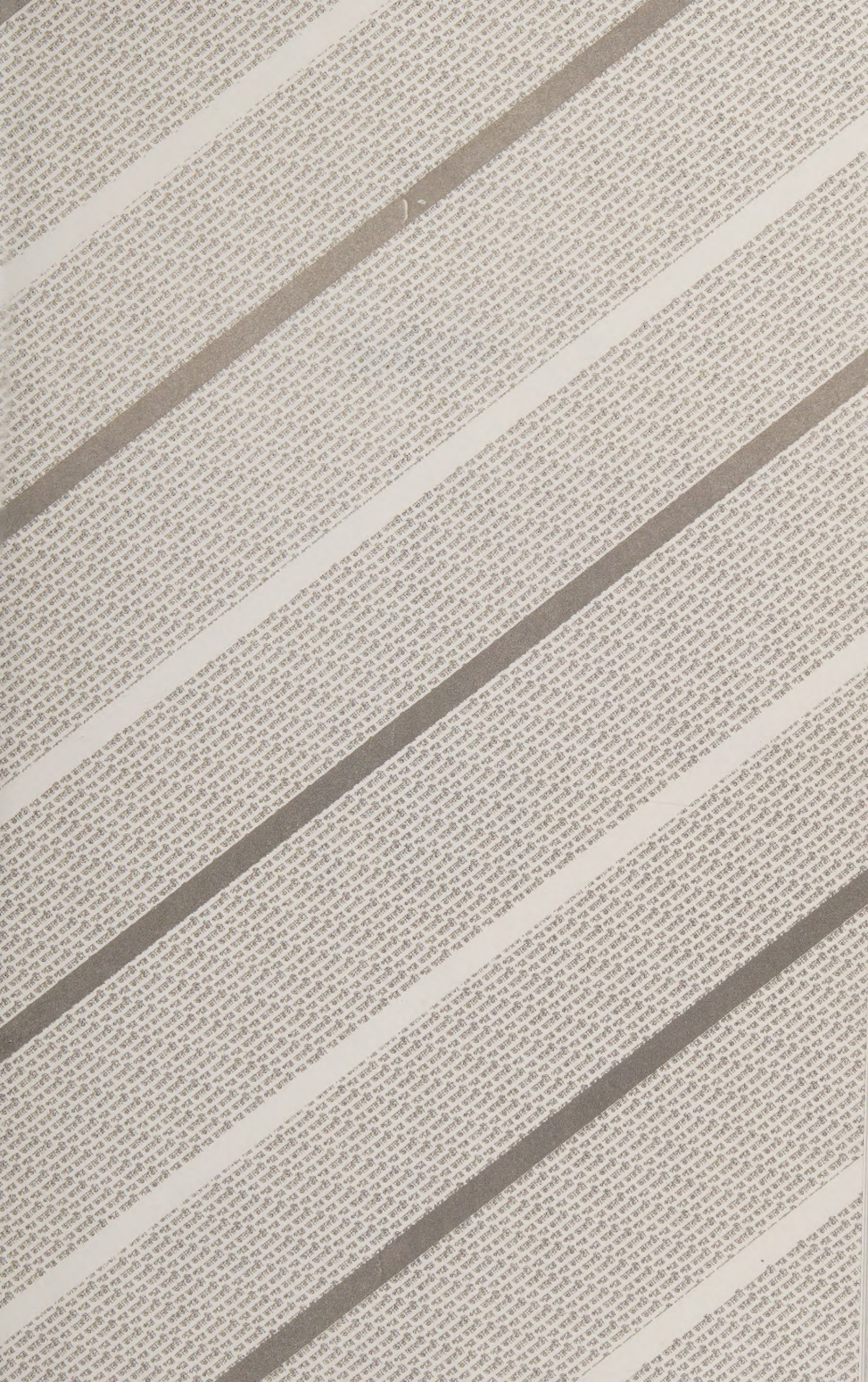
অরিন্দম ভুগছে আইডেন্টিটি
ক্রাইসিসে...

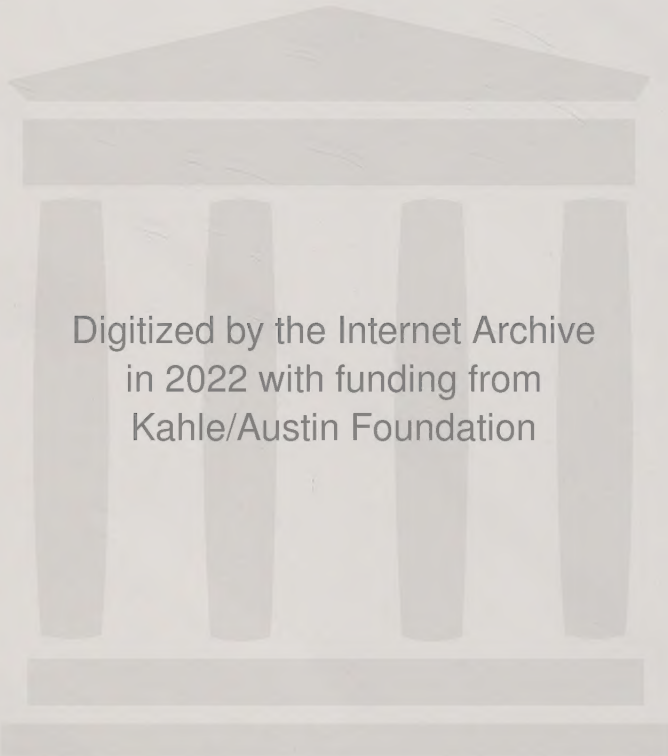
তার কাছে ক্রমেই টার্গেট হয়ে উঠছে
যুবতী তিতির...

হাতছানি দিচ্ছে নিষিদ্ধ জগৎ!

তারপর?...

‘ছায়ানট’ রোম্যান্টিক থ্রিলারে পাওয়া
গেল শেষ উত্তর! সিনেমার মানুষ
টানটান কলমে লিখেছেন এক
অনবদ্য উপন্যাস।





Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

ছায়ানট

TITLE : Chāyāṇaṭa /

AUTHOR STAT : Subrata Sena.

IMPRINT : Kalakātā : Patra Bhārati, 2014

NATURE SCOPE : Novel.

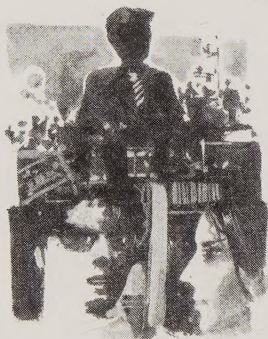
LANGUAGE : In Bengali.

OCOLC#879633388

DKBEN-7943

সুব্রত সেন

ছায়াানট



পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

CHHAYANOT

by

Subrata Sen

ISBN 978-81-8374-261-0

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

শুভ্রনীল ঘোষ

মূল্য

১৭৫.০০

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com

visit us at [www.facebook.com/ Patra Bharati](http://www.facebook.com/PatraBharati)

Price ₹ 175.00

.....
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিদিশা ও সুদীপ্ত সেনগুপ্ত-কে

এই উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা, এর প্রেক্ষাপট আমার কর্মক্ষেত্র। সিনেমা জগতে কাজ করতে এসে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর একটা নতুন বৃত্ত তৈরি হয়। চেনা-জানা হয় অনেক ধরনের চরিত্রের সঙ্গে, যাদের পাদপ্রদীপের আলোয় অন্যরকম দেখায়। এই চরিত্রগুলো সেই আদলে তৈরি, যদিও সব চরিত্র আসলে কাল্পনিক, গল্পের বুনোটও কল্পনা।

কিছু মানুষ চলচ্চিত্র জগতে আসে গ্ল্যামারের হাতছানিতে। কারণ, বাইরে থেকে এই গ্ল্যামারের মোহ সাংঘাতিক, এর দুর্নিবার আকর্ষণ রোধ করা অসম্ভব। যারা আসে, তাদের বেশিরভাগই হারিয়ে যায়। না বুঝে এই গ্ল্যামার জগতের মায়ায় পড়ে জড়িয়ে পড়ে অন্য অনেক কিছুতে। এইরকম একটি চরিত্রই এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। উপন্যাসটি লেখার সময়ে মানুষের এই গ্ল্যামারের প্রতি আকর্ষণ, না বুঝে নিষিদ্ধ অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, এই সমস্ত কিছুই আমার মাথায় ছিল।

উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সানন্দা’ পত্রিকাতে। সেই সময়ে অনেক মানুষের কাছ থেকে অনেক ফোন পেয়েছি। অনেকেরই উপন্যাসটি ভালো লেগেছিল। ওই সময়ে যাঁরা আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষ করে কৃতজ্ঞ পত্র ভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, তিনি পুস্তকাকারে আমার উপন্যাসটি বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়।

এর পর বাকিটা পাঠকদের হাতে। তাঁদের সকলের আমার লেখা ভালো লাগলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।



এককোণে চুপ করে একা দাঁড়িয়ে ছিল নন্দিতা। তার হাতে একটা লম্বা গ্লাস, সেই গ্লাসের মধ্যে কমলা রঙের একটা পানীয়। সেই গ্লাস থেকে একটু-একটু করে নন্দিতা চুমুক দিচ্ছিল, আর অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছিল পার্টিতে আগত সুবেশিত হাস্যমুখর মানুষগুলোর দিকে।

নন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে পার্টিতে সমাগত মানুষগুলোর থেকে একটু দূরে, ছট করে তাকে চোখে পড়বে না কারও। নন্দিতা কিন্তু পার্টির সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কী করে প্রত্যেকে একটু-একটু করে প্রগল্ভ হয়ে উঠছে। নন্দিতার দৃষ্টি স্বচ্ছ, তার কারণ হাতের গ্লাসটাকে দেখতে মদের গ্লাসের মতো হলেও তাতে আসলে মদ নেই। শুধুই অরেঞ্জ জুস আছে গ্লাসের মধ্যে। পার্টিতে এলে হাতে একটা গ্লাস রাখাটা দস্তুর, সে-কারণে নন্দিতা ভদ্রতার খাতিরে বার-কাউন্টার থেকে জুস ভরতি গ্লাসটা নিয়ে রেখেছে। শূন্য হাতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াতে নেই, তা হলেই লোকে এগিয়ে এসে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করে দেবে।

একটু দূরে অরিন্দমকে দেখতে পাচ্ছে নন্দিতা। অরিন্দম আজ একটা সুট পরেছে, সেইসঙ্গে লাল রঙের সিল্কের টাই। অরিন্দম বাঙালিদের স্ট্যাভার্ডে বেশ লম্বা, তার মুখটা বাঙালি সমাজে যথেষ্ট পরিচিত, তার দিকে যে-কোনও মানুষের চোখ পড়তে বাধ্য। অরিন্দম খুব ফরসা নয়, তবু তার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া মুশকিল, তার চেহারায় এমনই এক স্বকীয়তা আছে।

নন্দিতা এমনিতে পার্টিতে আসতে চায় না, আজ এই পার্টিতে আসার কারণ এই অরিন্দম। অরিন্দম নন্দিতার স্বামী, এই পার্টিটা অরিন্দমের আয়োজনেই সংগঠিত হয়েছে আজ। এখানে না এলে খারাপ দেখাত, সে কারণেই নন্দিতা এসেছে। নইলে এই টালিগঞ্জের ফিল্মি পার্টিতে আসতে নন্দিতার বরাবরের তীব্র অনীহা।

অরিন্দমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে প্রেমাংশু দাগা। প্রেমাংশুর বয়স পঁয়তیرিশের আশেপাশে—একে নন্দিতা চেনে, মাঝেমধ্যে অরিন্দমের সঙ্গে মিটিং করতে প্রেমাংশু তাদের বাড়িতেও এসেছে। আজকের পার্টির উদ্যোক্তা নামে অরিন্দম হলেও আসলে এই পার্টির পান্ডা হল প্রেমাংশু, তার ফিনান্সেই আজকের যামযাপন চলছে। প্রেমাংশু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ছবির বড় পরিবেশক, মাঝে-মাঝে বাংলা ছবিতেও সে ফিনান্স করে। এখন বাংলা সিনেমা প্রযোজনা এবং পরিবেশনার ব্যবসায়ে নামবে বলে শুনেছে নন্দিতা।

প্রেমাংশু খুব গভীরভাবে অরিন্দমকে কিছু একটা বোঝাচ্ছে, অরিন্দম মাথা নেড়ে-নেড়ে প্রেমাংশুর কথা শুনছে। অরিন্দম কলকাতা শহরের খুব নামকরা স্টার, তাকে একবার ছুঁয়ে দেখলে এই শহরের অনেক মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তবু, যারা ফিনান্স করে তাদের কথা অরিন্দমকেও মন দিয়ে শুনতে হয়।

দুটি মেয়ে এগিয়ে আসছে অরিন্দমদের দিকে। এদের বয়স বেশি নয়। একজন নন্দিতার মুখ-চেনা, আজকাল টিভি সিরিয়ালে এই মেয়েটিকে হামেশাই দেখা যায়। এই মেয়েটার নাম সম্ভবত পূজা। অন্য মেয়েটিকে নন্দিতা আগে কখনও দেখেনি। দুটি মেয়েরই হাতে ধরা রয়েছে ওয়াইনের গ্লাস। পূজা একটা কালো রঙের ছোট পার্টি ড্রেস পরেছে, তার কাঁধ পুরোটা খোলা, বুকের উপরিভাগও অনেকটাই দৃশ্যমান। পোশাকটা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রকে অমান্য করে পূজার গায়ের বাকি অংশের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো, যাতে মনে হতে পারে পোশাকটা হঠাৎ করে খুলে পড়লে পূজা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না।

পূজার হেঁটে আসার ভঙ্গি একটু টলমল, তার হাতের ওয়াইন সম্ভবত এর জন্য দায়ী। নন্দিতা জানে, খুব ভালো বিদেশি ওয়াইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আজকের পার্টিতে, সেই ওয়াইন পূজা নামক মেয়েটা ইতিমধ্যে ক'গ্লাস গলাধঃকরণ করেছে সে সম্পর্কে নন্দিতার কোনও ধারণা নেই। অন্য মেয়েটাকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে সে নেশাগ্রস্ত নয়, সে একহাতে নিজের গ্লাস ধরে রেখে অন্য হাতে পূজাকে সামলানোর চেষ্টা করছে। সেই প্রচেষ্টায় খুব একটা লাভ অবশ্য হচ্ছে না, বরং পূজাই তাকে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে অরিন্দমের দিকে।

পূজার সঙ্গে মেয়েটিকে এক বলক নজর করল নন্দিতা। মেয়েটা পরে

আছে একটা জিন্স, দেহের উপরিভাগে একটা সাদামাটা টপ। পার্টির অন্যান্য মহিলাদের মতো মেয়েটি একটুও সাজেনি, বরং তার প্রসাধনহীনতাই এই পার্টির মধ্যে তাকে স্বকীয় করে তুলেছে। এই ধরনের পার্টিতে মুখে অনেক রং মেখে প্রবেশ করাটাই দস্তুর, এই মেয়েটা বাকিদের মতো নয়।

পূজা অরিন্দমের গায়ের কাছে চলে এসে কী সব বলছে, এত দূর থেকে নন্দিতা তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে শুধু দেখছে অরিন্দম হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অরিন্দম যে-কোনও সিচুয়েশন চমৎকার সামলাতে পারে, এই ধরনের পার্টিতে নানারকম মাতাল দেখে সে যথেষ্ট অভ্যস্ত, এসব ঘটনা হ্যান্ডল করতে তার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

নন্দিতা শুনতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সেই মুহূর্তে পূজা বলছিল, অরিন্দম ইচ্ছে করলেই পূজা খুব নামকরা নায়িকা হয়ে উঠতে পারে, সে শুধু বসে আছে অরিন্দমের কাছ থেকে একটি সুযোগের অপেক্ষায়।

দ্বিঘণ্টা জড়ানো গলায় পূজা বলল, ‘আমি অ্যাক্টিং করার জন্য সব করতে পারি। আপনি যা বলবেন। আমায় শুধু একটা সুযোগ দিন আপনি!’

‘অরিন্দম মিটিমিটি হাসছে। পূজার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সব করার দরকার নেই। অ্যাক্টিংটা মন দিয়ে করলেই হবে।’

‘আপনি যা বলবেন, স্যার। আপনি শুধু আমাকে একটু গাইড করুন। একটু আশীর্বাদ করুন।’

ঝুপ করে অরিন্দমকে একটা প্রণাম করতে চাইল মেয়েটা, টাল হারিয়ে বসে পড়ল লনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করছে, অরিন্দম মনে-মনে বিরক্ত হলেও ভদ্রতাবশত সেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। প্রেমাংশুও হাসছে, শেষ পর্যন্ত তিনজনে মিলে পূজাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পেরেছে।

পূজা উঠে দাঁড়িয়ে একটু-একটু টলছে, পাশের মেয়েটার গায়ে পড়ে যাচ্ছে টাল হারিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার খুব বিরক্ত মুখ, সে পূজাকে বলল, ‘কী হচ্ছে কী! ওদিকে চল!’

পূজা জড়ানো গলায় বলল, ‘ওদিকে যাব কেন? এখানে অরিন্দমদা আছে। অরিন্দমদা আমাকে হিরোইনের রোল দেবে, আমি অরিন্দমদার সঙ্গে থাকব।’

সঙ্গে মেয়েটা করুণ মুখে একবার তাকাল অরিন্দমের দিকে, মনে হল পূজার হয়ে সে-ই যেন অরিন্দমের কাছে মাপ চেয়ে নিতে চায়। মেয়েটা বলল, ‘আসলে চার গ্লাস খেয়েছে। আমি বারণ করেছিলাম...’

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম একটু হেসে বলল, ‘ও ঠিক আছে। পার্টিতে এরকম মাঝে-মাঝে হয়। এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।’

তারপর একটু চুপ করে থেকে মেয়েটাকে আবার জিগ্যেস করল, ‘কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনলাম না। হ্যাড উই মেট বিফোর?’

মেয়েটা বলল, ‘আমি তিতির। আপনি আমায় দেখেননি আগে। আসলে আপনার কোম্পানিতে জয়েন করার কথা আমার। আজকের পার্টিতে আসার কথা অনিমেঘদা বলেছিল।’

অনিমেঘ টেলিভিশনের নামকরা একজন পরিচালক। মূলত তার প্ররোচনাতেই অরিন্দম শেষ পর্যন্ত নিজের প্রোডাকশন কোম্পানি খুলেছে, আজকের অনুষ্ঠান সেই কোম্পানিরই লক্ষিৎ পার্টি। অনিমেঘ অরিন্দমের কোম্পানিতে জয়েন করেছে ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্ট হিসেবে, তার কথা অরিন্দম খুব মন দিয়ে শোনে।

অনিমেঘের কথাতেই আজকের পার্টির আয়োজন, এখানে টালিগঞ্জের ফিল্ম ও টেলিভিশন জগতের গণ্যমান্যরা নিমন্ত্রিত, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টাররা। এ ছাড়াও রয়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের কর্তাব্যক্তির, আর হাতে গোনা কিছু শিল্পপতি। অরিন্দম এতদিন পর্যন্ত অভিনয়ই করে এসেছে, এখন কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে মন দিতে চলেছে প্রোডাকশনের ব্যবসায়। তার পার্টিতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতি ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়।

তিতিরের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম জিগ্যেস করল, ‘বাঃ, খুব ভালো। তুমি কি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে জয়েন করবে? না স্ক্রিপ্টের কাজ?’

‘আমাকে অনিমেঘদা পরিষ্কার করে কিছু বলেনি তো। বলেছে আমাকে সম্ভবত টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আর সেই সঙ্গে ডিরেক্টোরিয়াল টিমের সঙ্গে লিয়াজাঁ।’

‘একজিকিউটিভ প্রোডিউসার তার মানে। দ্যাটস গুড, ভালো কাজ, আগে করেছ কখনও?’

‘না। আমি ফ্রেশার। এ বছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি গ্র্যাজুয়েশনের। রেজাল্ট বেরোয়নি এখনও।’

‘ও আচ্ছা। আয়াম শিয়োর তুমি পারবে কাজটা। অনিমেয নিজে যখন তোমাকে চুজ করেছে...’

একটু ইতস্তত করে তিতির বলল, ‘আই হোপ সো। চেষ্টা করব...’

তারপর এক পলক অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হেসে বলল, ‘আপনাকে এত কাছ থেকে দেখব কখনও ভাবিনি। আপনাকে বরাবর স্ক্রিনে দেখেছি।’

অরিন্দম হেসে বলল, ‘স্ক্রিনে দেখেছ? বাংলা সিনেমা দেখো তুমি?’

‘কম, তবে দেখি। আপনার ওই সিনেমাটা খুব ভালো লেগেছিল। অবগাহন। আপনি ওটার জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন...’

অরিন্দম মনে-মনে হাসল। সে ঠিকই ধরেছিল। মেয়েটি এই বয়সের যে-কোনও শহরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মতোই। বাংলা সিনেমার ধার ধারে না খুব একটা। অগগাহন বলে কোনও সিনেমায় অরিন্দম কোনওদিন অভিনয় করেনি। যে সিনেমাটা করে অরিন্দম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল তার নাম অনুবর্তন। অরিন্দম অন্যমনস্ক হল, অজান্তেই তার ডান হাতের তর্জনি দিয়ে নিজের খুতনিতে টোকা দিতে শুরু করল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশে তাকাতেই সুকান্তকে দেখতে পেল অরিন্দম। হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে হাস্যমুখে অরিন্দমের দিকে আসছে। সুকান্ত বড় কাগজের নামকরা সাংবাদিক, এন্টারটেনমেন্ট কভার করাই তার দায়িত্ব। টালিগঞ্জের খবর পরিবেশন করার ব্যাপারে তার বেশ মুনশিয়ানা আছে, মোটামুটি ওয়াকিবহাল সাংবাদিক। অনেক সাংবাদিকই গ্ল্যামার জগতের অনেক খবর যাচাই না করে বানিয়ে বানিয়ে লিখে দেয়, সুকান্ত সেরকম নয়। তার খবর পরিবেশনে যথেষ্ট সততা আছে, সেইসঙ্গে রয়েছে কলমের ধার।

সুকান্ত সবসময়েই হাসে, মদ খেয়ে থাকলে তার হাসিটা একটু বেড়ে যায়। সুকান্তর চেহারা একটু ভারীর দিকে, এখন এই মনোরম বসন্তের রাতেও সে ঘামছে একটু-একটু—তাতে অবশ্য তার নিজের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কাছে এসে ঘমাক্ত কলেবরেই অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরল সুকান্ত, তারপর বলল, ‘নাইস পার্টি ম্যান। আই অলওয়েজ নিউ অরিন্দম হাজ স্টাইল। টুডে ইজ নো এক্সেপশন।’

অরিন্দম হেসে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করে তারপর পার্টি থেকে যাবে। শুধু মদ খেয়ে চলে যাবে না।’

‘জানোই তো অরিন্দমদা, আমি বাইরে খাই না। আমার মদ খেতেই ভালো লাগে। আজও শুধু মদই খাব। তুমি দুরকম স্কচ আনিয়েছ, কোনটা ছেড়ে কোনটা খাব সেটা ডিসাইড করতেই তো আমার দেরি হয়ে গেল।’

‘ভালো করে স্কচ খাও আগে। তারপর খেয়েও যেও। তোমার অনারে আজ খাবারের ব্যবস্থা অন্যরকম। লবস্টারের সাইজগুলো একবার দেখলে না খেয়ে যেতে পারবে না তুমি!’

সুকান্ত একবার নিজের ভুঁড়িতে আলগোছে হাত বোলাল। তারপর অরিন্দমের পেটে একটা খোঁচা মেরে বলল, ‘তোমার আর কী! তোমার তো চিরবসন্ত অরিন্দমদা, হাজার খেয়েও তুমি মোটা হও না।’

অরিন্দম রোজ সকালে বাড়ির ট্রেডমিলে ছ’কিলোমিটার দৌড়ায়। ওয়েট ট্রেনিং-ও করে যথাসাধ্য। তবু সুকান্তের কথায় একটু হেসে বলল, ‘রোগা-মোটটা মানুষের নেচার, সুকান্ত। একেকজন একেকরকম হয়, কী করা যাবে! ভগবান আমাকে চেহারা দিয়েছে, তোমাকে দিয়েছে তোমার ব্রেন...’

‘হা হা হা! তা যা বলেছ মাইরি! শোনো না, তোমার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেব, খুব তাড়াতাড়ি দরকার। শনিবারের পাতায় ফ্রন্ট পেজ। কবে দেবে বলো!’

‘এনি টাইম সুকান্ত। তোমাকে কখনও না করেছি আমি? আমার ঘাড়ে ক’টা মাথা?’

‘তাহলে পরশুদিন টেনটেটিভলি।’

‘পরশু কোরো না, থাকব না। হায়দ্রাবাদে শুটিং। ফিরে এসেই ফোন করব?’

‘ঠিক আছে, ফোন কোরো। মনে রেখো, এটা এক্সক্লুসিভ। শুধু আমাদের কাগজ। মনে থাকে যেন...’

‘মনে থাকবে। এ নিয়ে চিন্তা করবে না একদম। তোমার লেখা না বেরোনো পর্যন্ত আমি সবার কাছে স্পিকটি নটা।’

সুকান্তের সঙ্গে অরিন্দমের কথাবার্তার সময়ে পূজা আর তিথির চূপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ পূজা এগিয়ে এল সুকান্তের দিকে। হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করে ধরে সুকান্তের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি রিপোর্টার? আমার নাম পূজা, আপনি আমায় কভার করবেন?’

সুকান্ত একবার পূজার অনাবৃত শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কভার

করব? আমি? তোমাকে অবশ্য কভার করার প্রয়োজন আছে। কী নাম বললে তোমার?’

অরিন্দম মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করেছে। তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার বন্ধুকে ওদিকে নিয়ে যাও। আর দেখে নিও ওর সঙ্গে কে এসেছে, ও বাড়ি যাবে কী করে। গাড়ির দরকার হলে আমাকে বোলো।’

‘না স্যার। গাড়ি লাগবে না, অনিমেষদা গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছে। পূজা আমার সঙ্গে যাবে।’

‘আচ্ছা!’

পূজাকে টানতে-টানতে পার্টির অন্যদিকে নিয়ে গেল তিতির, পূজা ঘুরে অরিন্দমকে বলল, ‘অরিন্দমদা মনে থাকে যেন। আপনি আমায় চাপ্স করে দিচ্ছেন...’

অরিন্দম হেসে ঘাড় নাড়ল, আর সুকান্ত জিগ্যেস করল, ‘এসব মেয়ে কে অরিন্দমদা? কোথা থেকে জোটাও এদের?’

‘আমি জোটার কে? আপনা থেকে জুটে যায়। টিভিতে কাজ করেই সবাই অ্যাক্টিং শিখে গেল আজকাল, কী করা যাবে বলো! আমাদের কোম্পানি অনেকগুলো সিরিয়াল লঞ্চ করবে, তার কোনও একটায় অ্যাক্টিং করছে হয়তো। অনিমেষ ডেকেছে পার্টিতে।’

প্রেমাংশু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে ফিক করে হেসে বলল, মেয়েটা ডেয়ারিং আছে কিন্তু। ড্রেসটা দেখেছেন অরিন্দমদা? আজকাল লোকে সিনেমায় এইরকম ড্রেসের মেয়েই দেখতে চায়। অ্যাক্টিং-ফ্যাক্টিং কে দেখে?

অরিন্দম হেসে বলল, ‘এই মেয়েটাকে মনে ধরেছে তোমার? অনিমেষকে বলে দিচ্ছি, আলাপ করিয়ে দেবে’খন...?’

প্রেমাংশু বলল, ‘খুর, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে কেন? স্টার বা রিপোর্টার না হলে মেয়েরা কি পাত্তা দেয় নাকি?’

সুকান্ত হো হো করে হেসে বলল, ‘আরে কী বলছেন দাদা। এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোডিউসারই সব। আমাকে বরং কেউ পাত্তা দেয় না, আপনি ভুল করছেন।’

তারপর অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘আজও কি বউদি আসেনি নাকি?’

‘এসেছে। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।’

সুকান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা নন্দিতাকে দেখতে পেল। একটা মেরুন রঙের সুন্দর শাড়ি পরে আছে নন্দিতা, দূর থেকেও নন্দিতাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। নন্দিতার মধ্যে একটা রাশভারী ব্যাপার আছে, এই পার্টির কোলাহলের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের চারিদিকে একটা স্বতন্ত্র অদৃশ্য বৃত্ত নন্দিতা তৈরি করে রেখেছে।

নন্দিতার দিকে তাকিয়ে সুকান্ত অভিবাদনের মতো করে নিজের হুইস্কির গ্লাসটা তুলল। মৃদু হেসে নন্দিতাও তার অরেঞ্জ জুসের গ্লাস উঁচু করে ধরে সেই অভিবাদন ফিরিয়ে দিল। অভিবাদনান্তে হাতটা তুলে একবার ঘড়ি দেখল নন্দিতা। সাড়ে দশটা বাজে। এই সময় পার্টিতে একটু-একটু করে বেহিসেবি হতে শুরু করে লোকজন, এর পরে আর পার্টিতে থাকার কোনও মানে হয় না। নন্দিতা হাতে ধরা গ্লাসের শেষ চুমুকটা দিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল অরিন্দমদের দিকে।

নন্দিতাকে এগিয়ে আসতে দেখে অরিন্দমও এগোল তার দিকে। নন্দিতার কাছে গিয়ে বলল, ‘কী ব্যাপার? আর ভালো লাগছে না, তাই তো?’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘ঠিক তাই। জানোই তো, হাউ আই হেট দিজ পার্টিজ। আজ নেহাত তোমার নিজের পার্টি, না এলে লোকে নানান কিছু বলবে, তাই একবার মুখ দেখাতে এলাম।’

অরিন্দম, বলল, ‘জানি। পার্টি আমারও ভালো লাগে না, তুমি তো ভালো করেই সে কথা জানো। এনিওয়ে, চলো তোমাকে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি...’

‘তার দরকার নেই। আমি চলে যাচ্ছি।’

‘আর ইউ সিওর?’

‘অ্যাবসোলিউটলি।’ আই উড বি ফাইন। বাড়ি পৌঁছে গাড়ি আবার ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি অনেক রাত করবে?’

‘না, না। ডোন্ট ওরি। আমি সাড়ে বারোটার মধ্যে ফিরব। বাড়ি এসেই থাৰা।’

‘মদ খেও না বেশি।’

অরিন্দম হেসে নিজের গ্লাসের দিকে তাকাল। তারপর বলল, ‘টু অ্যান্ড হাফ। এখনও এক নম্বর শেষ করিনি।’

‘মনে থাকে যেন। এই বয়সে বেশি মদ খেলে আর বেশিদিন এই চেহারা ধরে রাখতে পারবে না।’

অরিন্দম হাসল। বলল, ‘চিন্তা কোরো না। বাড়ি পৌঁছে ফোন কোরো একটা।’

‘করব।’

নন্দিতা লনের একপাশের ইটে বাঁধানো সিঁড়ি ধরে মেন গেটের দিকে চলে গেল, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অরিন্দম। নন্দিতাকে কেউ খেয়াল করেনি, এই পার্টির মূল উদ্যোক্তার স্ত্রী বলে তাকে হঠাৎ করে কেউ চিনতে পারবে না।

নন্দিতা এরকমই। বিখ্যাত চিত্রতারকার স্ত্রী হয়েও নিজের মতো করে নিজের জীবন নিয়েই বেঁচে থাকতে পছন্দ করে সে, গ্ল্যামারজগতের প্রতি তার কোনও উৎসাহ নেই।

২

বাড়ি ফিরতে আজ একটু রাত হয়েছে দেবারতির। আজকাল অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে এমনিই প্রায় সাড়ে সাতটা-আটটা বাজে, অফিসের গাড়ি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ন’টা পেরিয়ে যায়। আজ কাজ শেষ করার পরে জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে একটা মিটিং ছিল, সেই মিটিং শেষ করতে-করতে ন’টা পেরিয়ে গেছে। এর পরে অফিসের গাড়ি সপ্টলেক থেকে দেবারতিকে নামাতে এসেছে জোকার কাছে তাদের বাড়িতে। বেহালা চৌরাস্তায় দিনে রাতে সব সময়েই জ্যাম থাকে, দেবারতির বাড়ি পৌঁছোতে-পৌঁছোতে সাড়ে এগোরোটা বেজে গেছে।

জোকার এই বাড়িটায় দেবারতিরা শিফট করেছে বছর তিনেক আগে। বেহালার ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয় পেরিয়ে এই লোকালয়ে তিন বছর আগেও বেশি লোক ছিল না। এখন একটু-একটু করে মানুষজনে ভরে উঠতে শুরু করেছে জায়গাটা। রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে বছরখানেক আগে, আর কিছুদিনের মধ্যে এলাকাটা কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় চলে আসবে এমনটাও শোনা যাচ্ছে।

এখান থেকে কিছুটা দূরে তৈরি হয়েছে কয়েকটা স্কুল আর ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজ, এখানকার বাড়িগুলোতে সে সব জায়গার অনেক ছাত্র-ছাত্রী পেয়িং গেস্ট হিসেবে ভাড়া থাকে। এই ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে একটু-একটু করে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠছে, রাস্তার ধারে তৈরি হয়ে উঠছে একটা দুটো করে খাবারের স্টল।

আজ এরকম একটা খাবারের দোকান থেকে রুটি-তরকা কিনে বাড়ি ঢুকেছিল দেবারতি। রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে বাড়ি ফিরে আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে কারও ইচ্ছে করে না, এর থেকে রাস্তার দোকানের খাবার চটজলদি খেয়ে নেওয়াই ভালো। বাড়িতে ঢোকার আগে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার বেল দিয়েছিল দেবারতি, কেউ দরজা খুলে দেয়নি বলে শেষ পর্যন্ত চাবি ঘুরিয়ে বাড়ি ঢুকেছে সে।

বাড়ির টেলিফোনটা কয়েকদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। টেলিফোন অফিসে কমপ্লেন করার সময় পায়নি দেবারতি। সন্দের পর থেকে মেয়ের সেলফোনটাও বন্ধ, তাকে ফোন করে ‘দেরি হবে’ এই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল না দেবারতির। মেয়ের কোনও তালের ঠিক নেই, ঠিক সময়ে ফোন চার্জ বসাতে হামেশাই ভুলে যায়, এ নিয়ে চেষ্টামেচি করেও কোনও লাভ হয় না। একেকজন একেকরকমের হয়। দেবারতি সব ব্যাপারেই খুব সাজানো-গোছানো, তার মেয়ে একটু অন্যমনস্ক ধরনের—জাগতিক কোনও ব্যাপারেই তার কোনও হুঁশ নেই। অনেকটা বাবার স্বভাব পেয়েছে মেয়ে। দেরি হচ্ছে বলে মেয়ে হয়তো এতক্ষণে ওপরের ঘরে আপনমনে না খেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছে!

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সামান্য একটু গলা চড়িয়ে দেবারতি ডাকল, ‘কবিতা, কবিতা!’

প্রথমে কোনও সাড়া এল না, তারপরই সিঁড়ির নীচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল মধ্যবয়সি এক মহিলা, দেবারতির দিকে তাকিয়ে হেসে ঘুম চোখে বলল, ‘ও আপনি এসে গেছেন? ঘুমে আমার চোখ একটু জুড়ে এসেছিল!’

‘রান্না করেছে কিছু?’

‘আপনি তো কিছু বলে যাননি, তাই ভাবলাম...’

একটু বিরক্ত চোখে কবিতার দিকে তাকিয়ে হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগটা এগিয়ে দিল দেবারতি। বলল, ‘ধরো এটা। তরকাটা, অন্য একটা বাটিতে

ঢেলে নাও। তারপর মাইক্রোওভেনে গরম করে নেবে। আমি বাথরুম থেকে আসছি। খাবার দিয়ে দেবে তারপরে। তিতির কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ওকে ডেকে তোলো!’

কবিতা প্লাস্টিকের ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাল দেবারতির দিকে। তারপর বলল, ‘দিদিমণি তো ফেরেনি, আমি ভাবলাম আপনার সঙ্গে...’

কবিতার কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল দেবারতির। তারপর বলল, ‘ফেরেনি মানে? কোথায় গেছে?’

‘তা তো জানি না! বিকেলের দিকে বেরোল তো! বলল কাজ আছে।’
‘কখন ফিরবে কিছু বলে যায়নি?’

‘না। আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে গাড়ি করে ফিরে আসবো।’
দেবারতির ভুরু কুঁচকাল একটু। একটুক্ষণ চিন্তা করে জিগ্যেস করল, ‘কেউ কি এসেছিল? তার সঙ্গে বেরিয়েছে? নাকি...’

‘না, কেউ আসেনি, এমনই তো বেরোল। দেরি হবে এমন কিছু বলেনি আমায়। আমি অবশ্য তখনও একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’

বিরক্ত গলায় দেবারতি বলল, ‘ঘুমিয়েই থাকো সারাদিন! কতদিন তোমাকে বলেছি তিতির কখন বেরোচ্ছে, কখন ফিরছে সেগুলো একটু খেয়াল রাখবে। বাড়িতে কেউ আসে কি না সেগুলোও খেয়াল রাখতে বলেছি তোমাকে!’

‘কেউ আসেনি বাড়িতে। এলে তো বলব।’

‘ফোন এসেছিল কোনও?’

‘ফোন তো খারাপ।’

‘দুপুরে খেয়েছে ঠিকমতো?’

‘হ্যাঁ খেয়েছে। তারপর নিজের ঘরে ছিল। বিকেলের দিকে বেরিয়েছে মনে হয়, আমি বুঝতে পারিনি।’

দেবারতির একবার মনে হল কবিতার ওপর চিৎকার করে নিজের বিরক্তিতা জানান দেয়। অতি কষ্টে শেষ পর্যন্ত নিজের রাগ দমন করল দেবারতি। কবিতা তাদের বাড়ির কাজের লোক, তার ওপর চেষ্টামেচি করে নিজের রাগ দেখানোর কোনও মানে হয় না। রাগ দেখানোর হলে নিজের মেয়ের ওপরে দেখানোই ভালো।

এই মুহূর্তে অবশ্য রাগের থেকেও দেবারতির চিন্তা হচ্ছে বেশি। তাদের

বাড়ি কলকাতা শহর বলতে যা বোঝায় তার থেকে কিছুটা দূর, এখানে একটু রাত হলেই যানবাহন অপ্রতুল হয়ে যায়। রাতের বেলা একা-একা মেয়ে ফিরবে কী করে তা নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিতিরের অবশ্য আজকাল বেশ কয়েকজন বন্ধু জুটেছে, তারা অনেক সময়ে তিতিরকে রাত হয়ে গেলে রাস্তার মোড় অবধি ছেড়ে দেয়। এই বন্ধু কারা সে সম্পর্কে জিগ্যেস করে আজ পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পায়নি দেবারতি, প্রত্যেকবার দেবারতির প্রশ্ন কায়দা করে এড়িয়ে গেছে তিতির।

দেরি করে বাড়ি ফেরাটা আজ অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। দেরি হলেও কখনও সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটার বেশি রাত আগে কখনও করেনি তিতির। দেরি হলে টেলিফোন করে তাকে জানিয়েও দিয়েছে সবসময়ে, আজই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। কয়েকবার রাতের শো-তে সিনেমা দেখে কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে থেকেও গেছে তিতির, প্রত্যেকবারই সে আগে থেকে সে ব্যাপারে পারমিশন নিয়ে রেখেছিল।

ঈষৎ চিন্তিতভাবে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল দেবারতি, এবারে মেয়ের ব্যাপারে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একুশ বছর বয়স হয়েছে মেয়ের, এই সময়ে মেয়ের প্রতি একটু নজর দেওয়া দরকার। এই বয়সটা খুব গোলমালে, খারাপ কোনও চক্রের জড়িয়ে গেলে তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। কাগজে আজকাল এমন সব অদ্ভুত খবর বেরোয়, সেসব পড়ে মেয়ের ব্যাপারে আরও চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে দেবারতির।

ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ব্যাগের মধ্যে দেবারতির সেলফোনটা বেজে উঠল টিং-টিং করে। দেবারতি একটু আশাঘিত হল, এই ফোনটা নিশ্চয় তার মেয়ের। এই মুহূর্তে মেয়ে কোথায় আছে তা জানিয়ে দিলেই অনেকটা নিশ্চিত্ত বোধ করবে দেবারতি। ব্যাগ থেকে ফোনটা বার করে হাতে তুলে নম্বর দেখল দেবারতি। মেয়ের ফোন নয়, ফোনটা করেছে শঙ্করলাল। একটু ক্লান্ত গলায় দেবারতি বলল, 'হ্যাঁ বলো।'

‘এই ঢুকলাম।’

‘মিটিং ঠিকমতো হল? মুম্বাই যাওয়ার ব্যাপারে কিছু?’

‘দেখি। সামনের সপ্তাহে যেতে হতে পারে। দিল্লি থেকে ফিরে ডিসিশন নেব। তোমার খাওয়া হয়েছে?’

‘হ্যাঁ খেয়েছি। তুমিও রাত জেগে বসে থেকো না, খেয়ে নিও সময়মতো!’

‘নেব। একটু অপেক্ষা করি, তিতির ফেরেনি এখনও।’

তিতির খবরে ওদিকে শঙ্করলালের গলাতেও একটু উদ্বেগের ছোঁওয়া লাগল যেন। শঙ্করলাল বলল, ‘সে কী! এখনও ফেরেনি? অনেক রাত হয়েছে তো, কোথায় গেছে?’

‘জানি না। আমার সঙ্গে সকালের পরে আর কথা হয়নি। বাড়িতেও কিছু না বলে বেরিয়েছে।’

‘ফোন করোনি?’

‘ওর সেলফোনটা বন্ধ। মনে হয় চার্জ নেই।’

‘কোনও বন্ধুর বাড়ি গেছে কি না দ্যাখো। আমাকে জানাবে। আর একটু দেখে নাও। না ফিরলে ফোন কোরো আমায়, দেখছি কী করা যায়!’

‘জানাচ্ছি।’

‘চিন্তা কোরো না বেশি। কোথায় আর যাবে, আটকে পড়েছে কোনও কারণে...’

‘তাই হবে।’

শঙ্করলালের ফোনটা ছেড়ে একটুক্ষণ চিন্তা করল দেবারতি। তার মনে পড়ল তিতিরের বন্ধু রুমির কথা, রুমি তিতিরের কলেজের বন্ধু, একবার-দুবার তাদের এই বাড়িতে এসে রুমি থেকে গেছে। রুমির মা পুলিশ না কীসে যেন আছেন, অসমে পোস্টেড, রুমি কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে। সিনেমা দেখতে গিয়ে এই রুমির ফ্ল্যাটেই থেকে গেছিল তিতির, এখন রুমি হয়তো তিতিরের খবর তাকে দিতে পারবে।

রুমির নম্বর দেবারতির ফোনে সেভ করা আছে। সেখান থেকে নম্বর বার করে রুমিকে ডায়াল করল দেবারতি। ওপাশে একটা নতুন হিন্দি গানের সুর বাজছে, একটুক্ষণ বাজার পরেই রুমির গলা পেল দেবারতি। রুমির গলা যেন একটু ঘুমজড়ানো—সেটা অবশ্য হতেই পারে, রাত পৌনে বারোটার সময়ে বেশিরভাগ সুস্থ মানুষেরই ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

দেবারতি বলল, ‘আমি তিতিরের মা বলছি, তিতিরের কোনও খবর

জানো? বাড়ি ফেরেনি এখনও, ও কি তোমার সঙ্গে আছে?’

‘না আন্টি, আজ তো আমার সঙ্গে দেখা হয়নি...’

‘কোথায় গিয়ে থাকতে পারে কোনও আইডিয়া আছে? বুঝতেই পারছ, অনেক রাত হয়েছে তো, কোনও খবর না দিয়ে...। ওর ফোনটাও বন্ধ। কী করব, বুঝতে পারছি না।’

রুমির গলাও একটু চিন্তিত শোনালা এবারে। কিন্তু তাও রুমি বলল, ‘ঠিক আছে আন্টি, আমি দেখছি। আপনি চিন্তা করবেন না।’

দেবারতি বলল, ‘প্লিজ একটু দ্যাখো না। আসলে তুমি ছাড়া ওর বন্ধুদের কাউকেই তো প্রায় চিনি না। কারও নম্বরও আমার কাছে নেই। তুমি যদি একটু...’

‘দেখছি আন্টি।’

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে দেবারতি চুপ করে বসে রইল। রুমি কি তিতিরের কোনও খবর দিতে পারবে? এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর কিছুক্ষণ দেখতে হবে, রুমির কাছ থেকে কোনও খবর না পাওয়া গেলে দেবারতিকে আবার শঙ্করলালকেই ফোন করতে হবে। এই বিরাট মহানগরে শঙ্করলালই দেবারতির একমাত্র ভরসার স্থল, শঙ্করলাল তার নিজের কন্ট্যাক্টস লাগিয়ে তিতিরকে খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা শুরু করবে। শঙ্করলাল এই রাজ্যের রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, পুলিশের কর্তাব্যক্তির তার হাতের মুঠোয়।

অন্যদিকে দেবারতির ফোনটা ছেড়ে দিয়ে রুমিও চুপ করে বসে রইল একটুক্ষণ। সে মোটেই ঘুমোয়নি, তার গলার স্বর এমনিতেই একটু ঘুমজড়ানো থাকে সবসময়ে। তার সামনে ম্যানেজমেন্টের অ্যাডমিশন টেস্ট, সে ওই পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করছিল নিজের খাটে বসে। তিতিরের জন্য তারও একটু চিন্তা হচ্ছে। তিতির এমনিতে বিচক্ষণ মেয়ে, এত রাত অবধি তার কোথাও আটকে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, যে-কোনও ব্যাপারে তিতির রুমিকে খবর দেয়, তার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। আজ কোনও খবর না-দেওয়াটা একটু অদ্ভুত লাগল রুমির।

অবশ্য তিতিরকে কোনও বিশ্বাস নেই। মন ভালো না থাকলে তিতির সকালে উঠে একা-একা গঙ্গার ঘাটে চলে যেতে পারে, প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে বসে থাকতে পারে হাওড়া স্টেশনের অভ্যন্তরে। একবার একা-একা সে গরুমারা বেড়াতেও চলে গেছিল, সেই সময়ে অবশ্য মা’কে

আর রুমিকে জানিয়ে গেছিল তিতির। এখন কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়াটা একটু অদ্ভুত। তিতির একটু পাগলাটে হলেও দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। তা ছাড়া একা-একা গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় এটা নয়, এই সময়ে কারও খবর না পাওয়া গেলে তা নিয়ে কাছের মানুষজনের চিন্তা হওয়ারই কথা।

হঠাৎ করে পূজার কথা মনে পড়ল রুমির। পূজার সঙ্গে রুমি আর তিতিরের আলাপ হয়েছিল শপিং মলের ফুড কোর্টে, খাবার প্লেট নিয়ে কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে পূজা তাদের টেবিলে বসতে এসেছিল। রুমি আর তিতির কেউই পূজাকে দেখে অভিনেতা বলে চিনতে পারেনি অবশ্য, পূজা নিজের থেকেই তার পরিচয় দিয়েছিল। তারপর খেতে-খেতে আরও একটা-দুটো কথা বলার ফাঁকে তিতিরকে বলেছিল, ‘তুই তো বেশ দেখতে শুনতে ভালো, লম্বাও আছিস বেশ। মডেলিং করিস না কেন?’

তিতির হেসে উত্তর দিয়েছিল, ‘ওইসব আমার দ্বারা হবে না।’

‘কেন? বেশ হাতখরচ চালানো যায়। মাস গেলে বেশ কিছু পয়সা আসে। অ্যাক্টিংয়ের কথাটাও ভেবে দেখতে পারিস।’

সেদিন আর কোনও কথা হয়নি, পরে একদিন তিতির রুমিকে জানিয়েছিল সে পূজার সূত্র ধরে কোন একটা প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে কথা বলতে যাবে। তার ইন্টারেস্ট অবশ্য অভিনয় বা মডেলিংয়ে নয়, সে ক্যামেরার পিছনে থেকে নির্দেশনার কাজ শিখতে চায়। তিতির বলেছিল, ‘আমার ডিরেকশনের কাজ খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। প্রোডাকশন হাউসের কাজ একটা যদি পেয়ে যাই, অনেক সুবিধে হবে আমার।’

রুমি জিগ্যেস করেছিল, ‘কী সুবিধে হবে তোর?’

‘আমার টাকার দরকার। সবার আগে আমায় বাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি মা’র সঙ্গে আর থাকতে পারছি না। আই হেট মাই মাদার, ইউ নো দ্যাট।’

কোনও একটা প্রোডাকশন কোম্পানির সঙ্গে তিতির দুদিন কথাবার্তা বলেছে এ কথা রুমিকে জানিয়েছিল তিতির। আজ কি সেই প্রোডাকশন কোম্পানির কাজে আটকে পড়েছে তিতির? এত রাত অবধি প্রোডাকশন কোম্পানির লোকজন কি কাজ করে? হতেও পারে, সেদিনই খবরের কাগজে একতা কাপুরের একটা ইন্টারভিউতে রুমি পড়েছিল মুম্বাইয়ে সিরিয়ালের শুটিং নাকি সারা রাত ধরে হয়। পূজা কি তিতিরের ব্যাপারে

কোনও খবর দিতে পারবে?

পূজার নম্বর রুমির ফোনবুকে আছে, সেখান থেকে বার করে পূজাকে ফোন করল রুমি। ফোনটা বেজে-বেজে থেমে গেল, ও-প্রান্তে কেউ ফোন তুলল না। এখন প্রায় বারোটা বাজে, পূজা এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে? পূজা বলেছিল সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, অনেক সময়েই রাত শেষ হওয়ার আগে সে বাড়ি ফেরে না। কলকাতা শহরে এখন অনেক নাইটক্লাব ও ডিস্ক, সেই সব জায়গা পূজার রাতের বিচরণক্ষেত্র। এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পাত্রী পূজা নয়।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আরও একবার পূজাকে ফোন করল রুমি। এবারেও ফোনটা বাজল। অনেকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত যখন রুমির মনে হয়েছিল এবারেও ফোনটা কেউ ধরবে না, সে সময়ে অপর প্রান্তে পূজার গলা পাওয়া গেল। একটু জড়ানো গলায় পূজা বলল, 'হ্যালো!'

পূজার গলার স্বর ছাপিয়ে রুমির কানে ভেসে আসছে চিৎকার চোঁচামেচি, সেই সঙ্গে লাইভ মিউজিকের ধ্বনি। পূজা যেখানে আছে সেখানে অনেক কোলাহল, সম্ভবত কোনও ডিস্কে এই মুহূর্তে রাত কাটাচ্ছে পূজা। নিজের গলা পূজার কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রুমি নিজের গলা তুলল। একটু চেষ্টা করে বলল, 'রুমি বলছি। তোর সঙ্গে কি তিতির রয়েছে বাই এনি চান্স?'

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা অপরপ্রান্তে। তাতে রুমি একটু অসহিষ্ণু বোধ করল। সে বুঝতে পারছে না পূজা তার কথা শুনতে পেয়েছে কি না। সে তিতির সম্পর্কিত প্রশ্নটা আবার করতে যাচ্ছিল, তখনও পূজার গলা পাওয়া গেল। স্থলিত গলায় পূজা বলছে, 'তিতির, তিতির, তিতির পাখি। ইয়েস, শি ইজ উইদ মি। এখন উড়ে বেড়াচ্ছে, ফ্লাট করছে। উই আর ইন আ পার্টি, অ-সাম পার্টি ম্যান। আই অ্যাম ব্লোন।'

'তুই ফোনটা তিতিরকে একটু দে।'

'তিতির ফোন ধরবে না। শি ইজ উইদ আ হ্যান্ডসাম গাই, দে আর স্মুচিং নাউ, হি হি হি...'

'ফোনটা দে তিতিরকে। ইটস ইম্পোর্ট্যান্ট!'

পূজা আর কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে তিতিরের গলা পেল রুমি। ফোনটা সম্ভবত সে পূজার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। একটু চাপা গলায় তিতির বলল, 'হ্যাঁ বল!'

‘তুই কোথায়?’

‘আমি একটা পার্টিতে, পরে বলব তোকে সব কিছু।’

‘তুই ওখানে কী করছিস? কাকে স্মুচ করছিস তুই?’

‘কাউকে না। আমি কিছু করছি না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, বিশ্বাস কর। তোকে পরে বলব সব কিছু। পুরো ফেঁসে গেছি এখানে এসে।’

তিতিরের গলা স্বাভাবিক শোনাচ্ছে, পূজার মতো আদ্যোপান্ত জড়ানো কণ্ঠস্বর তার নয়। রুমি বুঝল তিতির সেলে আছে, পূজার মতো মাতাল হয়ে তালজ্ঞান হারায়নি। তাতে একদিকে নিশ্চিত হল রুমি অন্যদিকে তার রাগ হতে শুরু করল ভিতরে-ভিতরে। তিতির ঠিকঠাকই আছে, তাহলে সে রুমি, বা তার মা’কে ফোন করে নিজের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি কেন? হাউ ক্যান শি বি সো ইরেসপন্সিবল?

রুমির গলা একটু রুক্ষ শোনাল এবারে। রুমি বলল, ‘হোয়াট দ্য শিট ইজ দিস? ক’টা বেজেছে খেয়াল আছে তোর? আন্টি চিন্তা করছে, এফুনি আমাকে ফোন করেছিল।’

‘আমি পুরো ফেঁসে গেছি। ভেবেছিলাম এখান থেকে বেরিয়ে যাব সময়মতো, পারিনি। বিলিভ মি!’

‘তুই আছিস কোথায়? হোয়ার দ্য হেল আর ইউ?’

‘যে প্রোডাকশন কোম্পানিতে জয়েন করব তাদের পার্টিতে। সন্কেবেলা এদের অফিসে দেখা করতে এসেছিলাম, অনিমেসদা আর পূজা জোর করে পার্টিতে ধরে নিয়ে এসেছে।’

‘একটা ফোন করে সে কথা জানিয়ে দিতে কী হয়?’

‘ট্রাস্ট মি, আমার ফোনে চার্জ নেই। কাল রাতে চার্জ করতে ভুলে গেছিলাম।’

‘ডোন্ট টেল মি অন্য কারও ফোন থেকে একটা ফোন করা যায় না! আর ইউ কিডিং মি অব হোয়াট?’

‘কী করে ফোন করব বল? তোর নতুন নম্বর আমার মুখস্থ থাকে না। অ্যান্ড আমার মায়ের নম্বর মনে রাখার চেষ্টা করি না কখনও।’

‘বিলিভ মি, দিজ আর অল লেম এক্সকিউজেজ। ইচ্ছে থাকলেই তুই ফোন করতে পারতিস। দু-মিনিটের জন্য একটা চার্জার ধার করা যায় না কারও কাছ থেকে?’

‘কার থেকে ধার করব? আই হার্ডলি নো এনিবডি আউট হিয়ার।

অচেনা লোকেদের কাছে গিয়ে গিয়ে একটা পার্টির মধ্যে জিগ্যেস করব, আপনার কাছে চার্জার আছে?’

তিতিরের গলা এবারে উষ্ণ শোনাচ্ছে। অবশ্য পার্টির কোলাহলের মধ্যে তাকে বেশ গলা তুলে কথা বলতে হচ্ছে বলেও সেটা মনে হতে পারে রুমির। তিতিরকে জোর গলায় কথা বলতে কখনও শোনেনি রুমি, সে চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিতিরের গলা পাওয়া গেল আবার। এবারে তার গলার স্বর নরম, আগেরবার চেষ্টানোর জন্য হয়তো তার গলার স্বরে কিছুটা অনুতাপের সুরও যুক্ত হয়েছে। তিতির বলল, ‘রাগ করিস না রুমি। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তুই একটু ফেন করে মা’কে জানিয়ে দে।’

‘কী জানাব আন্টিকে?’

‘যা সত্যি সেটাই বলবি। আর বলবি আমি বাড়ি ফিরতে পারব না আজ। মা যেন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। টেল হার নট টু ওরি অ্যাবাউট মি।’

‘বাড়ি ফিরবি না? কোথায় থাকবি আজ?’

‘আমি পূজার বাড়িতে থেকে যাব। পূজা কমপ্লিট আউট হয়ে গেছে, ওকে বাড়ি পৌঁছতে যেতে হবে আমাকে।’

‘না তুই পূজার বাড়িতে থাকবি না। তুই আমার এখানে চলে আয়। আমি জেগে থাকব।’

‘হবে না। আই হ্যাভ টোল্ড পূজা’জ মাদার। আমি পূজাকে নিয়ে ওদের বাড়িতে ফিরব।’

রুমি আর কথা বাড়াল না। ফোনটা কেটে দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তিতির যে তার সঙ্গে না থেকে পূজার বাড়িতে থাকবে বলে মনস্থ করেছে তাতে রুমির অভিমান হয়েছে একটু। তিতিরের সঙ্গে তার তিন বছরে বন্ধুত্ব, এখন হঠাৎ করে পূজা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল তিতিরের কাছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিতিরের মা’কে ফেন করে রুমি বলল, ‘আন্টি, তিতিরকে খুঁজে পেয়েছি। ও একটা কজে আটকে গেছে একটু। কাজ শেষ করে আমার এখানে আসবে। এখানে থেকে যাবে আজ।’

অন্যদিকে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ শোনাৎ দেবারতির গলা। ‘মাঝরাতিরে কাজ মানে? কিসের কাজ হয় এত রাত অবধি? ঠিক করে বলো তিতির কোথায় আছে, আই নিড টু নো।’

‘ও একটা প্রোডাকশন কোম্পানিতে জয়েন করেছে আন্টি। শুটিংয়ের কাজে আটকে গেছে। কাল ফিরে এসে সব বলবে বলছে আপনাকে।’

‘মানেটা কী? তোমরা সবাই মিলে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ, তাই না? তোমরা কী করছ ঠিক করে বলো। আমাকে মিথ্যে বলার চেষ্টা কোরো না।’

‘মিথ্যে বলছি না আন্টি। ও সত্যি-সত্যিই কাজে আছে। একটা চাকরি করছে। আপনাকে নিশ্চয় সব খুলে বলবে। আপনি প্লিজ...’

‘তোমার এখানে ফিরবে, সত্যি বলছ তো?’

‘সত্যি বলছি আন্টি, বিশ্বাস করুন। ট্রাস্ট মি আন্টি, আমরা কেউই খারাপ কিছু করছি না।’

দেবারতির গলা একটু নরম হয়েছে এবারে। বলল, ‘ওকে কাল ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি ফিরতে বলবে। আমি অফিসের কাজে দিল্লি যাব কাল বিকেলে, যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘চিন্তা করবেন না আন্টি। আমি ঠিক ওকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।’

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে রইল রুমি। তার চোখ জ্বালা করছে এখন। এর আগেও সে তিতিরের মা’কে তিতিরের জন্য অনেক মিথ্যে কথা বলেছে। আজও বলল। তিতির আজ তার এখানে না এসে অন্য কারও বাড়ি যাচ্ছে শুনলে আন্টি আরও চোঁচামেচি করতে শুরু করত।

দাঁতে দাঁত চেপে রুমি নিজের মনে বলল, ‘তোর জন্য আর কত মিথ্যে বলব? আমার কথাটা একটুও বুঝিস না তুই?’

৩

নন্দিতার ঘুম ভাঙে ঠিক সাতটার সময়, ঘুম থেকে উঠে দেখল অরিন্দম তার আগেই উঠে পড়েছে। অরিন্দম তার দৈনন্দিন স্বাস্থ্যচর্চা সেরে, স্নান করে গলায় একটা তোয়ালে ঝুলিয়ে বসার ঘরে ল্যাপটপ খুলে বসে আছে। তার সামনে বড় চায়ের কাপ, সেটা থেকে ধোঁওয়া উঠছে অল্প অল্প।

নন্দিতা জিগ্যেস করল, ‘এত সকালে উঠে পড়েছ? শুটিং আছে নাকি?’

থুতনিতে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে-মারতে নন্দিতার দিকে তাকাল অরিন্দম, দেখে মনে হল সে কিছু একটা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। আঙুল দিয়ে থুতনিতে টোকা মারাটা অরিন্দমের মুদ্রাদোষ, অনেক সময়ে অভিনয় করার সময়েও এই মুদ্রাদোষটা তার বেরিয়ে পড়ে। সিনেমার পরদাতেও অরিন্দমকে এরকম করতে দেখেছে নন্দিতা, এই মুদ্রাদোষটার প্রতি বেশ কয়েকবার সে অরিন্দমের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। তাতেও অরিন্দমের এই মুদ্রাদোষটা দূর হয়নি।

নন্দিতার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে অরিন্দম বলল, ‘শুটিং নেই। বিকেলের ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ যাওয়া আছে। আর সকালে দুটো মিটিং।’

‘তা হলে এত সকালে উঠে পড়েছ?’

‘ঘুম ভেঙে গেল, কী করব।’

‘ফিরেছ কখন কাল?’

‘দেড়টা। না, না দুটো।’

‘ডাকোনি কেন?’

‘দেখলাম ঘুমোচ্ছ, তাই আর ডিস্টার্ব করিনি।’

‘খেয়েছ? আমি মাইক্রোওভেনে তোমার খাবার রেখে দিয়েছিলাম।’

‘খেয়েছি। তবে রুটি কম খেয়েছি। মদ একটু বেশি খেয়েছিলাম কাল, তাই ক্যালোরি কম্পেনসেট করেছি কম খেয়ে।’

‘বুঝলাম। আড়াইটের বেশি খাওয়া বারণ তোমার। কাল কটা খেয়েছিলে শেষ পর্যন্ত?’

‘সাড়ে তিন। ঠিকই আছে, এমন কিছু বাড়াবাড়ি করিনি। রাতে একটা রুটি কম খেয়েছি, এখন ব্রেকফাস্ট স্কিপ করব। ঠিক হয়ে যাবে। তোমার চা করে রেখেছি, মাইক্রোওভেনে রাখা আছে। গরম করে নিও।’

‘নিচ্ছি।’

মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নন্দিতা এসে বসল অরিন্দমের পাশে। ভুরু কুঁচকে একবার অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘সাতসকালে উঠে কী করছ বলো তো? কী কাজ এখন?’

ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে অরিন্দম তাকাল নন্দিতার দিকে। থুতনিতে আঙুল বুলোল একবার। তারপর বলল, ‘ব্যবসা করতে গেলে

অনেক হিসেব করতে হয়। অনেক মেল-ও করতে হয়। সে সব কাজ কিছু কম নয়। মুম্বাইয়ের একটা গ্রুপ থেকে মেল করেছে। ওরা বেঙ্গলে সিনেমায় ইনভেস্ট করবে। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায়।’

‘তোমার সঙ্গে কেন? তুমি তো ব্যবসায় নামোইনি এখনও। জাস্ট কাল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হল। তুমি ফিল্মস্টার, ব্যবসায় তোমার লোকাস স্ট্যান্ডাই কী?’

‘আমার লোকাস স্ট্যান্ডাই আমার ফেস। মুম্বাইতে লোকে আমায় চেনে। আমি বেঙ্গলের সুপারস্টার এটা সকলে জানে।’

নন্দিতা হাসল, ‘তা ঠিক। তবে কালকে সবে একটা পার্টি করলে, তাতেই তোমার মেল এসে গেল, ব্যাপারটা একটু স্ট্রেঞ্জ নয়?’

‘স্ট্রেঞ্জ কেন হবে? ফেসবুক, টুইটারের যুগ। নিউজ ছড়াতে সময় লাগে না।’

‘তাই দেখছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় এখনও ঢুকছে না অরিন, তুমি হঠাৎ এই ব্যবসায় নামতে যাচ্ছ কেন? হোয়াটস রং ইন বিয়িং জাস্ট আ স্টার? তোমার ব্যবসায় নামার আদৌ দরকার আছে কি?’

একটু চিন্তিত মুখে অরিন্দম তাকাল নন্দিতার দিকে। তারপর বলল, ‘আছে। আমার বয়সটা কত হল সে খেয়াল আছে তোমার?’

‘আছে। তেতাল্লিশ। তাতে কী হল?’

‘অনেক কিছু। এবার একটু-একটু করে আমায় গোটাতে হবে। আমার পক্ষে আর কলেজে পড়া হিরোর রোল করা সম্ভব নয়, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। অন্যদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে, আমাকে নতুন কিছুতে একটু একটু করে নিজের জায়গা করে নিতে হবে এবারে।’

নন্দিতা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাকাল অরিন্দমের দিকে। এই মানুষটাকে আজ অনেকদিন ধরে চেনে নন্দিতা, তার গলায় এরকম ক্লাস্তির সুর সে কখনও শোনেনি। অরিন্দম কি তার স্টারডম ধরে রাখতে-রাখতে ক্লাস্ত হয়ে পড়ছে? সে কি সত্যি-সত্যি গুটিয়ে নিতে চাইছে নিজেকে? নাকি পুরোটাই অরিন্দমের খেলা খেলা?

অরিন্দম নিজের থেকেই কথা বলল আবার। বলল, ‘আয়াম সিরিয়াস।

কাল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে এখনও।’

‘কী আবার ঘটল?’

‘একটি মেয়ে আমায় বলল সে আমার ফ্যান। আমার সিনেমা দেখতে ওর ভালো লাগে। একটু কথা বলে বুঝলাম আসলে আমার সিনেমা ও দেখেছে কি না সন্দেহ। যে ছবির জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম, সেটার নাম পর্যন্ত জানে না। আমাকে খুশি করার জন্য কথা বলছিল, এর বেশি কিছু নয়।’

‘তাতে তোমার রাগ হয়েছে? ইগোতে লেগেছে?’

‘ঠিক জানি না। একটু অস্বস্তি তো হয়েছে। কলকাতা শহরে থাকে, ফিল্মের পার্টিতে এসেছে, অথচ আমাকে ঠিক করে চেনে না! এটা কি ঠিক হচ্ছে?’

নন্দিতা হাসল। বলল, ‘তুমি ওভার রিয়াক্ট করছ অরিন। পৃথিবীতে সবাই তোমার সিনেমা দেখবে এমনটা এক্সপেক্ট করাটা ঠিক নয়। দেয়ার উইল অলওয়েজ বি এক্সপেশনস।’

ভুরু কুঁচকে নন্দিতার মুখের দিব্যক তাকিয়ে রইল অরিন্দম। বলল, ‘এই কারণেই আমায় আস্তে-আস্তে অ্যাক্টিং থেকে সরে দাঁড়ানো দরকার। দ্য ইয়ং জেনারেশন ডাজ নট কানেক্ট উইদ মি এনি মোর!’

নন্দিতা হাসল। বলল, ‘তোমারও কি বয়স হলে গেল অরিন্দম? ফর্টি-থ্রি আজকের যুগে কোনও বয়স হল? তুমিও তো আমায় বলতে এজ ইজ জাস্ট সামথিং ইন ইয়োর মাইন্ড। এখন তুমি এ কথা বলছ? ইফ ইউ থিন্ক দ্য ইয়ং জেনারেশন ক্যানট কানেক্ট উইদ ইউ, তাহলে তোমার কোনও একট প্রবলেম হচ্ছে। হয়তো তুমিই ইয়ং জেনারেশনের সঙ্গে তোমার কানেকশনটা হারিয়ে ফেলেছ!’

অরিন্দম একটু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মনে পড়ল পার্থ মজুমদারের কথা। পার্থদা নামকরা পরিচালক ছিলেন, তাঁর হাত ধরেই রূপোলি পরদার জগতে প্রবেশ অরিন্দমের। সরকারি ব্যাঙ্কের কেরানির চাকরি ছেড়ে অনিশ্চয় কেরিয়ারে এসেছিল অরিন্দম, সেই আমলে ভবিষ্যতের চিন্তায় খুব মনমরা থাকত সে। অভিনয় ঠিক হচ্ছে কি না তা জানার জন্য বারবার করে পার্থদাকে জিগ্যেস করত, ‘আমি পারছি তো পার্থদা? অভিনয় হবে তো আমাকে দিয়ে?’

পার্থদা একদিন হেসে বলেছিলেন, ‘তোকে একটা কথা বলি, শোন। সিনেমায় স্টার হতে গেলে অভিনয়টা কাজ চালানোর মতো জানলেই হয়। আসল যেটা লাগে সেটা হল অ্যাপিয়ারেন্স। তোর প্রেজেন্স, সেক্স অ্যাপিল। এগুলোই দর্শক দেখবে। তোর সিনেমা দেখার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে কচি-কচি মেয়েরা তোকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করবে। তোর কথা ভেবে তাদের শরীর গরম হয়ে উঠবে। সিনেমার আসল দর্শক ওই আঠেরো-কুড়ি বছরের মেয়েরা, ওদের কাছে যদি নিজেকে ঠিক-ঠিক পৌঁছে দিতে পারিস, তাহলে তোর অভিনয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।’

পার্থদা আজ আর নেই। অতি মদ্যপানে মাত্র সাতষটি বছর বয়সে বছর তিনেক আগে মৃত্যু হয়েছে পার্থদার। পার্থদা থাকলে তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করতে পারত অরিন্দম। তাকে দেখে এখন কি আর মেয়েরা ফ্যান্টাসাইজ করে না? তাদের শরীর গরম হয়ে ওঠে না? অরিন্দম কি তার স্টারডম হারাচ্ছে?

সকাল ন’টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার আগে একবার মা’র সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার চেষ্টা করে নন্দিতা। রোজ পেরে ওঠে না, না পারলে ফোন করে খবর নেয় একবার। আজ হাতে সময় আছে বেশ কিছুটা, ড্রাইভার প্রতুলকে নন্দিতা বলল হিন্দস্থান পার্কে মা’র বাড়িটা একবার ঘুরে যেতে।

দোতলা পুরোনো একটা বাড়ি, বাড়িটায় অনেকদিন সংস্কার হয়নি কোনও। বাড়ির বাইরে একটা ছোট জায়গা, সেখানে ছোটবেলায় নন্দিতা তার ভাইয়ে সঙ্গে পাঁচিলে চক দিয়ে উইকেট এঁকে ক্রিকেট খেলেছে। এখন জায়গাটা একটু জঙ্গল মতো হয়ে আছে, এখানে-ওখানে জন্মেছে অসাবধানী দূর্বাঘাস আর কিছু আগাছা। নন্দিতার ভাইয়ের পুত্রের নাম জোজো—মাত্র তিন বছর বয়স, তার এখনও পাঁচিলে উইকেট এঁকে ক্রিকেট খেলার বয়স হয়নি।

লোহার গেট ঠেলে বাড়িতে ঢোকার মুখে জোজোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নন্দিতার। বসন্তের এই সময়টা কলকাতা শহরের আবহাওয়া বেশ মনোরম। খোলা বারান্দায় মিঠে রোদ এসে পড়েছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে জোজো নিজে-নিজে তার গায়ের সোয়েটার খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। এখন কলকাতা শহরের যা তাপমাত্রা তাতে গায়ে

সোয়েটার পরার দরকার হয় না, তবু নন্দিতার ভাইয়ের বউয়ের বাতিক আছে। তার ধারণা যে কোনও সময়েই জোজোর ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

সোয়েটারটা একা-একা কিছুতেই মাথা থেকে বার করতে পারছে না জোজো, নন্দিতাকে দেখে করুণ মুখে তাকিয়ে বলল, ‘ও পিসি, এটা খুলে দাও না। আমার মাথাটা বড় হয়ে গেছে, সোয়েটার থেকে বেরোচ্ছে না।’

নন্দিতা বলল, ‘আয় এদিকে, খুলে দিচ্ছি। তোর মাথাটা বড় হয়ে গেল কখন?’

‘এই তো এখন। সকালে ছোট ছিল, তখন সোয়েটার ঢুকে গেছিল। এখন বড় হয়ে গেছে, আটকে যাচ্ছে তাই।’

সোয়েটারের গলার কাছে একটা টিপ-বোতাম লাগানো, ওই বোতামের জন্যই সোয়েটারটা খোলা যাচ্ছিল না। বোতাম আলগা করে জোজোকে সোয়েটার থেকে বার করতে-করতে নন্দিতা জিগ্যেস করল, ‘বাবা বেরিয়ে গেছে?’

‘না ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। কর্নফ্লেক্স। ওয়্যাক!’

‘তুই কী খেলি?’

‘জিলিপি, হি হি!’

সোয়েটারটা বারান্দায় বেতের চেয়ারের ওপর দলা পাকিয়ে রেখে দিল জোজো, তারপর পিসির হাত ধরে লাফাতে-লাফাতে ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

পুরনো আমলের বসার ঘর, তার একপাশে টেবিল ফেলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। চেয়ারে বসে তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল শৈবাল, নন্দিতাকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, ‘রাইট অন টাইম। তুই আজকাল একটু দেরি করে আসিস, দেখাই হয় না তোর সঙ্গে।’

‘আমি মোটেই দেরি করে আসি না। তুই-ই বরং আজকাল আগে আগে বেরিয়ে যাস।’

‘আমি ঠিক সাড়ে ন’টায় বেরোই, আজও তাই বেরোব। অপারেশন আছে আজ।’

শৈবাল ডাক্তার, আট বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে বছর পাঁচেক হল কলকাতায় ফিরেছে। বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত শৈবাল, অল্পবয়েসেই

সার্জারিতে বেশ নাম করেছে সে—ভাইয়ের জন্য নন্দিতার সে কারণে একটা গর্ববোধ আছে। নন্দিতার সঙ্গে শৈবালের বয়সের তফাত বছর দুয়েকের, পিঠোপিঠি ভাইবোনেরা অনেকসময়েই বন্ধুর মতো হয়।

শৈবালের স্ত্রীর নাম মিতুন, সে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দিদি তুমি ব্রেকফাস্ট খাবে? দুধ-কর্নফ্লেক্স? না টোস্ট?’

জোজো বলল, ‘পিসি ওসব খায় না। পিসিকে জিলিপি দাও।’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি। এক কাপ চা দাও, তাহলেই হবে।’

চা বানানোর তদারকি করতে রান্নাঘরের দিকে গেল মিতুন, সেই অবসরে শৈবাল বলল, ‘কাল বাবাকে টিভিতে দেখলাম।’

এই বাড়িতে নন্দিতার বাবার প্রসঙ্গ সচরাচর ওঠে না, নন্দিতা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে কারণে একটা ছোট ‘হ’ ছাড়া কিছু বলল না।

শৈবাল বলল, ‘শরীরটা খারাপ দেখাচ্ছিল। কেমন যেন মনে হল।’

‘হয়তো সত্যি ক্লান্ত ছিল, বাবা তো এত ব্যস্ত থাকে সবসময়ে।’

‘হঁ। আমাদের মনে হয় মাঝে-মাঝে যোগাযোগ করা উচিত, বাবাকে দেখি শুধু টিভিতে...’

নন্দিতা একটু বিষণ্ণ বোধ করল। সে বাবার প্রসঙ্গে বেশি কথা বলতে চায় না কখনওই। তবু বলল, ‘ঠিকই বলেছিস। আমাদের বোধহয় একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত।’

জোজো বলল, ‘কাল নিউজে দাদুকে দেখিয়েছে, পিসেমশাইকেও দেখিয়েছে। পিসেমশাই বাবার মতো স্যুট পরেছিল, আমি দেখেছি। তোমায় দেখায়নি কেন পিসি?’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘ও মা! আমায় দেখাবে কেন? আমি কি তোর দাদুর মতো বিখ্যাত নাকি? না পিসেমশাইয়ের মতো ফিল্মস্টার? আমাকে টিভিতে দেখাবে কেন?’

‘বিখ্যাত হলে বুঝি টিভিতে দেখায়?’

‘দেখায় তো।’

‘তা হলে আমিও বিখ্যাত হব। আমাকেও টিভিতে দেখাবে।’

‘বেশ হোস। ঠান্ডা কোথায় রে? সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কোনও?’

‘ঠাকুরঘরে। পূজো করছে। বেরোবে এখন।’

চা খেয়ে ঠাকুরঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল নন্দিতা। নন্দিতার

মায়ের নাম নিরুপমা, মায়ের আদ্যক্ষরে সঙ্গে মিল রেখেই নাকি নন্দিতার নাম রাখা হয়েছিল। শৈবাল উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার নামের আদ্যক্ষর পেয়েছে।

নিরুপমার পূজা শেষ হয়ে গেছিল, নন্দিতাকে দেখে ঠাকুরের আসনের সামনের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে উঠে দাঁড়াল। নিরুপমার শরীর একটু ভারীর দিকে, ইদানীং দুই হাঁটুতেই বাতের ব্যথা শুরু হয়েছে, তার নড়াচড়া করতে একটু কষ্ট হয় আজকাল। এই কারণে দোতলা থেকে আজকার নীচে নামতে চায় না নিরুপমা, বছর দশেক আগে হলেও সকালের এই সময়টা নীচের বারান্দায় বসে সুন্দর রোদটুকু উপভোগ করত।

ঠাকুরের আসন থেকে ওঠার সময়ে সাহায্য করল নন্দিতা, ধরে নিয়ে এল নিজের ঘরের দিকে। নিরুপমা এখন একটু দুলকি চালে হাঁটে, সেই ভঙ্গিতে হাঁটতে-হাঁটতে নন্দিতাকে বলল, ‘কয়েকদিন পরে এলি। ব্যস্ত ছিলি নাকি খুব?’

‘খুব কিছু নয়। হোমের কাজে চাপ বাড়ছে। ওখানে একটু বেশি সময় দিতে হচ্ছে আজকাল।’

‘এই বাড়িতেও একটু সময় দে। তোরা কেউ সময় পাস না, বাড়িটার হাল দেখেছিস একবার? এবারে ছাদটাও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে মাথার ওপর।’

নিরুপমার ঘরের ছাদে সত্যি-সত্যি একটা ফাটল ধরেছে। ফাটলটা দেখা যাচ্ছে সিমেন্টের আন্তরণ ভেদ করে। মাত্র গত বছরই ছাদের ওই অংশটা মিস্তিরি ডেকে সারানো হয়েছিল, সারানোর অংশটাতেই নতুন করে আবার ফাটল ধরেছে। শুধু নিরুপমার ঘরেই নয়, বাড়ির অনেক জায়গারই খারাপ দশা এখন। একতলায় মেঝে অসমান হয়ে গিয়েছে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির রেলিং নড়বড় করে।

নন্দিতার শৈশব কেটেছে এই বাড়িতে, সেই সময়ে বাড়ির হাল এত খারাপ ছিল না। বাবা তার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ির হাল শক্ত করে ধরা ছিল নন্দিতার ঠাকুরদার হাতে। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা শুরু হয়। মন্ত্রী হওয়ার পর এক মহিলার সঙ্গে অদ্ভুত এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বাবা, তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বাবা এই বাড়ি ছেড়ে

সন্টলেকের সরকারি আবাসনে চলে যান, বছর দশেক আগে। অরিন্দমের সঙ্গে নন্দিতার বিয়ের তখন ঠিক তিনমাস বাকি।

এই দশ বছর ধরে বাড়িটার অবস্থা ক্রমে আরও খারাপ হয়েছে, শৈবালের এই বাড়িটার প্রতি কোনও মায়া নেই। মাঝে-মাঝে ঠেকা দেওয়ার জন্য একটু-আধটু সারানোর ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু তার বক্তব্য এই বাড়িটার পিছনে বেশি পয়সা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। চারজনের সংসারে এত বড় বাড়ি কোনও কাজে লাগে না। শৈবালের মত, এই বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে এখানে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করা উচিত। আজকের যুগের ছোট-ছোট সংসারে ছোট ফ্ল্যাটবাড়ির স্বস্তিদায়ক।

নন্দিতার দিকে তাকিয়ে নিরুপমা বলল, ‘হ্যাঁ রে, অরিন, খুব ব্যস্ত বুঝি আজকাল? আসে না তো অনেকদিন?’

‘ব্যস্ত আছে একটু। শুটিং চলছে, আবার নিজে একটা ব্যবসাও শুরু করবে ঠিক করেছে।’

‘কী একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শুনলাম। রাষ্ট্রপতি নাকি নিজে সেই প্রাইজ দিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘একদিন প্রাইজটা নিয়ে আসতে বলিস, দেখব প্রাইজটা। সোনার তৈরি শুনলাম?’

‘সোনার নয়, সোনার রং করা।’

‘না, না সোনারই হবে। রাষ্ট্রপতি যখন দিয়েছে তখন কি আর বাজে জিনিস দেবে?’

‘হবে হয়তো।’

‘ওইটা সাবধানে রাখিস। লকারে তুলে রাখবি। দামি জিনিস চুরি যেন না হয়!’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘আচ্ছা।’ তারপর যোগ করল, ‘এবারে উঠি আমি। কাল-পরশু একবার ঘুরে যাব খন।’

‘কোথায় যাস এখন?’

‘হোমে যাই। এমনিই একটু দেরি হয়ে গেছে।’

আর কথা না বাড়িয়ে মায়ের সামনে থেকে উঠে পড়ল নন্দিতা। মায়ের সামনে আর একটুক্ষণ থাকলেই নন্দিতাদের কেন সন্তান হল না তা নিয়ে মায়ের প্যানপ্যান শুরু হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে

নন্দিতার ভালো লাগে না। কত দম্পতিই তো নিঃসন্তান হয়, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কী আছে?

৪

সন্ধ্যাবেলা দিল্লির ফ্লাইট, আড়াইটের একটু পরেই বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গেল দেবারতি। দেবারতির মেজাজটা কাল রাত থেকেই তিরিক্ষি হয়ে ছিল, আজ বারোটোর একটু পরে তিতির বাড়ির ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেজাজের বিস্ফোরণ ঘটে গেছিল।

দরজায় বেলের শব্দ হতেই বসার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল দেবারতি, তিতির বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়েছিল বাক্যবাণ, ‘কী ভেবেছটা কী তুমি? অসভ্যের মতো যেখানে-সেখানে রাত কাটিয়ে আসবে? যার-তার সঙ্গে শুয়ে বেড়াবে? খুব বেড়েছ তুমি, চড়িয়ে তোমার গাল লাল করে দেব। শুয়ে বেড়ানোর শখ বার করছি তোমার!’

দেবারতি এরকম। রেগে গেলে তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তখন তার মুখে যা আসে সে তা বলে দিতে পারে। বাড়ির কাজের মহিলার সামনে যে এইভাবে নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে নেই, তা মাথায় আসে না দেবারতির।

মায়ের ক’ : আহত হয়ে একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়েছিল তিতির। শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, ‘মা, এইভাবে কথা বলবে না। আমি মোটেই শুয়ে বেড়াচ্ছি না। আমি কাল আটকে গেছিলাম, প্লিজ এ নিয়ে চেষ্টামেছি কোরো না। আই ক্যান এক্সপ্লেন’

‘আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। সব হয়েছে একরকম। রুমির বাড়িতে থাকার নাম করে যেখানে-সেখানে যা খুশি করে বেড়াবে তুমি? ঠিক তোমার বাবার স্বভাব পেয়েছ তুমি। বাড়িতে থাকার নামেই চুলকুনি, খুব উচাটন বেড়েছে তোমার!’

আড়ষ্ট হয়ে তিতির বলেছিল, ‘বাবাকে এর মধ্যে টেনে আনছ কেন মা? বাবা মারা গেছে, বাবার কথা থাক না এখন!’

‘টেনে আনব না কেন? আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে তোমার বাবা, এখন তুমি শুরু করেছ আমাকে জ্বালানো। আমার কি শাস্তি নেই একটু? আমি

কি একটু শান্তিতে থাকতে পারব না তোমাদের জন্য?’

‘মা তুমি চেষ্টাবে না। চেষ্টালে আমিও অনেক কথা বলতে পারি তোমার নামে...’

‘কী বলবে? কী বলবে কী শুনি? আমি যা করেছি সব তোমার জন্য, আমার কোনও উপায় ছিল না বলে। আমি অন্যায় কিছু করিনি।’

এর পরই জ্বলন্ত চোখে দেবারতির দিকে তাকিয়ে তিতির বলেছিল, ‘তুমিই করেছ। তোমার জন্যেই বাবা মারা গেছে। তুমি ওরকম না করলে...’

এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছিল তিতির। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে পর্যন্ত তাকে ঘর থেকে বার করতে পারেনি দেবারতি। দরজা বন্ধ করে একটু পর থেকেই একটু-একটু করে রাগ পড়তে শুরু করে দিয়েছিল, মনে হয়েছিল মেয়েটা একা-একা ঘরে ঢুকে কাঁদছে বোধহয়। বারবার করে ডেকেছিল, ‘তিতির, সোনা, আমার, আমার সঙ্গে বসে সামান্য কিছু খেয়ে নাও। কাল রাতে কিছু খেয়েছিলে কি?’

গতকাল রাতে সত্যি খাওয়া জোটেনি। অনিমেসদা পূজাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। পার্টি থেকে না-খেয়েই রওনা হতে হয়েছিল তিতিরকে। পূজাকে তার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে কোনওরকমে তুলে তার ঘরে এসে তাকে কোনওরকম শুইয়ে দিতে পেরেছিল। পূজার বাড়িতে সম্ভবত সকলেই এই ধরনের কাণ্ডকারখানায় অভ্যস্ত, তারা কেউ ঘুম থেকে উঠে তিতিরদের খোঁজও নিতে আসেনি। সারারাত ঘুম হয়নি তিতিরের, ভোরবেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুম ভেঙেছিল সকাল দশটা নাগাদ, তখন মুখে-চোখে জল দিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ির উদ্দেশে। খাটের উপর তখনও উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল পূজা, ডেকে তোলা যাচ্ছিল না বলে বাড়ি রওনা হওয়ার আগে তাকে কিছু বলে আসার উপায় ছিল না।

অফিসের গাড়ি এসে অপেক্ষা করছিল দুটো থেকেই, সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে পুনরায় তিতিরের দরজায় নক করেছিল দেবারতি। বলেছিল, ‘আমি দিল্লি যাচ্ছি দুদিনের জন্য। প্লিজ লক্ষ্মী হয়ে থেকো। খাওয়াদাওয়া কোরো ঠিকমতো। টাকা লাগলে আমার ড্রয়ার থেকে নিয়ে নিও।’

এই সময়েও কোনও জবাব দেয়নি তিতির, নিজের মনে শুধু বিড়বিড় করেছিল, ‘তোমার টাকা আমি নেব না, আমি তোমার সঙ্গে থাকবও

না। আমি চলে যাব এখান থেকে। আই হ্যাভ গট আ জব মা, আই অ্যাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আই ডোন্ট নিড এনিওয়ান ইন মাই লাইফ।’

মা বেরিয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল তিতির। তারপর ফোনটা তুলে ডায়াল করেছিল রুমিকে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরেই সে ফোনটাকে চার্জে বসিয়ে দিয়েছিল, এখন তার ফোনে আবার পুরে চার্জ দেখাচ্ছে। ওপাশে রুমির গলা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিতির বলেছিল, ‘আমি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি রুমি, তোদের ওখানে আমার থাকার জায়গা হবে?’

রুমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, ‘কী পাগলামো শুরু করলি আবার! বাড়ি ফিরেছিস কখন?’

‘অনেকক্ষণ। ঠিক করে বল, তোর ওখানে থাকার জায়গা হবে?’

‘তুই বাড়িতে থাক, আমি আসছি। পাগলামো করবি না একদম!’

‘আমি এখানে থাকব না। তুইও এখানে আসবি না। এটা আমার বাড়ি নয়। রোজ রোজ এই অশান্তি আমার আর ভালো লাগছে না। তোদের ওখানে জায়গা হবে কি না ঠিক করে বল!’

কুঁদঘাটের ব্রিজটা পেরিয়ে যে রাস্তাটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে একটু ঘুরে তারপর আবার বেহালা চৌরাস্তার দিকে যায়, সেখানে একটু এগিয়ে একটা গলির মধ্যে রুমি থাকে। একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা ফাঁকা, ওপরের তলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে মেয়েদের জন্য, বেড ভিত্তিতে। আস্ত দু-বেডরুমের ফ্ল্যাট, প্রতি ঘরে দুজনের থাকার ব্যবস্থা। প্রতিটা বেডের মাসে দু-হাজার টাকা করে ভাড়া। আপাতত তিনজন আছে ফ্ল্যাটে, একটা বেড ফাঁকা।

গেস্ট হিসেবে এক রাত্তির দু-রাত্তির থাকলে কেউ আপত্তি করে না, কিন্তু পি জি হিসেবে পাকাপাকিভাবে কাউকে এসে থাকতে হলে বাড়িওয়ালির সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাড়িওয়ালি অবশ্য কাছেই থাকেন, একটু এগিয়ে তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে আসা যায়। সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে দু-মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হয়, আর সেইসঙ্গে দুটো ছবি জমা রেখে একটা ফর্ম ভরতি করতে হয়। রুমি এই ফ্ল্যাটে প্রায় তিনবছর ধরে আছে, সে তিতিরকে নিয়ে বাড়িওয়ালির কাছে গেলে তিনি না করবেন বলে মনে হয় না।

একটু ইতস্তত করে রুমি বলল, ‘ব্যবস্থা একটা করা যাবে। বাট, আই

সাজেস্ট তুই মায়ের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নে।’

‘আমার কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতে হবে না, তুই থাক বাড়িতে। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।’

বাড়িওয়ালি মানুষটা সাদামাটা। তিতিরকে কোনও প্রশ্ন করলেন না, সে অরিন্দম মুখার্জির কোম্পানিতে কাজ করে শুনে চোখ গোলগোল করে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি অরিন্দম মুখার্জিকে চেনো?’

তিতির মাথা নেড়ে ‘আমার সঙ্গে আলাপ আছে’ বলাতে তিনি আপ্লুত হলেন। সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তিতিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা বাড়িটা একটু গুছিয়ে রেখো বাবা, কোনওদিন এখানে এসে তিনি যেন আমাদের খারাপ না ভাবেন।’ তারপর তিতিরের ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে বললেন, ‘অরিন্দম কোনওদিন এখানে এলে আমাকে জানাবে, আমি দেখা করতে আসব! টালিগঞ্জ তো কাছেই, এখানে শুটিং হলেও বলবে।’

তিতির নিজে কখনও শুটিং দেখেনি, তার কোনও ধারণা নেই শুটিংয়ে কী হয়। তবু বাড়িওয়ালির কথায় ঘাড় নেড়ে সে জানিয়ে দিল তাঁকে শুটিং দেখানোর ব্যবস্থা সে অবশ্যই করবে।

মাস পড়তে আরও চারদিন বাকি, ঠিক হল চারদিন পর থেকে তিতির খাতায়-কলমে এখানকার বোর্ডার হবে। আগের চারদিন সে ভাড়া না দিয়ে এমনিই থাকতে পারে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা তুলে এনেছিল তিতির, সেই টাকাও পুরো নিলেন না ভদ্রমহিলা। একমাসের ভাড়া অ্যাডভান্স নিয়ে বললেন বাকি টাকাটা পরের মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে দিলেই হবে।

রুমিদের ফ্ল্যাটে এসে তিতির জিগ্যেস করল, ‘এখন একটু কফি খেলে কেমন হয় রে? তোদের এখানে ব্যবস্থা আছে?’

রুমিদের ফ্ল্যাটে একটা পুরোদস্তুর রান্নাঘর আছে, সেখানে একটা ইলেক্ট্রিক হিটারের ব্যবস্থা। চা কফি যে-যার নিজের মতো করে নেয়, প্রয়োজনে ডিমসেদ্ধ বা ইনস্ট্যান্ট নুডলসও করে নেওয়া যায়। রান্না করার আয়োজন করা যায় না ছোট হিটারে, সে কারণে খাবার আসে বাইরে থেকে। স্টিলের টিফিন কেঁরিয়ারে করে ডাব্বা সিস্টেম অনেক জায়গার মতো এখানেও চালু আছে।

রান্নাঘরে গিয়ে কফির শ্যাসে থেকে ইনস্ট্যান্ট কফি বানাতে-বানাতে রুমি বলল, ‘খাবারের ব্যাপারটা কী করবি? সামনের মাস থেকে চালু

করে নিস। সকালে ব্রেকফাস্ট আর রাতে মিল দিয়ে যায়। তুই যদি দুপুরেও খেতে চাস তাহলে আলাদা করে বলে দিতে হবে।’

তিতিরের খাওয়াদাওয়া নিতে কোনও সমস্যা নেই, যা কিছু হোক খেয়ে নিলেই চলে। সে খাবারের বিষয়ে মাথা ঘামাল না বিশেষ, কফির কাপে চুমুক দিয়ে বসার ঘরে এসে টিভিটা চালিয়ে দিল। টিভিতে শঙ্করলালকে দেখাচ্ছে, জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও বন্টন নিয়ে দিল্লিতে সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রীদেবর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কী একটা মিটিং আছে, তা নিয়ে দুপুরবেলা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে শঙ্করলাল।

শঙ্করলালের মাথার সামনের দিকটায় টাক, টাকের পাশ দিয়ে সাদা চুল খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে। শঙ্করলাল কথা বলেন একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে, কথা শুনলে মনে হয় আপামর দেশবাসীর ওপর কোনও কারণে ভয়ানক রেগে আছেন। জননেতা হিসেবে শঙ্করলাল মোটেই জনপ্রিয় নন, তবু গত কুড়ি বছর ধরে তিনি রাজ্য সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দলের প্রয়োজনে দিল্লিতে ছিলেন রাজ্যসভায়, তারপর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রথমে মন্ত্রী করা হয়। এখন রাজ্যের পরিকাঠামো বোর্ড না কিসের যেন অধিকর্তা। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তাঁর বেশ নামডাক আছে।

তিতিরের মনে হল শঙ্করলালকে যেন আজ একটু নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। এমনিতে তিনি কথা বলেন জোরের সঙ্গে, কথায়বার্তায় সব সময়ে একটা কনফিডেন্সের ছোঁওয়া থাকে। আজ যেন শঙ্করলাল ক্লান্ত, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অত্যন্ত দায়সারা ভাবে। তিতিরের মনে হল, শঙ্করলালের যেন হঠাৎ করে বয়স হয়ে গিয়েছে।

কত বয়স হবে শঙ্করলালের এখন? মায়ের সঙ্গে একদিন শঙ্করলালকে নিয়ে কথা বলেছিল তিতির। মায়ের হিসেব মতো শঙ্করলালের এখন তেষট্টি বছর হওয়ার কথা। মায়ের বয়স ঊনপঞ্চাশ হল গত মাসে। শঙ্করলালের থেকে মা চোদ্দো বছরের ছোট। মা আর বাবা সমবয়সি ছিল, বাবা বেঁচে থাকলে তার এখন পঞ্চাশ হত।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে রুমি বলল, ‘কী সব বোরিং নিউজ দেখিস! এই পলিটিশিয়ানদের দেখার কী আছে বল তো! ডিসগাস্টিং!’

তিতির কিছু বলল না, কিন্তু টিভিতে চ্যানেল পালটানোর আগেই পর্দায় ভেসে উঠল অরিন্দমের মুখ। হাসতে হাসতে টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছে

অরিন্দম, জানাচ্ছে তার নতুন ব্যবসার পরিকল্পনার কথা। টিভিতে কালকের রাতের পার্টির ছবিও দেখাচ্ছে, তাই দেখে একটু নড়েচড়ে বসল তিতির। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে তার কত বয়স হতে পারে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল মনে-মনে।

রুমি বলল, ‘এই লোকটা কিন্তু অ-সাম। বাংলা সিনেমার ওনলি প্রেজেন্টেবল ফেস। আমার দারণ লাগে অরিন্দমকে। বাড়িওয়ালি দেখলি কেমন এক কথাতেই গলে গেল?’

রুমির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিতির বলল, ‘কাল এই পার্টিতেই গেছিলাম, বুঝলি?’

রুমি অবাক হয়ে তাকাল তিতির দিকে, তারপর বলল, ‘ওয়াও ম্যান! ইউ ওয়্যার উইদ দ্য বিগ পিপল লাস্ট নাইট! ইউ আর হ্যাপেনিং। আমি ভেবেছিলাম তুই বাড়িওয়ালিকে বানিয়ে বানিয়ে বলছিস।’

‘মোটাই না!’

‘দাঁড়া, ভালো করে দেখতে দে আগে, তোকে দেখায় কি না দেখি।’

তিতিরকে দেখাল না টিভিতে, ভাগ্যক্রমে পূজাকেও দেখাল না একটুও। পূজা খুব মাতাল ছিল কাল, মাতালদের সম্ভবত টিভিতে দেখানোর নিয়ম নেই। তিতির মন দিয়ে টিভি দেখতে-দেখতে কফি খেতে লাগল।

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই নিজের থাকার ব্যবস্থাটা গুছিয়ে নিল তিতির। সে রুমির সঙ্গেই রুম শেয়ার করবে বলে ঠিক হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে তিতির বেশ নিশ্চিত বোধ করল। এই ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দাদের ভালো করে চেনে না তিতির, তাদের কারও সঙ্গে ঘর শেয়ার করতে হলে তিতিরের একটু অসুবিধে হত। অন্য বাসিন্দাদের একজন মধুমিতাদি, সে তিতিরদের থেকে বয়সে কিছুটা বড়—সরকারি কী একটা দফতরে চাকরি করে। অন্য মেয়েটি সনিয়া, সে এসেছে সিকিম থেকে, সেক্টর ফাইভের কলসেন্টারে কাজ করে।

ঘরে দুটো খাট রয়েছে, একটা ছোট ওয়ার্ডরোব, সেইসঙ্গে একটা ছোট রাইটিং টেবিল। দেওয়ালে একটা আয়নাও রয়েছে, মেয়েদের জন্য ওই আয়না থাকাটা খুব জরুরি। ওয়ার্ডরোবটার দুটো পাল্লা, দুটোতেই আলাদা করে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা পাল্লা রুমি ব্যবহার করে, অন্য দিকটা তিতিরের বলে সাব্যস্ত হল।

তিতির বাড়ি থেকে বেরিয়েছে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে, বেশি জামা-কাপড় সে সঙ্গে আনেনি। ব্যাগ থেকে জামা-কাপড় বার করে ওয়ার্ডরোব গুছিয়ে নেওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে, আপাতত সে ব্যাগটা রেখে দিল তার দিকের পাশের মধ্যে। তালা কিনে নিজের দিকের পাশে বন্ধ করে রাখার কথা সে ভাবল না একবারও। রুমিকে সে বিশ্বাস করে— তা ছাড়া, তার কাছ থেকে চুরি করার মতো আছোটাই বা কী?

এই ফ্ল্যাটের ব্যবস্থাপনা এমনিতে বেশ পছন্দ তিতিরের। বেশ একটা সাজানো-গোছানো ব্যাপার আছে, পূজার বাড়িটাই তুলনায় এর থেকে অনেক বেশি অগোছালো। রান্নাঘরটাও মন্দ নয়, বসার ঘরে একটা টিভি আর-একটা ফ্রিজও আছে। বাইরের কেউ ছুঁতে পারে চলে এলে বাড়িওয়ালি আপত্তি করেন না, বসার ঘরে অতিথিকে বসিয়ে আপ্যায়ন করার ব্যবস্থাও করা রয়েছে। সব থেকে বড় কথা, এই বাড়িতে ঢোকা-বেরোনা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। অন্যান্য লেডিজ হস্টেলের মতো এখানে রাত এগারোটার মধ্যে সদর দরজায় তালা পড়ে যায় না, অনেক রাত করে এখানে ফিরলেও কারও কিছু বলার নেই।

এমনিতেও লেডিজ হস্টেলের নিয়মকানুনগুলো কলকাতা শহরে একটু-একটু করে পালটাচ্ছে, অনেকেই আজকাল কলসেন্টারে কাজ করে দিনে ঘুমোয়, রাতে বাইরে থাকে। কাজ শুরু হলে তিতিরেরও এরকম হতে পারে, অনিমেদা বলে দিয়েছে অনেক সময়েই সারারাত ধরে শুটিং হয়।

নিজের খাটে পা তুলে আয়েস করে বসে জিন্সের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করল তিতির। রুমি সিগারেট খায় না, এই ঘরে সে কারণে কোনও অ্যাশট্রের ব্যবস্থা নেই। রুমি রান্নাঘর থেকে একটা হাতল ভাঙা কাপ এনে দিল, সেটাই আপাতত তিতিরের অ্যাশট্রে হবে। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে রুমির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোর কাছে নুডল আছে? আমার খিদে পেয়েছে, কাল রাত থেকে কিছু খাইনি।’

তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রুমির মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্ট দানা বেঁধে উঠল। তিতিরের মুখটা খুব ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে, চোখের কোণটা যেন একটু চিকচিক করছে। কাল থেকে না খেয়ে আছে তিতির, অথচ রুমি কাল তিতির সম্পর্কে কত কী ভেবেছে! ভেবেছে সে সারারাত অন্য ছেলের সঙ্গে ছিল, তাকে চুমু খেয়েছে, তার সঙ্গে কী না কী করে

বেরিয়েছে। রুমির খুব হিংসে হয়েছিল, সারা রাত্তির সে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি।

রুমি মাথা নেড়ে জানাল তার কাছে নুডল আছে। বলল, ‘করে দিচ্ছি তোকে। তুই নিশ্চিন্তে বোস।’

সন্দের সময়ে রুমির কোচিং ক্লাসে যাওয়ার ছিল, তিতির তার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। তাকে কলকাতা শহরে আপাতত একা-একা সময় কাটাতে হবে, সে ঠিক করল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কাছে বৈষ্ণব মঠে বসে কীর্তন শুনবে। সময় পেলে এখানে সে মাঝে-মাঝেই চলে আসে, সমবেত কীর্তনে কিছুক্ষণের জন্য তার মন ভালো হয়ে যায়। তিতিরের দেবদ্বিজে খুব একটা ভক্তি নেই, তবু এই মঠে আসতে ভালো লাগে তার।

এই মঠে প্রথমবার তিতির এসেছিল বছর তিনেক আগে, তার বাবার মৃত্যুর পরে। হাতিবাগানে বাবার পৈতৃক বাড়িতে বাবার শ্রাদ্ধের আয়োজনে যেতে মা রাজি হয়নি, ঘাটকাজের পরের দিন আলাদা করে বাবার জন্য এই মঠে শ্রাদ্ধাঙ্গাপনের ব্যবস্থা করেছিল। বাবার ছবি রাখা হয়েছিল দেওয়ালের একপাশে, সেই ছবি চন্দনে শোভিত হয়েছিল, সাজানো হয়েছিল রজনীগন্ধার আভরণে। ওই ছবির সামনে মঠের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রাদ্ধতর্পণে বসতে হয়েছিল তিতিরকে। নিজের সন্তানের হাতে শ্রাদ্ধাদি না হলে মানুষের আত্মার নাকি মুক্তি ঘটে না। বেঁচে থাকার সময়ে যত মনোমালিন্যই থাক, মৃত্যুর পর সবাই সবাইকে মুক্তি দিতে চায়।

এই মঠে এলে তিতিরের মনে হয় বাবা যেন এখনও আছে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে বসে তাকে দেখছে। ওই ছবির মতো করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মায়ের কারণে বেঁচে থাকাকালীন বাবার সঙ্গে তিতিরের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছিল। বাবার মৃত্যুর পর নতুন করে সেই যোগাযোগের কথা মনের মধ্যে টের পায় তিতির।

মঠে কীর্তন শুরু হবে এখনই। মঠের গেরুয়াধারী মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীরা সে কারণে হলঘরে সমবেত হতে শুরু করেছেন এক-এক করে। মার্বেলের মেঝেতে আসন পেতে বসে পড়ছেন।

ঐদের থেকে একটু দূরে, কোণের দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল তিতির। তার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধছে ক্রমে। সে ভেবেছিল

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার ফলে তার খুব আনন্দ হবে, নিজের স্বাধীনতায় সে ভেসে যাবে বাঁধনহারা খুশিতে। বাস্তবে সেরকম কিছু হচ্ছে না, বরং তার মনখারাপ লাগছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বাবার কথা ভাবল তিতির। মনে-মনে বলল, ‘বাবা আমি আজ বাড়ি থেকে চলে এসেছি। জানি, আমার জন্য মায়ের খুব কষ্ট হবে। তুমি মা’কে ভালো রেখো বাবা, মায়ের যেন কোনও কষ্ট না হয়!’

৫

দিল্লির এই সরকারি গেস্টহাউসটা দেবারতির বহুদিনের চেনা। সরকারি কাজে দিল্লিতে এলে প্রথম থেকেই এই গেস্টহাউসেই উঠতে হত দেবারতিকে; হেইলি রোডে রাজ্য-সরকারের বহুতল গেস্টহাউসটা তখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। এই গেস্টহাউসটাও রাজ্য সরকারের, সেচ দফতর আর জলসম্পদ উন্নয়ন দফতরের যৌথ উদ্যোগে বানানো। একটা সময়ে এই গেস্টহাউসে অনেক আমলাই এসে উঠতেন, কিন্তু এখন দিল্লির কেন্দ্রবিন্দুতে আধুনিক গেস্টহাউস তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এই ছোট গেস্টহাউসটা অনেকাংশেই অব্যবহৃত।

দেবারতি অবশ্য এখানে থাকতেই পছন্দ করে। একটু পুরোনো হলেও এখানকার ব্যবস্থাপনা ভালো। অন্য গেস্টহাউসটাতে সব সময়েই বড় ভিড় থাকে, প্রয়োজনের তুলনায় স্টাফ কম, ফোনে বারবার করে চাইলেও ঘর অবধি চা এসে পৌঁছয় না। এখানকার কেয়ারটেকার অনেক বেশি কর্মক্ষম, রুম সার্ভিস দেয় হাসিমুখে।

কেয়ারটেকারের নাম বিমল। আসলে দার্জিলিংয়ের মানুষ, কিন্তু বারবারে বাংলা বলে। গাড়ি করে গেস্টহাউসে পৌঁছনো মাত্র বিমল হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল দেবারতিকে, বলল, ‘ভালো আছেন দিদি? একা এলেন? সাহেব আসেননি?’

‘সাহেব আসছেন। তবে একটু বেশি রাতের ফ্লাইটে আসবেন। তুমি কেমন আছো?’

‘ভালো আছি ম্যাডাম। রাতে মাছ খাবেন তো? আপনারা আসছেন

শুনে আমি নিজে গিয়ে বেনফিসের কাউন্টার থেকে মাছ কিনে এনেছি।’

দেবারতি হাসল। দিল্লি শহরের সব অঞ্চলে বাঙালির পছন্দের মাছ পাওয়া যায় না বলে এখানে রাজ্য সরকারের আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের মাছ বিক্রির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সেই কাউন্টারে মাছের সাপ্লাই মন্দ নয়, খোদ কলকাতাতেই অনেক সময় অত ভালো সাপ্লাই থাকে না। দেবারতি মাছের খুব কিছু ভক্ত নয়, কিন্তু শঙ্করলাল যে ভালো মাছ পেলে খুব খুশি হন, সেটা বিমল খুব ভালো করে জানে।

দেবারতি ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বিমলের হাতে গুঁজে দিল। বলল, ‘ভালো করে এক কাপ চা বানাও তো দেখি। আমি ঘরে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।’

বিমলকে এই পঞ্চাশ টাকা দেওয়াটা বেআইনি। বিমল সরকারি কর্মচারি, তাকে কোনও টিপস দিতে দেখলে শঙ্করলাল আপত্তি করত। সে কারণে বিমলের টিপস সব সময়ে আলাদা করে আড়ালে দিয়ে দেয় দেবারতি। শঙ্করলাল এখনও পুরোনো আমলের মানুষ, অহেতুক কাউকে টাকা দিয়ে খুশি করার ব্যাপারটা তার পছন্দ হয় না। অনেক সরকারি কাজে এখনকার আমলে টাকাকড়ি লেনদেন করাটাই প্রথা, সে কথাও বুঝতে চায় না শঙ্করলাল। একমাত্র পার্টি ফান্ডের প্রয়োজন ছাড়া তাকে টাকা দিয়ে ভোলানো যায় না।

শঙ্করলালের সঙ্গে দেবারতির পরিচয় এখন প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল। দেবারতি তখন রাজ্য সরকারের সায়েন্টিফিক অফিসার, দিল্লিতে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে এসে শঙ্করলালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তখন শঙ্করলাল দিল্লির নামকরা তরুণ সাংসদদের মধ্যে একজন, পার্টির প্রয়োজনে একটু-একটু করে সে চলে আসছে পাদপ্রদীপের আলোয়।

সেই সময়ে রাজ্যে জলে আর্সেনিক দূষণের বিষয়টা ক্রমে একটু-একটু করে ধরা পড়ছে, যেখানে-সেখানে টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে সরকারের সংশয় হতে শুরু করেছে। অন্যভাবে পানীয় জল সরবরাহ করতে গেলে অনেক টাকা লাগবে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা জোগাড় করা দরকার। আর্সেনিকের সমস্যা তখনও ভালো করে কারও নজরে আসেনি। কেন্দ্রের নজরে আনার জন্য দেবারতিদের একটা ছোট টিমকে পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে।

দিল্লির অফিসারদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা বলে বিশেষ কোনও

লাভ হয়নি। দেবারতিদের সায়েন্টিফিক লেখাপত্রগুলোতে দিল্লির আমলারা চোখ বুলিয়েছিলেন, তারপর ‘ঠিক আছে আমরা দেখছি’ বলে সরিয়ে রেখেছিলেন টেবিলের এক কোণে। দেবারতি বুঝেছিল আমলা এবং সায়েন্টিফিক অফিসারের মাধ্যমে এই আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না, এর জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। দেবারতি তার সুযোগ পেয়েছিল শঙ্করলালের মাধ্যমে।

শঙ্করলাল তখন রাজ্যের রাজনীতিতে একজন উঠতি নেতা। রাজনীতিতে দেবারতির কোনওদিনই আগ্রহ নেই, সে শঙ্করলালকে প্রথমে সে কারণে চিনতে পারেনি। তখন শঙ্করলালের বয়স কম, সে গেস্টহাউসে তার পরিচিত কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গেস্টহাউসের বসার ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। দেবারতি নেতা হিসেবে চিনতে না পারলেও শঙ্করলালের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। শঙ্করলাল সুদর্শন, সেইসঙ্গে তাঁর সুঠাম স্বাস্থ্যের প্রতি যে-কোনও মানুষেরই নজর পড়তে বাধ্য। তখনও শঙ্করলালের মাথার সামনের দিকে চুল উঠে যায়নি।

ঘরের অন্যদিকে বসে বিকেলে আসা বাংলা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল দেবারতি। তার কানে ভেসে আসছিল শঙ্করলাল ও তার পরিচিত ব্যক্তিটির কথোপকথন। তারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিল, সেইসঙ্গে এখানে কী করে রাজ্যের প্রসঙ্গ আরও বেশি করে উত্থাপন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছিল। শঙ্করলালের বক্তব্য ছিল; দিল্লিতে কেবল রাজনীতি নিয়েই আলোচনা হয়, রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কেউ কিছু করে না।

একটা সময়ে থাকতে না পেরে দেবারতি শঙ্করলালের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘আপনি সত্যি-সত্যি এ ব্যাপারে যদি সিরিয়াস থাকেন, তাহলে আমাদের একটু সাহায্য করুন না। আমি এখানে পশ্চিমবঙ্গের কাজেই এসেছিলাম, কিন্তু এসে বুঝতে পারছি আমার মতো একজন সায়েন্টিফিক অফিসারের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়।’

তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে দেবারতির এই অযাচিত অনুপ্রবেশে শঙ্করলাল ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল তার দিকে। জিগ্যেস করেছিল, ‘আপনি কে? আপনাকে কি আমি চিনি?’

দেবারতি বলেছিল, ‘না চেনেন না। আমিও চিনি না আপনাকে। কিন্তু চিনে নিতে কিসের অসুবিধে?’

নিজের পরিচয় দিয়ে এর পরে দেবারতি রাজ্যের জলের সমস্যার কথাটা বলেছিল। বলেছিল, সে একজন সাধারণ সায়েন্টিফিক অফিসার মাত্র। সে কারণে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে কেউ শুনছে না। রাজনীতি এবং আমলারা বৈজ্ঞানিকদের কথা শোনার প্রয়োজন মনে করেন না, নইলে এই সমস্যার গুরুত্বটা তাঁর বুঝতে পারতেন।

শঙ্করলাল দেবারতির কথা শুনে উৎসাহী ছিল, তাকে কাগজপত্র খুলে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট বোঝাতে শুরু করে দিয়েছিল দেবারতি। একটা সময় নিজের লেকচার থামিয়ে বলেছিল, ‘আমি বোধহয় বেশি সায়েন্টিফিক টার্মিনোলজিতে কথা বলছি, আপনার হয়তো অসুবিধে হচ্ছে!’

মুচকি হেসে শঙ্করলাল বলেছিল, ‘আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বিজ্ঞান বিষয়টা আমি একটু-একটু বুঝি।’

দেবারতির বিশ্বাস হয়নি শঙ্করলালের কথা। তার ধারণা ছিল যে-কোনও রাজনীতিবিদের মতোই শঙ্করলালও বড়-বড় কথা বলতে পারদর্শী, বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলাটা ওই চালবাজির একটা অঙ্গ। ভুলটা ভেঙেছিল একটু পরে, যখন দু-একটা বিষয়ে একটা-দুটো করে ক্রিটিকাল প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল শঙ্করলাল। আরও ভালো করে বোঝাতে শুরু করেছিল দেবারতি। ভালো ছাত্র পেলে যে কোনও মাস্টারমশাই যেমন বিষয়টা বোঝাতে উৎসাহী হয়ে পড়ে, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম ছিল।

পরে বুঝেছিল শঙ্করলালকে নিতান্তই সাধারণ একজন রাজনীতিবিদ ভেবে বিজ্ঞান বিষয়ে তাকে অজ্ঞ ভাবাটা তার ভুল হয়েছিল। শঙ্করলালও বিজ্ঞানের ছাত্র, কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে গেছিল ইংল্যান্ডে। সেখানে পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতেখড়ি হয়েছিল বামপন্থী রাজনীতিতে। শিক্ষান্তে দেশে ফিরে সামান্য কিছুদিন চাকরি করে সে পুরোপুরি চলে এসেছিল রাজনীতিতে।

দেবারতিও উচ্চশিক্ষিত। তার পড়াশুনা শান্তিনিকেতনে, সেখান থেকে রসায়নে স্নাতক হওয়ার পরে উচ্চশিক্ষার জন্য গেছিল আইআইটি-তে। পরিবেশ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি, তারপরে উচ্চশিক্ষার গতানুগতিক নিয়ম মেনে ডক্টরেট, তারপর মুম্বাইয়ের বিখ্যাত গবেষণা সংস্থায় পোস্ট-ডক্টরেট কাজ। শিক্ষার জগতেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল দেবারতির, উপায়ন্তরে সে চলে এসেছিল সরকারি চাকরিতে। তার স্বামী অর্য্যকমল ভাগ্যাবল্ড বেকার। নিজের এবং সংসারের প্রয়োজনেই দেবারতির চাকরির প্রয়োজন

হয়ে পড়েছিল।

গেস্টহাউসের ঘরে ঢুকে বাথরুমে গেল দেবারতি। মুখে-চোখে জল দিল ভালো করে। গতকাল সারা রাত তিতিরের চিন্তায় তার ঘুম হয়নি এক বিন্দু। এখন বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হয়। পোশাক বদলে খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল দেবারতি। প্রায় তখনওই ট্রে-তে করে চা সাজিয়ে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল বিমল। ক্লান্ত চোখে বিমলের দিকে তাকিয়ে দেবারতি বলল, ‘টেবিলের ওপর রেখে যাও। চা আমি বানিয়ে নিচ্ছি।’

একটু আগেই দেবারতি ভালো করে চা বানিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল বিমলকে। এখন তার চা খেতে ইচ্ছে করছে না। সে একটুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য চোখ বুঝল, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল অচিরেই।

এগারোটা নাগাদ দেবারতির ঘুম ভাঙল শঙ্করলালের ডাকে। শঙ্করলাল রাতের ফ্লাইটে দিল্লি এসেছে, ফ্লাইট একটু দেরি করে এসে পৌঁছোনোয় গেস্টহাউসে আসতে আধঘণ্টা দেরি হয়েছে তার। গেস্টহাউসে ঢুকেই রাতের খাবারের মেনু কী সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ফেলেছে শঙ্করলাল, দু-রকমের মাছ আছে শুনে মনে-মনে খুশিও হয়েছে। আলাদা করে একটু মাছ ভাজা প্লেটে করে সাজিয়ে দেওয়ার অর্ডার দিয়ে শঙ্করলাল এর পর দেবারতির নাম ধরে দু-তিনবার ডাকাডাকি করে, দেবারতির ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে।

এমনিতে দেবারতির ঘুম খুব পাতলা, কোনও কারণে আজ সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শঙ্করলালের ডাকে সে একটু অবাক হয়ে তাকাল, জিগেস করল, ‘এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কী করে? বলেছিলে তো আটটার ফ্লাইট নেবে। তুমি কি আমার পরের ফ্লাইটেই এসেছ নাকি?’

শঙ্করলাল বলল, ‘আটটার ফ্লাইটেই এসেছি। ক’টা বাজে জানো? এগারোটা প্রায়। মাছভাজা দিতে বলেছি, একটু খাবে তো এখন?’

রোজ রাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসা শঙ্করলালের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। দেবারতির এ ব্যাপারে খুব অদম্য উৎসাহ কিছু নেই, কিন্তু শঙ্করলালকে সঙ্গ দিতে তার ভালোই লাগে। আজ সে একটু অন্যমনস্কের মতো তাকাল শঙ্করলালের দিকে। বলল, ‘আমার আজ খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও। আমি কালকের মিটিংয়ের কাগজপত্র নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি।’

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জলবন্টন নিয়ে কাল থেকে বিজ্ঞান ভবনে

জোরদার আলোচনা শুরু হবে, সেখানে রাজ্যের হয়ে প্রাথমিক বক্তব্যগুলো পেশ করার দায়িত্ব দেবারতির ওপর পড়েছে। খুব সোজা নয় কাজটা, জল সব রাজ্যেরই কাজে লাগে, কেউ নিজের জায়গার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জল অন্য রাজ্যকে দিতে চায় না, এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সব সময়েই একটা সমস্যা আছে। দেবারতি বিজ্ঞানী হলেও ইদানীং তাকে জলবন্টনের মতো জটিল সামাজিক বিষয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছে; পরিবেশ-বিজ্ঞানের অনেকটাই এখন সামাজিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবারতি নিজেও জলসম্পদ উন্নয়ন বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব নিয়ে দেখে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতো তারও ধারণা, পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াবে পানীয় জলের অভাব।

দেবারতি তার ল্যাপটপ খুলে রাজ্যের তরফ থেকে নিজের প্রেজেন্টেশন নিয়ে বসার আগে একবার সেলফোন বার করে তিতিরকে ডায়াল করল। তিতিরের জন্য তার এখনও মনটা খুঁতখুঁত করছে, সর্বোপরি দিল্লিতে এসে তিতিরকে ফোন করে খোঁজ নেওয়ার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দিল্লিতে রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত তিতির খায়নি, এখন তার মেজাজ কেমন আছে কে জানে। তিতিরকে সে আজ খুব খারাপভাবে বকেছে, তার জন্য এখন অনুশোচনা হচ্ছে দেবারতির।

দু-তিনবার ডায়াল করেও তিতিরকে পাওয়া গেল না। প্রথমে লাইনই লাগল না, তারপর রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল, ও প্রান্তে কেউ ফোন ধরল না। মাত্র এগারোটা বাজে, তিতির কি এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি সে মায়ের অনুপস্থিতিতে আজও বেরিয়ে পড়েছে বাইরে রাত কাটাতে? রুমিকে ফোন করে একবার খবর নেমে কি না ভাবল দেবারতি, তারপর ফোন করল না শেষ পর্যন্ত। এমন কিছু রাত হয়নি, অকারণে এখনই কাউকে ফোন করে বিব্রত করাটা ঠিক হবে না। তিতির হয়তো বসার ঘরে বসে টিভি দেখছে, তার ফোনের শব্দ শুনতে পায়নি। কল রেজিস্টারে মায়ের নাম দেখে নিজের থেকেই হয়তো ফোন করবে তাকে।

দেবারতির মনের প্রতিচ্ছবি তার মুখে এসে পড়ে। শঙ্করলাল বিচক্ষণ ব্যক্তি, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে দেবারতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অস্বস্তিটা বুঝতে অসুবিধে হল না শঙ্করলালেরও। এই মহিলাকে সে ভালোবাসে, তার মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখে শঙ্করলালের বুকের মধ্যেটা

চিনচিন করে উঠল। শঙ্করলাল জিগ্যেস করল, ‘তুমি এত কী ভাবছ বলো তো?’

একটু অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে দেবারতি তাকাল শঙ্করলালের দিকে। তারপর বলল, ‘জানো, তিতির কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। কাল সারারাত বাড়ি ফেরেনি, আমি ওকে তা নিয়ে বকার সময়ে কেমন যেন টারা ভাবে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ঘাড় কাত করে, ঠিক অর্ধ্যকমল যেভাবে তাকিয়ে থাকত। ওর আচারে-ব্যবহারে এত মিল অর্ধ্যকমলের সঙ্গে, আমার কেমন যেন ভয় করে আজকাল...’

অর্ধ্যকমলের সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় ছিল না শঙ্করলালের। কিন্তু সে জানে তিতিরের খুব ছোটবেলাতেই অর্ধ্যকমলদের উত্তর কলকাতার বাড়ি থেকে তিতিরকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল দেবারতি। বাবার সঙ্গে তিতিরকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হত না কোনওভাবেই। ঘাড় কাত করে টারা ভঙ্গিতে অর্ধ্যকমল দেবারতির দিকে তাকিয়ে থাকত কি না, তা তিতিরের জানার কথা নয়।

সামান্য একটু হেসে শঙ্করলাল বলল, ‘তোমার মনের ভুল দেবারতি। তিতির তোমার মেয়ে, তিতির ভালো না হয়ে পারে না। তুমি চিন্তা করো না কখনও, এই বয়সে সকলেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, ওসব নিয়ে ভাবতে নেই বেশি।’

‘না শঙ্কর, তিতির তার বাবারও মেয়ে, সে কারণেই আমার ভয় করে সব সময়ে।’

‘অর্ধ্যকমলও তো খারাপ ছিল না। ও অন্যরকম ছিল, তোমার সঙ্গে বনিবনা হয়নি। তাই বলে সে খারাপ ছিল এমন কথা কি বলা যায়?’

অভিমানভরা চোখ নিয়ে দেবারতি তাকাল শঙ্করলালের দিকে। বলল, ‘জানি, সবাই একথাই বলে। আমি আসলে খারাপ। তোমার বাড়ির লোকেরাও আমাকেই খারাপ ভাবে। আমার মতো একটা খারাপ মেয়ের জন্য তুমি তোমার সংসার ছাড়তে বাধ্য হয়েছ। আমি নিজে সংসার করতে পারিনি, অন্যের সংসার ভেঙেছি, আসলে খারাপ তো আমিই। তিতিরও আমাকেও খারাপ ভাবে। আমাকে আজকে সেকথা বলেওছে।’

দেবারতির চোখের কোল জলে ভরে উঠেছে। যে কোনও মুহূর্তে অশ্রু গড়িয়ে পড়বে টপ করে। দেবারতি এমনিতে খুব কঠিন স্বভাবের, খুব চট করে চোখ থেকে বন্যা নামানোর পাত্রী সে নয়। দেবারতির মুখের

দিকে তাকিয়ে শঙ্করলাল বিষণ্ণ বোধ করল, তার বুকের মধ্যেটা চিনচিন করে উঠল পুনরায়। অক্ষুটে বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? তিতির কী বলেছে তোমায়?'

শঙ্করলালের এই কথায় দেবারতির অশ্রু আর বাঁধ মানল না কোনও। ডুকরে কেঁদে উঠল দেবারতি। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'তিতির বলেছে অর্ধ্যাকমলের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ি। আমার জন্যই তিতিরের বাবা মারা গেছে! আমি নাকি খুন করেছি অর্ধ্যাকমলকে!'

হাতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দেবারতির দিকে এগিয়ে গেল শঙ্করলাল। দেবারতির কাঁপতে থাকা শরীরটা আঁকড়ে ধরে তাকে নিজের বুকে টেনে নিতে নিতে বলল, 'তিতির নিশ্চয় এভাবে বলেনি, তোমার বোঝার ভুল হয়েছে।'

শঙ্করলালের বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে দেবারতি বলল, 'এভাবেই বলেছে। আমি খারাপ মেয়ে, আমাকে সবাই খারাপ ভাবে, তুমিও নিশ্চয় আমাকে খারাপ ভাবো।'

দেবারতিকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে শঙ্করলাল বলল, 'কেউ তোমাকে খারাপ ভাবে না দেবারতি। তুমি কেঁদো না প্লিজ, বিমল গুনতে পেলো কী ভাববে বলো তো!'

শঙ্করলালকে শক্ত আঁকড়ে ধরে একটু-একটু করে শান্ত হল দেবারতি। তারপর বলল, 'আমি সত্যি বুঝতে পারছি না তিতিরকে নিয়ে কী করব। আমার এত টেনশন হচ্ছে সব কিছুতে!'

কী হয়েছে কী! এত টেনশন কিসের?'

'মাঝে-মাঝেই রাত করে বাড়ি ফিরছে। আমি একদিন-দুদিন মুখে মদের গন্ধ পেয়েছি।'

শঙ্করলাল হেসে বলল, 'এই বয়সে ওরকম একটু-আধটু হয়। আমি ওই বয়সেই মদ খাওয়া শিখেছি, লভনে বসে। এ নিয়ে চিন্তা করার কী আছে? তোমার মনটা ভালো নেই দেবারতি, তুমিও আমার সঙ্গে বসে একটু ড্রিঙ্ক করো, আস্তে-আস্তে মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।'

দেবারতি ঠান্ডা হল একটু-একটু করে। তারপর মুখ মুছে একটা গ্লাসে সামান্য হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসল শঙ্করলালের মুখোমুখি। জিগ্যেস করল, 'কলকাতার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে আমার পেপারটা পড়েছ তুমি? এ ব্যাপারে কথা বলেছ তোমার পাটির সঙ্গে?'

শঙ্করলাল অবাক হয়ে তাকাল দেবারতির দিকে। একটু আগেই দেবারতি ভয়ানক কান্নাকাটি করছিল, এখনই সে কাজের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পুনরায়। দেবারতির কাজের প্রতি এই সিরিয়াসনেসটা শঙ্করলালকে বরাবর মুগ্ধ করে। অনেক বছর আগে সে এই কারণেই দেবারতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল একটু-একটু করে।

শঙ্করলাল হেসে বলল, 'বলেছি। দফতরের মন্ত্রী সঙ্গেও কথা হয়েছে এ ব্যাপারে। এ নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। তোমাকেই এগোতে হবে নিজের মতো করে। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই কাজ এগোবে। দিল্লি থেকে টাকা জোগাড় করা আমার দায়িত্ব।'

দেবারতি তাকাল শঙ্করলালের দিকে। সে জানে শঙ্করলালের এই কথাটার অসীম মূল্য। শঙ্করলাল যত না বড় রাজনৈতিক নেতা, তার থেকে অনেক বেশি দক্ষ প্রশাসক। যে কোনও জটিল কাজ ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা তুলনায় হিত।

দেবারতির সঙ্গে এ ব্যাপারে শঙ্করলালের একটা অদ্ভুত কাজের সম্পর্কও আছে। শঙ্করলালকে যখন তার দল দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসে মন্ত্রী হিসেবে, তখন নিজের থেকে দেবারতিকে খুঁজে বার করেছিল শঙ্করলাল। তাকে নিয়ে এসেছিল নিজের দফতরে। যখন যে দফতরে গেছে শঙ্করলাল সঙ্গে নিয়ে গেছে দেবারতিকে। শঙ্করলালের এখনকার দায়িত্ব সামগ্রিক পরিকাঠামো, এখানে এসেও সে দেবারতির ওপরই ভরসা করে সব থেকে বেশি।

বামপন্থী রাজনীতি এ দেশে লভনের মতো নয়। এখানকার রাজনীতিতে বামপন্থী মতাদর্শের সঙ্গে বস্তাপচা বাঙালি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধও ঢুকে পড়েছে পার্টির মধ্যে। শঙ্করলালের স্বচের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে বরাবরই পার্টির মধ্যে ফিসফিসানি ছিল, দেবারতির কারণে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল তার নৈতিকতা নিয়ে।

শঙ্করলালের এ নিয়ে কিছু যেত-আসত না। পার্টির মিটিংয়ে কথা ওঠায় হাসতে-হাসতে সে রাশিয়ার এক নেতার উপপত্নীদের নাম বলতে শুরু করেছিল। বলাই বাহুল্য, পার্টি শঙ্করলালের অ্যাটিচুড ভালো মনে মেনে নেয়নি, তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মন্ত্রিসভা থেকে।

মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিলেও পার্টি অবশ্য শঙ্করলালকে দল থেকে সরায়নি কখনও। যে-কোনও সমস্যায় তাকে বারবার ডেকে আনা হয়েছে,

বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কঠিন সব কাজের ভার দিয়ে। তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির মূল্য পার্টিও বুঝত। কখনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নতিসাধন, কখনও রাজ্যের শিল্পায়নের রূপরেখা তৈরি করা। সব কাজই মন দিয়ে করেছে শঙ্করলাল, কোনও কাজেই বিফল হয়নি শেষ পর্যন্ত।

এই মুহূর্তে শঙ্করলাল রাজ্যের সামগ্রিক পরিকাঠামো তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। সারা দেশ জুড়ে নগর থেকে রাস্তা, বিদ্যুৎ থেকে জলবন্টন—সব কিছুতে সামগ্রিক পরিকাঠামো তৈরির কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, রাজ্যের দিক থেকে সেই কাজের দায়িত্ব পড়েছে শঙ্করলালের ওপর। টেকনিকালি মন্ত্রী নয় শঙ্করলাল, কিন্তু তার স্টেটাস মন্ত্রীর মতোই। সরকারি পরিভাষায় একে বলে ‘ক্যাবিনেট স্টেটাস।’

দেবারতি শঙ্করলালের কাজের অনুরাগী, সে হেসে বলল, ‘তুমি মন দিলে ঠিক পারবে। আমাদের শহরে হঠাৎ করে বন্যা হলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই বিষয়ে সিরিয়াসলি কাজ হওয়া দরকার। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, তাই তোমার সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলছি।’

শঙ্করলাল মাথা নাড়ল, সেই সঙ্গে হঠাৎ করে তার বুকের মধ্যেটা চিনচিন করে উঠল আবার। শঙ্করলাল বলল, ‘আজ জানো, আমার আর মদ খেতে ইচ্ছে করছে না। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে শুনে পড়ি চলো!’

শঙ্করলাল এমনিতে খুব তৃপ্তি করে খায়, আজ তার খেতেও ইচ্ছে করল না বিশেষ। দেবারতিকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করল। দু-পদের মাছ খেল খুঁটে-খুঁটে। খেয়েদেয়ে দেবারতিকে নিজের ঘর অবধি এগিয়ে দিয়ে মন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ ঘরে শুতে চলে গেল শঙ্করলাল। দেবারতির সঙ্গে কলকাতার বাইরে এলে অনেক রাত অবধি আড্ডা মারা শঙ্করলালের দীর্ঘদিনের অভ্যাস, আজ তার আড্ডা মারতে বসতেও ইচ্ছে করল না। ঘরের আলো নিভিয়ে চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল শঙ্করলালের। তার ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে, খাটের ওপর উঠে বসে পাশের টেবিলে রাখা জলের গ্লাসের ঢাকনা খুলে ঢকঢক করে জল খেল সে। তারপর উঠে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরোনোর সময়েই হঠাৎ করে তার নিঃশ্বাসের কষ্ট হল, শঙ্করলাল খেয়াল করল তার বুকের মধ্যকার চিনচিনে ব্যথাটা ক্রমে

ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। তার হৃদযন্ত্র এলোমেলো চলছে, নিজের হার্টবিটের শব্দ এই নিস্তরঙ্গ অন্ধকার রাতে যেন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে শঙ্করলাল।

কোনওরকমে টলতে-টলতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দেবারতির ঘর পর্যন্ত এল শঙ্করলাল। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দরজায় করাঘাত করল। কোনওরকমে বলল, ‘দেবারতি দরজা খোলো, আমার ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।’

দেবারতি দরজা খোলা অবধি অপেক্ষা করতে পারল না শঙ্করলাল। তার আগেই সংজ্ঞা হারিয়ে ধূপ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

৬

অরিন্দম শুটিংয়ের ব্যাপারে ভীষণ নিয়মনিষ্ঠ। ঘড়ির কাঁটা মেনে সঠিক সময়ে উপস্থিত হয় শুটিংয়ে। দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময়ে নিজের মেকআপ ভ্যানে বসে একটা রুটি, সামান্য কিছুটা মাংস, টক দই আর কয়েক টুকরো ফল খেয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে পরের শট রেডি হওয়ার আগে পর্যন্ত একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়। এর পর সঙ্গে অবধি শুটিং করে ক্লাস্তিহীন ভাবে। অরিন্দম সম্পর্কে ইভাস্টিতে কারও কোনও অভিযোগ নেই। সকলেরই বক্তব্য, অরিন্দম চূড়ান্ত প্রোফেশনাল, তার মধ্যে কোনও স্টারসুলভ বায়নাক্স নেই, তার সঙ্গে কাজ করতে কারও অসুবিধে হয় না।

ইদানীং অবশ্য রাতে শুটিং করার ব্যাপারে একটু অনীহা দেখা দিয়েছে অরিন্দমের। একটা সময়ে সারা রাত ধরে শুটিং করতেও তার কোনও অসুবিধে ছিল না, আজকাল বেশি রাত হয়ে গেলেই অরিন্দম ক্লান্ত বোধ করতে থাকে। সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার আগেই সে কারণে অরিন্দম আজকাল পরিচালককে জানিয়ে দেয়, সে বেশি রাত করে শুটিং করতে আগ্রহী নয়, শুটিংয়ের ব্যবস্থাপনা যেন সেই মতো করা হয়।

ছবিতে অভিনয় করার ব্যাপারে আরও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অরিন্দম। হাতে যে ক’টা ছবি আছে সেগুলো শেষ করার পর সে অভিনয় করা কমিয়ে দেবে। ছবি করবে একদম বেছে বেছে—বছরে একটা বা

দুটোর বেশি নয়। পরদায় তার মুখ বারংবার দেখতে দেখতে দর্শকেরা সম্ভবত ক্লান্ত বোধ করছে, এবার তাকে অন্য স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে হবে। সে অভিনয় করবে কম, ব্যবসায় মনোযোগ দেবে বেশি। মুম্বাইয়ে সব চিত্রতারকাই নিজের আলাদা প্রোডাকশন ইউনিট চালায়, কলকাতায় অরিন্দমও সেটা করে দেখাবে।

হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টে নেমে স্টুডিয়ো পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল অরিন্দমের। হায়দ্রাবাদের মধ্যে শুটিং করার অনেকগুলো স্টুডিয়ো আছে, তার মধ্যে একটা আবাসিক, সেখানে ফিল্মসিটির মধ্যে পাঁচতারা থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব কিছুই মজুত। সেখানকার পাঁচতারা হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা অরিন্দমের। হোটেলে ব্যাগপত্র নামিয়ে, এককাপ চা খেয়ে সরাসরি শুটিং স্পটে চলে এসেছিল অরিন্দম। সে কোনও ব্যাপারেই এতটুকু সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নয়।

এখানে স্টুডিয়োর মধ্যে একটা রাধাকৃষ্ণ মন্দির আছে, তার সামনের চাতালে একটা গানের দৃশ্যায়ন হচ্ছে, তার প্রয়োজনেই অরিন্দমকে আসতে হয়েছে হায়দ্রাবাদে। এই রাধাকৃষ্ণের মন্দির এখনকার বাংলা সিনেমায় বহুল প্রচলিত শুটিং স্পট, কালীঘাটের মন্দিরের থেকেও এই হাতে বানানো মন্দির বাংলা সিনেমার পরদায় অনেক বেশি দেখা যায়।

অরিন্দমের কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগে! বাংলা চলচ্চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের থেকেও দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপট কেন বেশি করে দেখানো হবে, তা কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। প্রযোজকরা বলেন, দক্ষিণ ভারতে শুটিং করলে খরচ কম পড়ে। আগে কখনও বিষয়টা নিয়ে ভাবেনি অরিন্দম। এখন সে নিজে প্রোডাকশন কোম্পানি খুলেছে, ঠিক করেছে দক্ষিণ ভারতে এসে শুটিং করার ক্ষেত্রে খরচের ব্যাপারটা সে সরেজমিনে খতিয়ে দেখবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মন্দিরের সামনের চাতালে আলো বসানোর ব্যবস্থা চলছে পুরোদমে। অরিন্দম গাড়ি থেকে নামতেই চেয়ার থেকে উঠে দৌড়ে এলেন প্রভঞ্জনদা, হাত ধরে অরিন্দমকে শুটিং স্পটের দিকে নিয়ে যেতে বলল, ‘তোমার কোনও জবাব হয় না অরিন, টাইম মানে ঠিক টাইম।’

তারপর চাঁচিয়ে ইউনিটের বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘কী, বলেছিলাম কি না, অরিন্দমকে নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে এখানে।’

প্রভঞ্জনদার কথায় অরিন্দম বিনীতভাবে হাসল, বুঝতে পারল না তার আজকের ঠিক সময়ে শুটিংয়ে আসার ব্যাপারে এই ধরনের প্রশংসা তার আদৌ প্রাপ্য কি না। ফ্লাইট ঠিক সময়ে আসায় সে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছে এখানে, ফ্লাইট দেরি করলে তারও স্বাভাবিকভাবেই দেরি হয়ে যেত।

প্রভঞ্জনদা এরকমই, সব ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহের আতিশয্য। অরিন্দমের থেকে বয়সে অনেকটা বড়, কিন্তু এখনও তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই, দিব্যি বছরে তিনটে থেকে চারটে ছবি নামিয়ে দেন। নিম্নুকেরা বলেন, তাঁর সব ছবির গল্প আসলে একই, তাতেও ভূক্ষেপ করেন না প্রভঞ্জনদা।

এই প্রভঞ্জনদার ছবিতেই আগেও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে শুটিং করেছে অরিন্দম। দুবার তাকে দক্ষিণের কোরিওগ্রাফারের নৃত্য-পরিকল্পনায় নাচতে হয়েছে, একবার দেবতার মূর্তির সামনে রাখা সিঁদুরের থালা থেকে সিঁদুর তুলে নায়িকাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

প্রভঞ্জনদার বয়স ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু তার চুল এবং গৌঁফ কুচকুচে কালো। একটু বয়স হয়ে গেলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সকলেই চুলে কলপ লাগায়, তা নিয়ে কেউ কিছু মনে করে না। প্রভঞ্জনদার দাঁতগুলোও বাঁধানো, রাতে শুটিং শেষ করে তিনি তাঁর দাঁত খুলে কাচের গ্লাসের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে দিয়ে ঘুমোতে যান। সে কারণে আউটডোর শুটিংয়ে এসে প্রভঞ্জনদা কারও সঙ্গে রুম শেয়ার করেন না, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতে ঘুমোন। একবার ভুল করে তিনি দরজা খোলা রেখেছিলেন, স্ক্রিপ্টের একটা জিনিস নিয়ে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকায় প্রভঞ্জনদার ঘরে ঢুকে পড়েছিল অরিন্দম। বাঁধানো দাঁতের বিষয়টা তখন তার গোচরে এসেছিল। প্রভঞ্জনদা খুব লজ্জিত হয়েছিলেন, বারবার করে বলেছিলেন দাঁতের কথাটা অরিন্দম যেন কাউকে না বলে।

অরিন্দমকে শুটিং এরিয়ায় ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল প্রভাকর। প্রভাকর চেন্নাইয়ের বাসিন্দা, এই ছবির ডান্স কোরিওগ্রাফার, ছবির শুটিংয়ের জন্য সে হায়দ্রাবাদে এসে পৌঁছেছে দুপুরবেলা। এতক্ষণ লাইট সাজানোর ফাঁকে-ফাঁকে সে জুনিয়ার আর্টিস্টদের নিয়ে নাচ প্র্যাকটিস করিয়ে নিচ্ছিল। প্রভাকর খুব বিনয়ী মানুষ, অরিন্দমকে দেখে হাত জোর করে নমস্কার করল, জিগ্যেস করল, ‘দাদা ভালো আছেন?’

অরিন্দম হাসল। প্রভাকরের নয় নয় করে প্রায় চল্লিশটা মতো বাংলা

ছবি করা হয়ে গেছে, ‘কেমন আছেন ভালো আছেন’ ধরনের বাংলা সে এখন দিব্যি বলতে পারে। এর পরেই অবশ্য প্রভাকর হিন্দি আর ইংরেজির একটা বিচিত্র সংমিশ্রণে কথা বলবে, এবারেও তাই হল। প্রভাকর বলল, ‘দাদা আপনি একটু রেস্ট নিন। সোজা স্টেপ আছে, ওয়ান টু থ্রি ফোর কাউন্ট গুণে হয়ে যাবো।’

অরিন্দম হেসে মাথ নাড়ল, মেক-আপের ছেলেটা এগিয়ে এসে বলল, ‘মেক-আপ এখন নেবেন অরিন্দা? নাকি আগে রেস্ট নিয়ে নেবেন একটু?’

অরিন্দমের মেক-আপ করতে সময় লাগে না। এই ছবিতে তার হালকা মেক-আপ, তার সঙ্গে একটা লাল রঙের কুলির পোশাক পরে কাঁধে একটা গামছা চাপাতে হবে। অরিন্দম বলল, ‘আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। তুই রূপালিরটা আগে ঠিক করে কর।’

রূপালি এই ছবির হিরোইন। নায়িকাদের মেক-আপ করতেই আসলে সময় বেশি লাগে, অনেক সময়ে সেই মেক-আপ করতে গিয়ে ছবির শুটিংয়ে একটু দেরিও হয়ে যায়। অরিন্দম বেশি রাত পর্যন্ত শুটিং করতে চায় না বলে তার নিজের মেক-আপের থেকেও নায়িকার মেক-আপ নিয়েই চিন্তা হয় বেশি।

রূপালিকে শুটিং স্পটে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত এখনও হোটেলের ঘরে বসে সাজগোজ করছে। এর অর্থ; শুটিং চালু হতে দেরি আছে এখনও, এখনই শুটিং নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এখনও ইচ্ছে করলে অরিন্দমের জন্য সাজিয়ে রাখা মেক-আপ ভ্যানে গিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যায়।

মেক-আপ ভ্যান অবধি গেল না অবশ্য অরিন্দম। হায়দ্রাবাদে এই সময়টা বেশ মনোরম, এখনও বাতাসে একটা হালকা ঠান্ডাভাব রয়েছে। এই রকম পরিবেশে মেক-আপ ভ্যানের বন্ধ জায়গায় না গিয়ে খোলা আকাশের তলায় বসে থাকাই শ্রেয়, অরিন্দম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আরাম করে সিগারেট ধরাল একটা। এবং তখনই অবাক হয়ে দেখল তার দিকে এগিয়ে আসছে সুকান্ত। সুকান্ত গতকাল রাতেই তার পার্টিতে উপস্থিত ছিল, কথা হয়েছিল তার ইন্টারভিউ নিতে আসবে সোমবার। সুকান্ত এখানে কী করছে?

সুকান্ত এগিয়ে এসে বলল, ‘আমার খুব তাড়া আছে অরিন্দমদা।’

সামনের সোমবার অবধি অপেক্ষা করা যাবে না। তাই আমি দুপুরের ফ্লাইটে এখানে চলে এসেছি। তোমার শুটিং দেখব, সেইসঙ্গে তোমার একটা লম্বা ইন্টারভিউ নেব।’

ভদ্রতা করে অরিন্দম বলল, ‘বাঃ, এ তো খুব ভালো কথা।’

কিন্তু মনে-মনে মোটেই খুশি হয়নি অরিন্দম। কাজের সময়ে সাংবাদিকরা এসে তাকে বিরক্ত করুক এরকম সে কখনওই চায় না। শুটিং স্পটে সাংবাদিকদের উপস্থিতি তার ভালো লাগে না।

সুকান্ত বলল, ‘আমি প্রভঞ্জনদার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে রেখেছি। প্রভঞ্জনবাবুর শুটিং দেখার ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই।’

অরিন্দম বলল, ‘তোমার যখন যা প্রশ্ন করার টুকটুক করে করে ফেলো। আমি উত্তর দিতে থাকব।’

সুকান্ত বলল, ‘ঠিক প্রশ্ন নয় অরিন্দমদা। শুটিং দেখতে-দেখতে আড্ডা দেব। ওই আড্ডার থেকে আমার কপি হয়ে যাবে।’

অরিন্দম বলল, ‘বেশ।’

অনেক রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে সুকান্তর সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের কথাটা ভাবছিল অরিন্দম। সুকান্ত খুব বেশি প্রশ্ন কিছু করেনি, কিন্তু একটা প্রশ্ন অরিন্দমকে ভাবিয়ে তুলেছে বেশ। সুকান্তর প্রশ্নটা ছিল তার প্রোডাকশন হাউস খোলার বিষয়ে। গতকালই এ নিয়ে প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল সুকান্তর, পার্টির আয়োজনের মধ্যে সে প্রশ্নটা করে উঠতে পারেনি।

সুকান্ত জিগ্যেস করেছিল, প্রোডাকশন হাউস খোলার আসল কারণটা কী? সাধারণত কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে এসে অভিনেতারা নিজের প্রোডাকশন হাউস খোলার কথা ভাবে, ওই সময়ে তাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করে, তাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে নতুন একটা জায়গা খোঁজার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক নায়কই এই বয়সে এসে নিজের প্রোডাকশন হাউস খোলে কিংবা পরিচালক হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে।

এই প্রশ্নের উত্তর সুকান্তকে ঠিকমতো দিতে পারেনি অরিন্দম। এড়িয়ে গেছে। নন্দিতাও সকালে একই প্রশ্ন করেছিল। নন্দিতাকে অরিন্দম যা বলেছিল সেই কথাটা সুকান্তকে বলতে পারেনি অরিন্দম। সুকান্তকে বলেছে, একটা কাজ করতে করতে এক ধরনের একঘেয়েমি চলে আসে, সে কারণে কাজের বৈচিত্রের জন্য অন্যরকম কাজ করার দরকার হয়ে পড়েছে। সে পরিচালনায় আসার কথা যদিও এখনও ভাবছে না, তবে

কোনও একটা সময়ে ক্যামেরার পিছনে দাঁড়ানোর ইচ্ছেও তার পুরোদস্তুর রয়েছে।

নিজের নোটবুকে সব কিছু লিখে নিচ্ছিল সুকান্ত, যদিও তার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল বলে অরিন্দমের মনে হয়নি। তার মনে হয়েছিল, তার কথার মধ্যে যেন সেই প্রত্যয়ের জোরটা নেই, সে যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে সকলের কাছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে সুকান্ত পুনরায় জিগ্যেস করেছিল, ‘সেটাই কি আসল কারণ? নাকি, নতুন নায়ক এসে গেছে বলে তোমার জায়গাটা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে বলে তুমি একটু-একটু করে সরে দাঁড়াতে চাইছ?’

গত প্রায় পনেরো বছর ধরে বাংলা সিনেমায় একচ্ছত্র অধিপতি যদি কেউ থেকে থাকে তা হল অরিন্দম মুখার্জি। ভালোমন্দ মিলিয়ে প্রায় দুশোটার কাছাকাছি সিনেমায় অভিনয় করা হয়ে গেছে অরিন্দমের। একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও জুটেছে তার। উত্তমকুমারের পরে বাংলা সিনেমার আইকন বলতে যদি কেউ থাকে তাহলে তা অরিন্দমই। অরিন্দমের সময়কালে পুরোনোরা একটু একটু করে সরে দাঁড়িয়েছে, নতুন যারা এসেছে তারা অরিন্দমের পাশে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অরিন্দমের মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা চিন্তা ঘুরতে শুরু করেছে। অরিন্দমের গত বছরের আটটা ছবির মধ্যে পাঁচটা চলেনি ভালো, এমনকী, প্রথম তিনদিন অরিন্দমের নামে ছবির যে ইনিশিয়াল তৈরি হয় সেটাও ঠিক আশাপ্রদ ছিল না। ইন্ডাস্ট্রিতে একটা হালকা ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে—অরিন্দমের বয়স হয়েছে, এবারে নতুন প্রজন্মকে জায়গা না ছাড়লে মুশকিল হবে।

একেবারে নতুন জুটি নিয়ে আনকোরা একটা ছবি দারুণ ব্যবসা করেছে গতবছর, অরিন্দম বাড়িতে ডিভিডি আনিয়ে সেই ছবি দেখেছে। ছবি আহামরি কিছু নয়, যদিও প্রেমের ছবি। এই ধরনের ছবি গত বছর অরিন্দমও করছে। অরিন্দমের ছবি চলেনি, কিন্তু ওই নতুন জুটিকে খুব ভালোভাবে নিয়েছে দর্শক। এর অর্থ; অরিন্দমের মুখ দেখে দেখে সাধারণ দর্শক ক্লান্ত হতে শুরু করেছে।

নতুন জুটির ছেলেটার নাম সঞ্জীব। ওর কাজ ভালো লেগেছে অরিন্দমের। সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তার এখনও শেখার আছে অনেক কিছু। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলে শুধু সম্ভাবনা থাকলে হয় না, তার

সঙ্গে অন্য অনেক কিছু মেলবন্ধন প্রয়োজন। সঞ্জীবের সেটা আছে কিনা এখনও বোঝার সময় আসেনি।

নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক পালটানোর সময়ে একবার নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকাল অরিন্দম। রেগুলার এক্সারসাইজ করা চেহারা তার, এই বয়সেও তার শরীরের কোথাও কোনও মেদ জমেনি। এতে খুশি হল অরিন্দম। তারপর বুকের রোমের দিকে তাকিয়ে তার ভুরু কুঁচকে উঠল একটু। তার বুকে একটা দুটো রূপোলি চুল দৃশ্যমান, চেহায়ায় বয়সের ছাপ না পড়লেও একটা দুটো করে চুল পাকতে শুরু করেছে তার।

পার্থদা বলেছিল, একজন স্টারের আসল ইউএসপি অভিনয় নয়। অভিনয় অরিন্দমের কাছে ও এখন আর বড় ব্যাপার নয়। সে যে এই সময়ের সব থেকে পাওয়ারফুল অভিনেতা তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। আর্ট ফিল্ম থেকে মেনস্ট্রিম—সব ধরনের সিনেমাতেই বারবার সে কথা প্রমাণ করেছে অরিন্দম। তার আর নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই।

পার্থদা বলতেন, একজন স্টারের আসল ইউএসপি হল তাকে দেখে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ ফ্যান্টাসাইজ করবে। সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পর মনে-মনে ওই স্টারের সঙ্গে প্রেম করার কথা ভাববে, তার শরীর গরম হয়ে উঠবে। অরিন্দমের মধ্যে কি সেই সেক্স অ্যাপিল আছে এখনও? তাকে দেখে মেয়েদের শরীর গরম হয় কি না সেটাই আসল কথা। এই প্রজন্মের মেয়েরা কি অরিন্দমকে নিয়ে এখন আর ফ্যান্টাসাইজ করে?

নিজের মেক-আপ কিট থেকে কাঁচি বার করে সযত্নে বুকের সাদা হয়ে যাওয়া লোমদুটো কেটে ফেলল অরিন্দম। বয়সের ছাপ স্ক্রিনে পড়লে সেটা খুব বিস্ত্রী ব্যাপার, তার উচিত ছিল আজ শুটিংয়ের রওনা হওয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া। ভাগ্যক্রমে আজকের শুটিংয়ে গা-ঢাকা কুলির পোশাক পরতে হয়েছে, নইলে একটা খারাপ ব্যাপার ঘটে যেতে পারত।

থুতনিতে তর্জনির টোকা দিতে-দিতে ভুরু কুঁচকে নিজের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে রোজ সকালে উঠে শেভ করে মন নিয়ে, একদিন দাড়ি না কামিয়ে দেখেছে তার দাড়ি-গোঁফের মধ্যেও বেশ

কয়েকটা সাদা হয়ে উঠেছে। কোনও চরিত্রের প্রয়োজনে তাকে যদি দাড়ি রাখতে হয়, তাহলে তাকে এখন আর কম-বয়সি দেখাবে না। তার কাঁচা-পাকা দাড়ি গজাবে, তাতে তার বয়স বোঝা যাবে ঠিক। তখন হয়তো তাকেও প্রভঞ্জনদার মতো দাড়িতে কলপ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা ভেবে অরিন্দম মোটেই খুশি হল না, একটু চিন্তিত মুখে নিজের গালে হাত বোলাতে শুরু করলক।

ঠিক সেই মুহূর্তে গতকাল পার্টিতে দেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ল অরিন্দমের। মেয়েটার নাম সে ভুলে গেছে, পার্টির কোলাহলের মধ্যে তার নামটা সে আসলে ভালো করে খেয়ালও করে উঠতে পারেনি। কিন্তু মুখটা মনে আছে তার। বড়-বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়েছিল। বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল যে অরিন্দমের অভিনয় তার ভালো লাগে। সেটা কথার কথা, অরিন্দমের সঙ্গে ভদ্রতা করেছিল মেয়েটা, অরিন্দমের অভিনয় দেখতে সে আদৌ উৎসাহী বলে মনে হয় না। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করলে কেমন হয়? অরিন্দম কি তার কাছে জানতে চাইতে পারে না, আজকের প্রজন্ম ঠিক কি চায় একজন নায়কের কাছ থেকে?

সুকান্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অরিন্দমের দেরি হয়ে গেছিল। শুটিং হচ্ছিল টিমে তালে, রূপালির নাচের স্টেপে বারবার গোলমাল হচ্ছিল। একটা সময়ের পর প্রভঞ্জনদা রণে ভঙ্গ দিলেন, কারণ বেশি রাত অবধি শুটিং করা তাঁরও পছন্দ নয়। রাত বাড়লেই মদ্যপানের জন্য তিনি ছটফট করতে থাকেন।

অরিন্দমের ওইরকম কোনও ব্যাপার নেই। সে শুটিংয়ের পরে রাত করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ঠিক করেছিল ঘরে ফিরে তার নিজের নিয়মে দু-গেপ হুইস্কি খেয়ে ঘরে খাবার আনিয়ে খেয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে তাড়াতাড়ি। প্ল্যান ওলট-পালট করে দিয়েছিল সুকান্ত। তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছিল হোটেলের বার কাম রেস্তোরাঁতে।

অরিন্দমের মধ্যে সহজাত একটা ভদ্রতাবোধ আছে। চেনা কাউকে না করতে পারে না অরিন্দম, কাউকে মুখের ওপর না করে দিতে তার অস্বস্তি হয়। অনেক সময়ে যে কারণে ইচ্ছে না থাকলেও উপরোধে অরিন্দমকে অনেক খারাপ সিনেমায় অভিনয় করতে হয়েছে। পরিচালক, প্রযোজক হাতজোড় করে অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে ছবিতে অভিনয় করার জন্য অনুরোধ করেছে, অরিন্দম না করতে পারেনি।

সুকান্তর ক্ষেত্রেও তাই, সে কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদ চলে এসেছে শুধু তার সঙ্গে কথা বলবে বলে, তাকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি অরিন্দম। একটা সময়ের পর বিরক্ত হতে শুরু করেছিল সে, কারণ সুকান্ত একটু মদ খাওয়ার পরেই একটু বেশি মাতাল হয়ে পড়ে। তার কথাবার্তায় কোনও ঠিক থাকে না। ভদ্রতা করে তার সঙ্গে মদ খেতে বসার বিপদ আছে, কারণ সুকান্তর সময়ের তালজ্ঞান থাকে না। সে একটার পর একটা মদ খেতে থাকে অনায়াসে। ঘরে ফিরতে দেরি হয়েছিল অরিন্দমের।

ঘরে ফিরে রোজকার মতো নন্দিতাকে ফোন করেছিল অরিন্দম। নন্দিতা ততক্ষণে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অরিন্দমের শুটিংয়ের খরব নিয়েছিল নন্দিতা। নন্দিতা কখনওই অরিন্দমের কাজের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, সিনেমা বিষয়টাতে তার উৎসাহ নেই বিশেষ। সে নিজের রিহাবিলিটেশন সেন্টার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, খুব আনন্দের সঙ্গে নিজের কাজ করে তৃপ্তি পায়। নিজের কাজের জন্যও সে অরিন্দমের সাহায্য নেয় না কখনও, যা করার নিজের তাগিদে করে।

বছর পাঁচেক আগে সোনারপুরের কাছে নন্দিতাদের হোমের এক্সপ্যানশন হয়েছিল, সেই সময়ে রীতিমতো ফান্ড ক্রাইসিসে পড়েছিল নন্দিতা। অরিন্দম নিজের থেকে ফান্ড তোলার জন্য একটা-দুটো চ্যারিটি শো করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, নন্দিতা তাতে রাজি হয়নি। নন্দিতার বক্তব্য ছিল, অরিন্দমের নাম ভাঙিয়ে সে হোমের কাজ করতে চায় না। যেটুকু সে নিজের থেকে করতে পারবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে নন্দিতা।

নন্দিতার এই তীব্র আত্মসম্মানবোধই অরিন্দমের কাছে সব থেকে বড় আকর্ষণের কারণ। অরিন্দম বাইরের অনেকের কাছে স্টার; একমাত্র নন্দিতার কাছে সে সাধারণ মানুষ। স্টারডমের অনেক সমস্যা আছে, শুটিং ফ্লোরের বাইরেও সব সময়েই সে কারণে অরিন্দমকে একটা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াতে হয়। একমাত্র নন্দিতার কাছেই সে নিশ্চিত বোধ করতে পারে। নন্দিতা তাকে মনে করিয়ে দিতে পারে, অন্য যে কারও মতো সেও একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। সে সিনেমায় অভিনয় না করে অন্য কোনও কাজ করলে লোকে তাকে চিনত না ঠিকই, কিন্তু তাও সে অরিন্দম মুখার্জিই থাকত। তার পেশা অরিন্দমকে স্টার বানিয়েছে, কিন্তু এই স্টারডমের মোহে পড়ে নিজের চরিত্রকে পালটে ফেলার কোনও

দরকার নেই।

যে-কোনও সাংবাদিকের মতো সুকান্তও আজকে ওই প্রশ্নটা করেছিল। হোয়াট ডু ইউ ট্রেজার মোস্ট ইন ইওর লাইফ? একটুও না ভেবে অরিন্দম উত্তর দিয়েছিল, ‘মাই ফ্যামিলি।’

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুতনিতে টোকা মারতে-মারতে অরিন্দম বলল, ‘মাই ফ্যামিলি। আমি আর নন্দিতা। মাই স্মল ফ্যামিলি। নন্দিতা না থাকলে আমি আজ আমি হতাম না। থ্যাঙ্ক ইউ নন্দিতা, থ্যাঙ্ক ইউ ফর অভরিথিং। থ্যাঙ্ক ইউ ফর স্টেয়িং উইদ মি। থ্যাঙ্ক ইউ ফর কিপিং মি গ্রাউন্ডেড ইন লাইফ।’

সিনেমা জীবনের প্রথম দিকের কথা মনে পড়ল অরিন্দমের। সিনেমা জগতে অরিন্দমের প্রবেশ মোটেই রূপোলি পরদার মতো এলাম, দেখলাম, জয় করলাম নয়। তার প্রথম সিনেমা অর্ধেক শুটিং হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। যে ছবি রিলিজ করেছিল সে ছবি চলেনি একটুও। ইন্ডাস্ট্রিতে সকলে ধরে নিয়েছিল অরিন্দমের কিছু হওয়ার নয়, তার সিনেমা জগতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। অরিন্দম নিজেও সে-কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল একটু-একটু করে, এবং নিজের জীবনটা নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। নন্দিতা না থাকলে জীবনের ওই কঠিন সময়টায় অরিন্দমের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বেশিরভাগ লোকে অরিন্দমের গ্ল্যামারটাই দেখেছে। তার জন্য একটা সময়ে অরিন্দমকে কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তা জানা নেই কারও। সেই সময়ে নন্দিতা পাশে না থাকলে অরিন্দম ভেসে যেত। হাসিমুখে অরিন্দমকে বলেছে, ‘তুমি এত চিন্তা করছ কেন বলো তো? আমি তো আছি। আর কিছু না হোক, ডাল-ভাতের সংস্থান নিয়ে তো তোমাকে ভাবতে হবে না! তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমার মন বলেছে ঠিক পারবে তুমি।’

প্রায় তিন বছর অরিন্দমকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। একটা ভালো কাজ পাওয়ার জন্য প্রযোজক-পরিচালকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। একটা-দুটো সহ-নায়কের চরিত্রে কাজ মিলেছে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। এক প্রযোজক একবার ঠাট্টা করে অরিন্দমকে বলেছিলেন, ‘সিনেমা সবাইকে দিয়ে হয় না। ফালতু এই লাইনে পড়ে থেকো না, তাতে আমাদের সবার সময় নষ্ট হচ্ছে।’

অরিন্দমের জীবনের ওই সময়টার কথা বাইরের কারও জানা নেই। অনন্ত অপেক্ষা একটা ভালো ব্রেকের জন্য। আদৌ সেই ব্রেক আসবে কি না জানা নেই কারও। অরিন্দমের নিজের প্রত্যয়েই ঘুণ ধরতে শুরু করেছিল একটা সময়ে। ভেবেছিল বড় পর্দার মোহ ছেড়ে টেলিভিশনের চেষ্টা শুরু করবে কি না। নন্দিতা আপত্তি করেছিল। বলেছিল, ‘তা কেন? তুমি ধৈর্য হারিও না অরিন, ঠিক সময় আসবে তোমার। এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়ার কিছু নেই। আমি তো আছি।’

এর পরেও অরিন্দমের সময় লেগেছিল। কিন্তু একটা সময়ে অরিন্দমের ওই স্ট্রাগল-এর ইতিহাস ঢাকা পড়ে গেছিল তার স্টারডমের আড়ালে। নন্দিতা কীভাবে তার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল সেই সময়ে তা বাইরের লোকের জানার কথা নয়।

মাই ফ্যামিলি। নন্দিতার কথা মনে করে অরিন্দম একটা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল আবার। তাদের এই ছোট সুন্দর সংসারটার জন্য নন্দিতার অনেক আত্মত্যাগ আছে। নন্দিতা অরিন্দমকে অনেক কিছু দিয়েছে। অরিন্দম কিছুই ফিরিয়ে দিতে পারেনি নন্দিতাকে। এমনকী সংসারে পরিপূর্ণতা আনার জন্য একটা সন্তান পর্যন্ত নয়।

সেই রাতটার কথা মনে পড়ল অরিন্দমের। যেদিন ডাক্তারি রিপোর্ট নিয়ে চুপ করে বসার ঘরে বসে ছিল অরিন্দম। ডাক্তারি রিপোর্ট থেকে বোঝা যাচ্ছিল অরিন্দমের পক্ষে পিতা হওয়া মুশকিল। তার স্পার্ম কাউন্ট কম, এইরকম শারীরিক সমস্যা নাকি এক থেকে দুই শতাংশ মানুষের মধ্যে থাকে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাতে মানুষের যৌন জীবনে কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের মানুষ সন্তানের পিতা হয় না কোনওদিন।

একটা অদ্ভুত প্রশ্ন সুকান্ত জিগ্যেস করেছিল মদের আড্ডায় বসে। অরিন্দমের জীবনে গ্ল্যামারের হাতছানি চারপাশে। গত পনেরো বছর ধরে বাংলা সিনেমার অবিসংবাদী নায়ক অরিন্দম, তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে পারলে বঙ্গদেশের অনেক মেয়ে তাদের জীবন ধন্য মনে করবে। অভিনয় ক্ষেত্রেও তার নায়িকার সংখ্যা কম নয়। এই ছবিতে রূপালি বলে যে মেয়েটার সঙ্গে সে অভিনয় করছে তার সঙ্গে অরিন্দমের কুড়ি বছরের বয়সের তফাত। এই পরিস্থিতিতে কেন অরিন্দমের পদস্থলন হয়নি কখনও?

অরিন্দম হেসে বলেছিল, ‘সিনেমা আর বাস্তব দুটো জগৎ আমার কাছে কমপ্লিটলি আলাদা। এইটা আমার মাথায় থাকে সব সময়ে। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আমার কাজকে আমি গুলিয়ে ফেলি না কখনও।’

ব্যক্তিগত জীবনের কথা সুকান্ত জিগ্যেস করেনি। করলেও তার উত্তর দিত না অরিন্দম। একজন হিরো স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ। তার পৌরুষে কোথাও খামতি আছে এ কথা অরিন্দমের পক্ষে কাউকে জানানো সম্ভব নয়। নন্দিতা তার কাছের মানুষ, একজন স্টার বাইরের জগতের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারে না কখনও।

অরিন্দম চেষ্টা করেছিল অনেকবার। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী নানারকম ওষুধ খেতে হয়েছিল তাকে। তাতে লাভ হয়নি কোনও। একমাত্র উপায় ছিল কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ব্যবস্থা করা। সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় বলে ডাক্তার জানিয়েছিল। কলকাতা শহরে টেস্টিটিউব বেবির সংখ্যা এখন কম নয়।

নন্দিতা রাজি হয়নি। বলেছিল, ‘থাক না অরিন্দম। কত লোকেরই তো সন্তান হয় না, সেটা কী এমন ব্যাপার? আমাদের তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, উই ইভেন এনজয় সেক্স। এর বেশি দরকার কী আমাদের?’

অনেক রাত হয়ে গেছে এখন। কাল সকাল আটটার সময়ে শুটিং আছে অরিন্দমের। তার বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। চোখের কোলে অনিদ্রার ছাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে। হাজার মেক-আপ দিয়েও তা ঢাকা যায় না।

কিন্তু অরিন্দম বুঝতে পারছে না তার ঘুম আসবে কি না। সুকান্ত সাক্ষাৎকার নিতে এসে তার জীবনের অনেক কথা মনে করিয়ে দিয়েছে আজ!

৭

অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলে নন্দিতা আজকাল ফোন ধরতে চায় না। এর কারণ বেশিরভাগ ফোনগুলোই হয় অকাজের, যখন-তখন ফোন করে কিছু একটা বিক্রি করার চেষ্টা। দিনের বেলায় এরকম ফোন এলে এড়িয়ে যায় সব সময়ে, রাতের বেলায় ফোন এলে অস্বস্তি হয়।

নন্দিতার কাছে ফোনটা এসেছিল অনেক রাতে। প্রায় দুটো বাজে

তখন। এর ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমের মধ্যে ফোন বেজেছিল, তখন ফোন করেছিল অরিন্দম। অরিন্দমের সঙ্গে কথা হয়ে যাওয়ার পরে এত রাতে ফোন আসার কথা নয় কারও।

এমনিতে রাতেরবেলা সেলফোন বন্ধ রাখে নন্দিতা। তবে অরিন্দম কলকাতার বাইরে থাকলে সেলফোন অন রেখে ফোনটা হাতের কাছে নিয়ে শোয় নন্দিতা। ফোনটা হাতের কাছে থাকলে নন্দিতা নিশ্চিত বোধ করে, মনে হয় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অরিন্দমের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেওয়া যাবে। বাড়ির ল্যান্ডলাইনের কানেকশন বসার ঘরে, সে কারণে ওই ফোনটা আস্তে-আস্তে ব্রাত্য হয়ে পড়েছে সকলের জীবনে।

এত রাতে অরিন্দমের ফোন করার কোনও কারণ নেই। তার ফোন এটা নয়ও। ঘুমচোখে নন্দিতা দেখল অচেনা নম্বর ফ্ল্যাশ করছে তার ডিসপ্লেতে। সেলফোনের নম্বর, যদিও সে নম্বর দেখে বোঝার উপায় নেই ফোনটা কোথা থেকে এসেছে। একটা সময় পর্যন্ত সেলফোনের নম্বর দেখে কোথা থেকে ফোন এসেছে সেটা আন্দাজ করে নেওয়া যেত; এখন নম্বরের পদ্ধতি পালটে গেছে, কলকাতার নম্বর দেখলেও মনে হতে পারে ফোনটা চেন্নাই থেকে এসেছে।

ফোনের ডিসপ্লেতে অচেনা নম্বর দেখে নন্দিতা একটু অবাক হল। মাঝরাাত্রে ফোন কোনও সুসন্দেশ বহন করে আনার ইঙ্গিত দেয় না, এই সময়ে ফোন এলে যে কারওই একটু অস্বস্তি হতে বাধ্য। এই সময়ে কল সেন্টারের কেউ ফোন করে কোনও জীবনবিমার প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করবে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নন্দিতার বুক কেঁপে উঠল একবার। অরিন্দমের হঠাৎ করে কিছু হয়নি তো? তার বয়সটা এমনিতেই খুব গোলমলে, এই বয়সে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অরিন্দম তার মদ খাওয়ার ব্যাপারে পরিমিত হলেও সিগারেটে এখনও সে রাশ টানতে পারেনি। ফোনটা ধরে নন্দিতা বলল, ‘হ্যালো!’

অপর প্রান্তে এক মহিলার গলা। তিনি বললেন, ‘আমার নাম দেবারতি রায়। আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করেছি’ আমি। আয়াম সরি ফর ডিস্টার্বিং ইউ অ্যাট দিস আওয়ার, বাট আই থট...’

দেবারতি রায় নামটা নন্দিতার চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন নামটা শুনেছে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা মনে করতে পারছে না। শিক্ষিত

ভদ্র গলা মহিলার, এই ধরনের কণ্ঠস্বরের অধিকারী কেউ অসময়ে ফোন করলেও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যায় না। নন্দিতা বলল, ‘হ্যাঁ বলুন...’

মহিলা বললেন, ‘আমি দিল্লি থেকে ফোন করছি। এই মুহূর্তে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে আছি। আপনার বাবার একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ভাবলাম ফোন করে খবরটা আপনাদের কাউকে জানানো উচিত।’

দেবারতি নামটা এবার কানেস্ট করতে পারল নন্দিতা। এই মহিলাকে সে কখনও দেখেনি, কিন্তু নামটার সঙ্গে সে পরিচিত। এই মহিলার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক নিয়ে নানা কানাঘুষো শোনা যায়, এই মহিলার কারণেই বাবা তাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে সন্টলেকের সরকারি আবাসনে। এই মহিলার কারণেই বাবার সঙ্গে নন্দিতাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

এই অসময়ে এই মহিলার কাছ থেকে বাবার খবর পেয়ে নন্দিতা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। এই মহিলা বলছেন, বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কতটা ঠিক বলছেন তিনি? এমনকী হতে পারে তিনি আসলে বাবার মৃত্যুসংবাদ দিতে ফোন করেছিলেন? ফোন করার পর সেই খারাপ খবরটা তিনি একটু অন্যভাবে দিলেন? আগেকার দিনে মৃত্যু-সংবাদ নাকি সরাসরি জানানোর নিয়ম ছিল না। টেলিগ্রাম করে জানানো হত, ফাদার সিরিয়াস, কাম শার্প।’

নন্দিতার গলা শুকিয়ে উঠতে চাইল, কোনওরকমে সে বলল, ‘একজ্যাক্টলি কী হয়েছে বলবেন? বাবা বেঁচে আছে কি?’

ওপাশ থেকে গলা পাওয়া গেল, ‘হ্যাঁ, আছেন। গেস্টহাউসে অঙ্গান হয়ে গেছিলেন। এখন আইসিসিইউ-তে। ডাক্তাররা দেখছেন। রেসিডেন্ট কমিশনারকে খবর দিয়েছিলাম, তিনি নিজে এসেছেন এখানে। ব্যবস্থা করছেন...’

নন্দিতা নিশ্চিত হল একটু। বাবা বেঁচে আছে এখনও, রাতের ফোনটা অন্তত মৃত্যুসংবাদ বহন করে আনেনি। কিন্তু ফোন থেকে বোঝা মুশকিল বাবা আসলে কেমন আছে, তার অবস্থা কতটা সিরিয়াস। এইরকম পরিস্থিতিতে তাদের কারও দিল্লি যাওয়া উচিত কি না। এই মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের জেরে বাবার থেকে পরিবারের সকলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু তাও নিজের পিতাকে কি পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব? যতই

মনোমালিন্য থাক, এই বিপদের সময়ে তার পাশে দাঁড়ানো দরকার নয় কি?

দেবারতি নামক মহিলাও আসলে হয়তো সেটাই চাইছেন। নইলে এই রাতের বেলায় ফোন নম্বর খুঁজে দিল্লি থেকে তাকে ফোন করার কোনও দরকার ছিল কি? তিনি হয়তো ভেবেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে পরিবারের কারও পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে, নইলে একটা অঘটন ঘটলে পরে দোষটা তার ওপরেই আসবে।

নন্দিতা মনে-মনে চিন্তা করল। সে কি শৈবালকে একটা ফোন করবে এখন? এখন রাত দুটো বাজে। কলকাতা থেকে কাউকে রওনা হতে গেলে সেটা সকালের আগে সম্ভব নয়। ভোরবেলার দিকে দিল্লির একটা ফ্লাইট নিশ্চয় আছে, সেই ফ্লাইটটা নেওয়া যেতে পারে। সে কি সকালের ফ্লাইটে করে দিল্লি চলে যাবে? নাকি শৈবালকে যেতে বলবে? শৈবাল ডাক্তার, সে গেলে বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থাটা হয়তো সে নিজের চোখে দেখতে পারবে। শৈবালের কাজের পরিস্থিতি কী, তা-ই বা কে জানে! শৈবাল ইদানীং কলকাতার ব্যস্ত ডাক্তারদের মধ্যে একজন, সে কি কাজ ফেলে দৌড়ে যেতে পারবে দিল্লি? তার পক্ষে হয়তো বাবার শরীরের থেকেও অন্য একটি মানুষের চিকিৎসার আয়োজন করা বেশি জরুরি।

দুদিন আগে টেলিভিশনের পরদায় বাবাকে দেখে নন্দিতার একটু মন খারাপ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল বাবার মধ্যকার সেই এনার্জিটা যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। বাবা কথা বলছিল একটু ক্লান্ত স্বরে, গলাটাও কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা শোনাচ্ছে। নন্দিতার কষ্ট হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাবার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখা উচিত। মানুষটার বয়স হয়েছে এখন, এই বয়সে পরিবারের সকলকে হয়তো তার প্রয়োজন আছে। অন্তত আছে কি না সেটা একবার খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নন্দিতা বলল, ‘আমি দিল্লি আসছি কাল। ভোরবেলার ফ্লাইটটা নেওয়ার চেষ্টা করব। দিল্লিতে নেমে আপনাকে ফোন করব, এই নাম্বরেই করব তো?’

দেবারতি বলল, ‘হ্যাঁ, এটাই আমার নাম্বর। আপনি চাইলে চলে আসতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়তেও খবর দেওয়া হয়েছে, সকালে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবও আসবেন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনাদের কেউ এখানে থাকলে ভালো হয়।’

দেবারতির গলা যথেষ্ট স্টেডি শোনাচ্ছে। টেলিফোনে কথা বলেও নন্দিতার মনে হচ্ছে এই মহিলার মধ্যে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে, বিপদের সময়েও মাথা ঠান্ডা রাখতে জানেন তিনি। নন্দিতা বলল, ‘আমি নিশ্চয় আসছি। আপনি থাকবেন তো কাল?’

‘থাকব। দিল্লিতে মিটিং ছিল অনেকগুলো। সেগুলো ক্যানসেল করতে হবে। মিটিংগুলোর থেকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে থাকাটা বেশি দরকার।’

‘ডাক্তাররা কী বলছে একটু বলবেন?’

‘ডাক্তাররা এখনও কিছু বলেননি। তবে ফরচুনেটলি হাসপাতালে নিয়ে আসতে খুব বেশি দেরি হয়নি। ডাক্তাররা এইটুকু বলেছেন।’

‘আপনি নিয়ে এসেছেন হাসপাতালে?’

‘হ্যাঁ। গেস্টহাউসে আমিও ছিলাম।’

‘থ্যাক্স গড। কাল আপনার সঙ্গে আলাপ হবে, আপনার কথা শুনেছি অনেক, কখনও আলাপ হয়নি।’

ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর খাটের ওপর চুপ করে বসে রইল নন্দিতা। বাবার জন্য চিন্তা হচ্ছে তার। এই সময়ে অরিন্দমের সঙ্গে কথা বললে তার নার্ভ স্টেডি হত। কিন্তু অরিন্দম নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করাটা উচিত হবে না। তার সকাল থেকে শুটিং রয়েছে, রাতের বেলায় ভালো করে ঘুমোনো দরকার অরিন্দমের। সে কাল সকালে ফোন করবে অরিন্দমকে, এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে তাকে বাবার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেবে।

দিল্লি যাওয়ার টিকিট নিয়েও খুব কিছু চিন্তার নেই। এয়ারপোর্ট ম্যানেজার এবং কর্মীরা অনেকেই অরিন্দমের সুবাদে নন্দিতাকে খুব ভালো করে চেনে। অরিন্দমের সঙ্গে নন্দিতা কলকাতা এয়ারপোর্ট দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছে, সকলেই নন্দিতাকে চিনে গেছে। এখন সকালের দিকেই দিল্লি যাওয়ার অনেক ফ্লাইট, খুব রাশ থাকলেও তার কোনও একটায় নন্দিতার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে। না চাইলেও কখনও কখনও অরিন্দমের পরিচিতির সুযোগ নন্দিতাকে নিতেই হয়।

এখন আর ঘুম আসবে না নন্দিতার। সে বসার ঘরে এসে মিউজিক সিস্টেমে নিজের পছন্দমতো একটা সিডি ভরল। কয়েক মুহূর্ত পরে সারা ঘর ভরে উঠল সরোদের ঝংকারে। আলাপ শুরু হল ছায়ানট রাগে। অনেক সময়েই মন বিক্ষিপ্ত থাকলে, অথবা একা থাকলে বাড়ির মিউজিক

সিস্টেমে হিন্দুস্তানি মার্গ সঙ্গীত শোনে নন্দিতা। সেতার-সরোদের ঝংকার মনকে শান্ত করে, দুর্ভাবনাগুলোতে থেরাপিউটিক প্রলেপ পড়ে। আজকাল মনোরোগ চিকিৎসায় সঙ্গীত ব্যবহার করা হচ্ছে, একজন মনোবিজ্ঞানী হিসেবে সে কথা জানা আছে নন্দিতার।

রান্নাঘর থেকে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এসে সোফায় বসে মন দিয়ে আলাপ শুনতে লাগল নন্দিতা। ছায়ানট নন্দিতার অন্যতম প্রিয় রাগ।

নন্দিতাকে চিনে নিতে দেবারতির একটুও অসুবিধে হল না। করিডোরের একপ্রান্ত ধরে হেঁটে আসার সময়ে দূর থেকেই তাকে চেনা যাচ্ছিল। নন্দিতার ছবি দেবারতি শঙ্করলালের অ্যালবামে বহবার দেখেছে। নন্দিতার কাঁধে একটা ব্যাগ, দেখে বোঝা যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে সে সরাসরি এসেছে হাসপাতালে। কাছাকাছি আসতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল দেবারতি, হাত জোড় করে বলল, ‘নমস্কার, আমি দেবারতি।’

দেবারতির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল নন্দিতা। দেবারতিকে প্রথাগত হিসেবে সুন্দরী বলে চলে না, কিন্তু চেহারা অদ্ভুত এক ধরনের আভিজাত্য আছে, যা তাকে অন্যদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র করে দেয়। দেবারতির মাথার পাশে পাকা চুলের আভাস, সেইসঙ্গে অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বয়সের সঙ্গে কিছুটা কাঠিন্য এসে মিশেছে দেবারতির মুখে। নন্দিতার মনে হল দেবারতির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। করজোরে নমস্কার করে নন্দিতা জিগ্যেস করল, ‘বাবা কেমন আছে?’

দেবারতি বলল, ‘ডাক্তাররা বলছেন এখন অনেকটা স্টেডি। কিন্তু একটা ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়ার আছে। আপনি না এলে আমি খুব মুশকিলে পড়তাম।’

নন্দিতাকে শঙ্করলালের শারীরিক অবস্থার কথা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিল দেবারতি। কাল রাতে শঙ্করলালের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কারণ হল, তার আর্টারিতে একটা বড়সড় ব্লকেজ আছে। তাকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে গেলে বাইপাস সার্জারি করা প্রয়োজন, সেই সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া দেবারতির পক্ষে সম্ভব নয়। বড় সার্জারি করতে গেলে বাড়ির লোকদের নানারকম বন্ডে সই করতে হয়। সমাজের চোখে দেবারতি শঙ্করলালের কেউ হয় না।

নন্দিতা জিগ্যেস করল, ‘কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?’

দেবারতি বলল, ‘আমি কী মনে করি সেটা এখানে কোনও ইস্যু নয়। ডাক্তাররা বলছেন বাইপাস করা প্রয়োজন, এই মুহূর্তে সেটার বাইরে আর কী করতে পারি আমরা?’

নন্দিতা একটু থমকে গেল। বাইপাস করার সিদ্ধান্ত তার একার পক্ষে নেওয়া ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারছে না। ডাক্তারি বিষয়ে তার নিজের কোনও জ্ঞান নেই, তার বদলে শৈবাল এখানে এলে বরং ভালো হত। একটু ইতস্তত করে নন্দিতা শৈবালকে ফোন করবে কি না ভাবল।

দেবারতি বলল, ‘আপনি একটা কাজ করবেন? আমার সঙ্গে আসুন। এখানকার ডাক্তাররা কী বলছেন শুনে নিন আগে। তারপর কলকাতায় কথা বলে নিন বাড়ির লোকের সঙ্গে।’

নন্দিতা মাথা নাড়ল। দেবারতি ঠিকই বলেছে। শৈবালের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে গেলে শৈবাল নিশ্চয় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে এখানকার ডাক্তারেরা কী বলেছে। নন্দিতা বলল, ‘চলুন, কথা বলে আসি। আমিও একটু নিশ্চিত হব কথা বললে।’

যে হাসপাতালে শঙ্করলালকে ভরতি করা হয়েছে সেটা সরকারি হলেও এখানে ভিআইপি-দের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। দিল্লি শহরে ভিআইপি-দের অভাব নেই, কিন্তু শঙ্করলাল প্রাক্তন সাংসদ, সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের মিটিংয়ে যোজ দিতেই শঙ্করলাল এখানে এসেছিল, সে কারণে বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এসে গেছে। শঙ্করলালের চিকিৎসায় যাতে কোনও গাফিলতি না হয় তা দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও লোক এসে ঘুরে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দলের কি একটা মিটিংয়ে যোগ দিতে দিল্লিতে এসেছেন, তিনিও সন্দের দিকে হাসপাতালে আসতে পারেন এমনটা শোনা যাচ্ছে।

নন্দিতার পরিচয় পেয়ে ডাক্তাররা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বললেন তার সঙ্গে। বুঝিয়ে দিলেন শঙ্করলালের বর্তমান পরিস্থিতিতে সার্জারি কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। ডাক্তারদের বক্তব্য, বাইপাস সার্জারি এখন আর তত কিছু জটিল অপারেশন নয়, এই হাসপাতালে অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরই অপারেশন করা হয়েছে। অবশ্য নন্দিতারা ইচ্ছে করলে শঙ্করলালকে অন্য

হাসপাতলেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তাতে এখানকার ডাক্তাররা আপত্তি করবেন না।

অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সমস্যা অবশ্য আছে, শঙ্করলালের শরীর সেই ধকল নাও সহ্য করতে পারে। অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করতে গেলে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করাই ভালো। শঙ্করলালের জ্ঞান ফিরেছে, তার রক্তচাপও মোটামুটি ভালোর দিকে এখন। আজ হোক কাল, অপারেশন তাকে করতেই হবে। অপারেশন করে নিলে তার হার্টের সমস্যার সমাধান হবে, একটু সংযমী জীবনযাপন করলে আর কোনও সমস্যা তৈরি হওয়ার কথা নয়।

ডাক্তারদের কথা মন দিয়ে শুনে নন্দিতার মনে হল অপারেশনের ব্যবস্থা এখানে হয়ে যাওয়াই ভালো। সে বলল, ‘বাবার জ্ঞান ফিরেছে বললেন, বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করা যায়?’

কাঁধের ব্যাগটা দেবারতিকে ধরতে দিয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে নন্দিতা এসে দাঁড়াল আইসিসিইউ-র ভিতরে, তার বাবার বেডের পাশে। দেবারতি ঢুকবে না ভিতরে, সে কাচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। বাইরে থেকে সে একবার শঙ্করলালকে ইতিমধ্যেই দেখেছে, অক্সিজেন মাস্ক এবং নানারকম নলের বেষ্টিতভাবে আটকে রাখা হয়েছে শঙ্করলালকে। কর্মচঞ্চল, প্রাণবন্ত একজন মানুষকে এভাবে দেখতে ভালো লাগেনি দেবারতির।

নন্দিতা তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। চোখ বন্ধ করে রয়েছে বাবা, সম্ভবত ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাবার মাথায় চুল কমে গেছে অনেকদিন, কানের পাশে চুল খোঁচা-খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে। অক্সিজেনের নল ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে বাবার নাকে, হাতেও নানারকম ছুঁচ ফুটিয়ে স্যালাইন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা। আরও নানান যন্ত্রপাতি লাগানো শরীরে, সেই যন্ত্রের মাধ্যমে বাবার হৃদযন্ত্র কেমন চলছে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে মাথার পাশে রাখা সবুজ রঙের মনিটরে। অস্পন্দনের সিনেমায় এইরকম দৃশ্য অনেক দেখেছে নন্দিতা, বাস্তব জীবনে দেখল প্রথমবার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নন্দিতা। বাবার ব্যাপারে আসলে তার কিছুই করার নেই, এখন সমস্তটাই ডাক্তারদের হাতে। গত অনেক বছরে বাবার জন্য কিছুই করেনি নন্দিতা, এখনও পরিস্থিতি বদলায়নি। দেবারতি যদি

চায়, অপারেশনের কাগজপত্রে সই করে দেবে নন্দিতা।

হাসপাতালের কাগজপত্রে সই করে দিয়ে নন্দিতা এসে দাঁড়াল ওয়ার্ডের বাইরে। হাসপাতালের এ পাশটায় ভিআইপি সমাবেশ হয় বলেই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সামনে খুব সুন্দর করে সাজানো একটা ফুলের বাগান। এখানে এসে কারও মনে হবে না সে হাসপাতালে এসেছে, বরং মনে হতে পারে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়াতে এসেছে বৃষ্টি বা।

বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে শৈবালকে ফোন করল নন্দিতা। শৈবাল এবং অরিন্দম দুজনকেই রওনা হওয়ার সময়ে বাবার খবরটা জানিয়েছিল নন্দিতা, এখন তাদের ফোন না করলে তারা টেনশন করতে শুরু করবে। নন্দিতা প্রথম ফোনটা করল শৈবালকে, জানিয়ে দিল বাবার বাইপাস অপারেশন হওয়ার কথাটা ডাক্তাররা জানিয়েছে আরও চব্বিশ ঘণ্টা অবজার্ভেশনে রাখা হবে বাবাকে। অপারেশনের তোড়জোর শুরু হবে তারপরে। নন্দিতা বলল, ‘তোর আসার এমনিতে কোনও দরকার নেই। শি ইজ টেকিং কেয়ার অফ হিম।’

বাবার খবরটা অরিন্দমকেও ফোন করিয়ে জানিয়ে দিল নন্দিতা। বলল, অরিন্দম তাকে নিয়ে যেন টেনশন না করে শুটিং করে মন দিয়ে। বাবার অপারেশন মিটে গেলে নন্দিতা ফিরে যাবে কলকাতা। অরিন্দম জিগ্যেস করল, ‘তুমি উঠেছ কোথায়?’

‘এখনও ঠিক করিনি কিছু।’

‘লোডিং রোডের হোটেলটাতে চলে যাও। যেখানে আমরা আগেরবার উঠেছিলাম। ত্রিদিবকে বলে দিয়েছিলাম, ত্রিদিব নেটে তোমার বুকিং করে রেখেছে। ওই হোটেলটা সেফ, তোমার হাসপাতালের কাছেও হবে।’

ত্রিদিবকে চেনে নন্দিতা। টালিগঞ্জের শুটিং পাড়ায় একটা স্টুডিয়ার মধ্যে একটা ঘর নিয়ে ত্রিদিব তার নিজের এজেন্সি চালায়। বিভিন্ন রকমের রিজার্ভেশন থেকে শুরু করে ট্যাক্সের হিসেবনিকেশ করে দেয় টালিগঞ্জের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর। অরিন্দমের কোনও প্রাইভেট সেক্রেটারি নেই, সে এই সমস্ত কাজের জন্য ত্রিদিবেরই সাহায্য নিয়ে থাকে।

নন্দিতা বলল, ‘থ্যাক্স ইউ, ওখানেই চলে যাচ্ছি আমি।’

‘হোটেল থেকেই দরকার মতো গাড়ি নিয়ে নিও, সেই ভাবেই ব্যবস্থা করা আছে।’

‘গাড়ি লাগবে না। এখানে অটো করেই তো দিব্যি ঘোরা যায়।’
‘না, একটা গাড়ি রেখো। ইমার্জেন্সি হতেই পারে।’

‘আচ্ছা।’

‘আমার কালকের পরে প্যাক-আপ হয়ে যাবে। আমি কি দিল্লি হয়ে যাব?’

‘দরকার নেই। সোজা বাড়ি ফিরো। তেমন ইমার্জেন্সি হলে জানিয়ে দেবে। শুটিং কোরো মন দিয়ে, চিন্তা কোরো না বেশি।’

‘তুমি নিজের দিকে একটু খেয়াল রেখো। খাওয়াদাওয়া কোরো ঠিকমতো।’

‘চিন্তা কোরো না বললাম না! আই নো হাউ টু টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ।’

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে দেবারতির দিকে তাকাল নন্দিতা। দেবারতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, টেলিফোনের কথোপকথনের শ্রবণসীমার বাইরে। ফোনটা নামানোর পর কাছে এগিয়ে এল দেবারতি, বলল, ‘আপনি থাকার কী ব্যবস্থা করেছেন? আমি যে গেস্টহাউসে আছি, আপনি সেখানে এসে থাকতে পারেন। ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে না।’

মাথা নাড়ল নন্দিতা। সে সরকারি গেস্টহাউসে থাকার পক্ষপাতী নয়। বাবার সঙ্গে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক নেই, সে বাবার পরিচয়ে সরকারি আতিথেয়তায় থাকতে রাজি নয়। নন্দিতা বলল, ‘না, না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ব্যবস্থা করা আছে।’

দেবারতি বলল, ‘আচ্ছা। আপনি নিশ্চয় এয়ারপোর্ট থেকে ডাইরেক্ট এসেছেন, চেক ইন করে ফ্রেশ হয়ে আসুন। একটু রেস্ট নিয়েও আসতে পারেন। আমি আছি, চিন্তা করবেন না।’ একটু ইতস্তত করে তারপর যোগ করল, ‘আমার কাছে গাড়ি আছে। গাড়িটা কি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে?’

দেবারতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল নন্দিতা। মহিলা কাল সারারাত ঘুমোয়নি, তার মুখের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ভিতরে-ভিতরে হয়তো টেনশনও করছে দেবারতি, যদিও বাইরের ভাব দেখে সেটা চট করে বোঝা যাবে না। সকাল থেকে হাসপাতালের নানা ব্যবস্থাপনায় হয়তো এখনও পর্যন্ত কিছু খেতেও পারেনি। নন্দিতা কিন্তু ফ্লাইটে ব্রেকফাস্ট খেয়েছে পেট ভরে।

নন্দিতা বলল, ‘আমি চলে যেতে পারব, এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনিই বা এখানে থেকে কী করবেন? আপনিও গেস্টহাউসে যান। একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলে আসবেন। এখন তো আমাদের এখানে কিছু করার নেই।’

ম্লান হেসে দেবারতি বলল, ‘না থাক। আমি এখানেই আছি। আপনি ঘুরে আসুন।’

নন্দিতা বলল, ‘কিছু খেয়ে নিলে ভালো করতেন। এর পর আপনার যদি শরীর খারাপ হয়, সেটা কি খুব ভালো ব্যাপার হবে?’

দেবারতি বলল, ‘আমার অভ্যেস আছে। আমার কিছু হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন। এখানে ক্যান্টিন আছে, খিদে পেলে কিছু খেয়ে নেব’খন। গাড়িটা নিয়ে যান, পৌঁছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। গাড়িটা এখানে থাকলে ভালো হয়, যদি কোনও ইমার্জেন্সি ওষুধ আনতে অন্য কোথাও যেতে হয়!’

দেবারতির সরকারি গাড়িতে করে হোটেলে যাওয়ার পথে দেবারতির কথাই ভাবছিল নন্দিতা। এই মহিলাকে তারা সবাই মিলে এতদিন ভিলেনের আসনে বসিয়ে এসেছে। নন্দিতার মনে হল, দেবারতি অত কিছু খারাপ মহিলা নয় আসলে।

৮

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল তিতির। তার চোখদুটো একটু টেনে আসছে, মুখের মধ্যেটা শুকিয়ে উঠছে বারবার। অর্ক বসে আছে তার পাশে। মাঝে-মাঝেই অর্কের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে তিতিরের শরীর, সেটা ইচ্ছাকৃত কি না তা বুঝতে পারছে না তিতির।

অর্ক তার ডান হাতটা রাখল তিতিরের থাইয়ের ওপর। এটাও ইচ্ছাকৃত নাকি অসাবধানে সে হাতটা রেখেছে তাও তিতিরের বোধগম্য হল না। কিন্তু সে অর্কের হাতটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল না, তার নিজের কথা একটু-একটু জড়িয়ে গেছে, অর্ককে কী বলতে কী বলে ফেলবে তাই তিতির ভালো করে জানে না। সে আরও একটু এলিয়ে বসল, শরীরের ওই সামান্য নড়াচড়াতেই তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল যেন।

ঘরের মধ্যে আরও চারজন বসে রয়েছে একটু এলোমেলো ভাবে। পূজা ছাড়া আর কাউকে ভালো করে চেনেও না তিতির, এদের সকলের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে আজই সন্কেবেলা। পূজার সঙ্গে সন্কেবেলা দেখা করতে গেছিল তিতির, পূজাই তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে এখানে। বলেছিল, সে বন্ধুদের একটা পার্টিতে যাচ্ছে, তিতিরের সেখানে যাওয়া উচিত। পূজার বক্তব্য, 'ইউ নিড টু নো মোর অ্যান্ড মোর পিপল, ইভাস্টিতে কাজ করতে গেলে সবার সঙ্গে আলাপ রাখতে হয়।'

তিতিরের প্রোডাকশন কোম্পানির একটা প্রোজেক্ট শুরু হব হব করে এখনও হয়নি, সন্কের দিকটাতে কোনও কাজ থাকে না তিতিরের। রুমির ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষার প্রিপারেশন আছে, তার জন্য রুমিকে সন্কেবেলা কোচিং ক্লাসে যেতে হয়। একা-একা ভুতের মতো তাদের ফ্ল্যাটে বসে থাকতে ভালো লাগে না তিতিরের। পূজার কথায় এই পার্টিতে আসতে তাই আপত্তি করেনি তিতির।

এই ফ্ল্যাটটা কার তা এই মুহূর্তে গুলিয়ে গেছে তিতিরের। অর্কের বোধহয় নয়, কারণ একটু আগে অর্ক বাড়ি যাওয়ার কথা বলেছিল একবার। অর্ক কোথায় থাকে জেনে নিয়ে তার সঙ্গে পিজি-র ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে জানিয়েছিল তিতির। অর্ক এখন আর বাড়ি ফেরার কথা বলছে না, এই মুহূর্তে তিতিরেরও বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ছে না আর। পূজা অনেকক্ষণ আগেই বলেছিল, সে বাড়ি ফিরবে না। আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাবে।

এই ঘরে ছ'জন রয়েছে। পূজার গায়ের সঙ্গে প্রায় আঠার মতো আটকে রয়েছে দুটো ছেলে, একজন তার হাতটা দিয়ে পূজার গলা জড়িয়ে রেখেছে। অন্যজন শুয়ে আছে পূজার কোলে। এই ছেলে দুটোর নাম অ্যান্ডি আর রজত—এদের দুজনের সান্নিধ্যই পূজা উপভোগ করছে বলে মনে হচ্ছে। কোলে শুয়ে থাকা ছেলেটার মাথায় মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে ঢলে পড়ছে পাশের ছেলেটার গায়ে। পূজার শরীর নিয়ে কোনও ছুঁমার্গ নেই, একসঙ্গে দুজনকে নিয়ে সে দিব্যি খুশি।

ঘরের অন্য মেয়েটির নাম দেবলীনা। এমনিতে তার চোখগুলো বেশ বড়-বড়, কিন্তু এখন তার চোখ দুটো এখন প্রায় বুজে এসেছে। সে শুয়ে আছে তমাল বলে একটি ছেলের কোলে মাথা রেখে। তমাল তার মুখে ও ঠোঁটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মাঝে-মাঝে ঝুঁকে পড়ে দেবলীনাকে চুমু

খাওয়ার চেষ্টা করছে। দেবলীনীর সুড়সুড়ি লাগছে মনে হয়, কারণ সে মাঝে-মাঝেই হেসে উঠছে। হাসলে দেবলীনীর সারা শরীর দুলে ওঠে, সেটা দেখে তিতিরের হাসি পেয়ে যাচ্ছে।

তমাল একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ‘আমার হ্যাল হয়েছে খুব। ইট ওয়াজ গুড স্টাফ, থ্যাঙ্কস টু মনিদা।’

তিতিরের মনে পড়ল। মনিদা। এই লোকটার ফ্ল্যাটে এসেছে সে। আসার সময়ে পূজা বলছিল মনিদার কথা। ফ্ল্যাটে এসে মনিদার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল, এখন তাকে দেখতে পারছে না কোথাও। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়, তাদের ঘরের এই ক’জন ছাড়া আরও অনেকে আছে, মনিদা নিশ্চয় অন্যদের সঙ্গে অন্য কোথাও আছে। মনিদা কী করে পূজার জানা নেই, পূজা শুধু জানে লোকটা কলকাতা আর মুম্বাইতে পালা করে থাকে, এবং কলকাতার বাড়িতে মাঝে-মাঝেই পার্টি দেয়। এই পার্টিতে যে-কোনও লোক আসতে পারে না, শুধুমাত্র পরিচিতের সূত্র ধরেই আসা যায় এখানে। নানারকম নেশার দ্রব্য বিনে পয়সায় পাওয়া যায় এখানে, পূজাদের এখানে আসার সেটাই বড় কারণ।

পূজা বছর কয়েক ধরে মডেলিং করছে, এখন সিরিয়ালও করছে একটু-একটু। দেবলীনাও নাকি মডেল, সবে একটু-আধটু কাজ করতে শুরু করেছে। অ্যাভি, রজত আর তমালও তাই। মডেলদের মধ্যে সব সময়েই একটা গান্ধাট টাইপের ব্যাপার থাকে বলে তিতিরের মনে হয়, অ্যাভিরিও সেরকম বলেই মনে হয়েছে তার। এদের তিনজনেরই জিম করা পেটানো চেহারা, তবু এদের সঙ্গে কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পায়নি তিতির। তুলনায় অর্ক অন্যরকম। অর্ক মডেল নয়, সে গ্রাফিক ডিজাইনার, এই আড্ডায় সে কী করে এসে পৌঁছেছে তা জানা নেই তিতিরের।

কোলে শুয়ে থাকা রজতের দিকে তাকিয়ে পূজা বলল, ‘এই রজত, আমারও গলা শুকোচ্ছে। দেখ না আমার গ্লাসটা কোথায় আছে। আমায় আরেকটা বানিয়ে দে। লার্জ অ্যান্ড স্টিফ। তোরাও নিবি তো নিয়ে নে। আমি মদ খাব আরেকটু। রজত, তুই বোতলটাই এখানে নিয়ে আয়।’

পূজার কথা রজতের বেদবাক্য, সে উঠে বোতল খুঁজতে গেল। ফিরে এল একটু পুরেই। ট্রে-তে করে অনেকগুলো এঁটো গ্লাসও নিয়ে এসেছে। কোন গ্লাসটা কার গুলিয়ে গেছে সকলের, কিন্তু তাতে কারও ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হল না তিতিরের। তিতিরের দিকেও একটা গ্লাস এগিয়ে

এল। তিতির অল্প স্বাদের পানীয়তে চুমুক দিল, তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল আবার।

তিতির এমনিতে খুব বেশি মদ খায় না, আজ সে অন্যরকম ব্যবহার করবে সিদ্ধান্ত নিয়েই তাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিল। তার কয়েকটা দিন ধরে মন ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হল তার হাতে যা টাকা ছিল তা ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। প্রোডাকশন কোম্পানির কাজটা শুরু হলে হাতে কিছু অ্যাডভান্স টাকা পাওয়ার কথা ছিল, কাজ পিছিয়ে যাওয়ার সেটা আর সম্ভব হয়নি। মায়ের কাছ থেকে আর টাকা নেবে না ঠিক করেছিল সে, এখন এমনিতেও মায়ের কাছে টাকা চাওয়ার উপায় নেই। মা দিল্লি গিয়ে বসে আছে প্রায় পনেরো দিন হল, মস্ত্রিমশাইকে শুশ্রুষায় ব্যস্ত। তিতিরের দিকে তাকানোর সময় নেই তার। ড্রয়ারে মা কিছু টাকা রেখে গেছিল, বাড়ি থেকে যেদিন জামাকাপড় আনতে গেছিল তিতির, সেদিন সেই টাকাটাও নিয়ে এসেছে তিতির। এখন সেই টাকাও ফুরোনোর মুখে। তিতিরের কাছে মাত্র কয়েকশো টাকা পড়ে রয়েছে, সে কারণে তিতির চিন্তায় পড়ে গেছে।

নিজের সমস্যার কথা তিতির কাউকে বলতে চায় না, 'এমনকী রুমিকেও সে কিছু বলে উঠতে পারেনি। পূজা ফোন করেছিল দুপুরের দিকে, তিতিরের গলার স্বর শুনে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল তার মন ভালো নেই। পূজা বলেছিল 'তোমার মন খারাপ হয়েছে মনে হচ্ছে! অ্যাকচুয়ালি ইউ নো, আই অ্যাম অলসো ফিলিং লো। লেটস মিট আপ ইন দ্য ইভিনিং অ্যান্ড হ্যাভ সাম ফান।'

সন্ধ্যাবেলা শপিং মল কমপ্লেক্সের বাইরে দেখা করেছিল দুজনে। পূজা হাসতে হাসতে বলল, 'জানিস, আমাকে ওই সিরিয়ালটা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সো আই অ্যাম মোর ফ্রি নাউ। এখন ফ্রিক আউট করার সময়।'

পূজার ইচ্ছে বড় অভিনেত্রী হওয়ার, কিন্তু সিরিয়াল থেকে বাদ পড়েও তার মধ্যে কোনও দুঃখের লক্ষণ দেখা যায়নি। তিনতলায় ফুড কোর্টে কফি খেতে-খেতে পূজা বলেছিল, 'শোন, কলকাতা শহরে কেউ টাকা কামাতে চাইলে দেয়ার আর প্লেনটি অফ ওয়েজ। বরং অ্যাক্টিং করলে টাকা কম পাওয়া যায়। ডোন্ট ওরি তিতির, ইউ হ্যাভ ইট ইন ইউ, আমার মনে হয় না তোরও কোনও প্রবলেম হবে।'

তিতির একটু হেসে বলল, ‘লেটস সি।’ তারপর জিগ্যেস করেছিল, ‘কিন্তু তুই তো অ্যাক্টিং করতে চাইছিলি। সেদিনও তো অরিন্দম মুখার্জিকে...’

‘সি অরিন্দম মুখার্জি ইজ বিগ। ফিল্ম অন্য ইস্যু, ফিল্ম করলে আই উইল বি ইন বিগ লিগ। তাতে টাকা কামাতে আমার আরও সুবিধে হবে। বাট টেলিভিশন ইজ শিট। তার থেকে আমার মডেলিং অনেক ভালো। ভালো ক্লায়েন্টের কাজ হলে আই মাইট ইভন আর্ন টেন কে পার ডে বুঝলি? এর থেকেও বেশি টাকা রোজগার করা যায়, তার জন্য গাটস লাগে। আমার সেই গাটস আছে।’

টাকার অঙ্কটা শুনে একটু অবাক হয়েছিল তিতির। অরিন্দমের প্রোডাকশন কোম্পানিতে তাকে কত টাকা দেওয়া হবে তা নিয়ে পাকা কথাবার্তা এখনও হয়নি। তিতির হিসেব করে দেখেছে পিজি-তে শেয়ারিং ভিত্তিতে থাকা খাওয়া এবং নিজের হাতখরচ চালাতে গেলে মাসে ছ’-সাত হাজার টাকার প্রয়োজন আছে। এত টাকা কি প্রোডাকশন কোম্পানিরা দেয়? তার সারা মাসে যা প্রয়োজন তা পূজা একেক দিনে রোজগার করে মডেলিং করে? মডেলিং করতে কী-ই বা এমন গাটস লাগে?

পূজা তার গ্লাসের মদটা খেয়ে নিয়েছে এক নিঃশ্বাসে। তারপরেই ঢলে পড়েছে অ্যাভির গায়ে। অ্যাভির শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খোলা, পূজা আরও একটা বোতাম খুলে দিয়ে নিজের মুখ ঘষছে অ্যাভির বুকে। অ্যাভির হাত খেলা করে বেড়াচ্ছে পূজার শরীরের সর্বত্র।

তিতিরের অস্বস্তি হচ্ছে। চোখের সামনে এরকম দৃশ্য সে আগে কখনও দেখেনি। পূজা কি পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত, তার আশেপাশে যে অনেক লোক আছে সে কথাটা পূজা ভুলে গেল নাকি? নাকি সে যেটা করছে সেটা তার ইচ্ছাকৃত? তিতিরের মনে হতে শুরু করল পূজার সঙ্গে এই জায়গায় চলে আসাটা তার উচিত হয়নি। সে এই মানুষের এই ধরনের ব্যবহার আগে কখনও দেখেনি, সে নিজের সঙ্গে মেলাতে পারছে না এদের কাউকে। অ্যাভির সঙ্গে পূজার আলাপ হয়েছে এই ফ্ল্যাটে এসে ঘণ্টা চারেক আগে। মাত্র এইটুকু আলাপে কেউ কারও সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে নাকি? শরীরের সঙ্গে মনের কোনও সম্পর্ক নেই?

পূজার দেখাদেখি প্রগল্ভ হয়ে উঠেছে দেবলীনাও। সে এখনও দুলে-

দুলে হাসছে, হাসতে-হাসতেই সে খুলে ফেলেছে তার পোশাকের উপরিভাগ। কালো ব্রেসিয়ার পরে সে বসে আছে সকলের মধ্যখানে, হাসতে-হাসতে বলছে, ‘আমার গরম লাগছে কিন্তু। এসি-টা কেউ একটু বাড়িয়ে দে না।’

তিতিরের কান গরম হয়ে উঠছে, সেইসঙ্গে তার মাথার মধ্যোটা ঝিমঝিমও করছে। নিজের শরীর নিয়েও তার ভয় করতে শুরু করছে একটু-একটু। নেশা করলে কি মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলোয় কোনও পরিবর্তন হয়? নাকি এটাই মানুষের সহজাত বৃত্তি?

অর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে তিতিরের শরীরের সঙ্গে। তিতিরের ঘাড়ে অর্কের নিঃশ্বাসের বাষ্পের স্পর্শ করে যাচ্ছে বারবার। একটু উষ্ম অর্কের নিশ্বাস, তাতে তিতির ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠছে। নিজের শরীরটাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না তিতির, তার অস্বস্তি বাড়ছে সে কারণেই। অর্ককে সে আগে কখনও দেখেনি, অর্কের সঙ্গেও তার আলাপ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। এখন তার শরীরের সঙ্গে অর্কের স্পর্শে তার খারাপ তো লাগছে না। তিতির নিজের শরীরের কথা ভেবে ভীত হচ্ছে। সে এখনও পূজা বা দেবলীনার মতো প্রগল্ভ হয়ে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু আসলে তার শরীর চাইছে অন্য একটা শরীরকে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে কথা। সেও আসলে পূজা বা দেবলীনার মতেই খারাপ মেয়ে। নইলে তার এরকম হচ্ছে কেন? ভালোবাসাহীন শরীর আসলে খুব খারাপ, সে তো বরাবর এই কথাই মেনে এসেছে।

গ্লাসে নতুন করে পানীয় ঢালা হচ্ছে আরেক রাউন্ড, তিতির এবারে না করল। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে চায় না সে, নিজের চেতনাকে সে হারাতে চায় না কিছুতেই। সে খারাপ মেয়ে নয়, সে খারাপ হবে না কিছুতেই। এর পরে সে আর নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারবে না ভালো করে।

তিতির না বলায় সকলে হাসছে। অর্ক বলছে, ‘কী রে! আর নিবি না কেন? হয়ে গেল তোর?’

‘আর পারছি না আমি। তা ছাড়া আমি বাড়ি যাব।’

‘এখন বাড়ি যাবি কী? দেড়টা বাজে। এখন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। আর একটু পরে ভোর হয়ে যাবে। তখন যাস।’

বাইরে বেরোলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না তা তিতির জানে না।

এই ফ্ল্যাটটা একটু বহুতল কমপ্লেক্সে, এখান থেকে একা একা সে বেরোবে কী করে তাও তিতিরের জানা নেই। সে পূজার সঙ্গে এসেছে, এতক্ষণে তার দিগ্বিভ্রম হতে শুরু করেছে। সে কলকাতা শহরের কোন প্রান্তে এখন তাই মনে করতে পারছে না ঠিক করে! ট্যাক্সি পাওয়া গেলেও সেই ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ি যাওয়ার ক্ষমতা নেই তিতিরের। তা ছাড়া তার পকেটে সামান্য কয়েকটা একশো টাকার নোট, এই মুহূর্তে ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা সে পরিহার করে চলেছে।

তিতিরের খুব অভিমান হতে শুরু করেছে। সে অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুই বলেছিলি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিবি।’

অর্ক হাত বোলাল তিতিরের ঠোঁটের ওপর। তার শরীরটা শিউরে উঠল একবার। জড়ানো গলায় বলল, ‘করিস না। ক্যাট করে কামড়ে দেব।’

অর্কর হাত নেমে আসছে তিতিরের ঠোঁট থেকে নীচের দিকে। তিতির বলল, ‘করিস না অর্ক।’

অর্ক হেসে হাত সরিয়ে নিল, তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট স্টিক বার করল। সিগারেটের সামনের দিকটা মোড়ানো, এর মধ্যে সিগারেটের তামাকের সঙ্গে অন্য কিছু মেশানো রয়েছে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সেটা এগিয়ে দিল অর্ক। বলল, ‘খা কিছু হবে না। ইউ নিড টু গ্রো আপ বেবি। দিস ইজ আ ডিফারেন্ট ওয়াল্ড।’

সিগারেটটা হাতে নিয়ে একটা টান দিল তিতির। ধোঁওয়াটা চেপে রাখল বুকের মধ্যে। ঘরের মধ্যের আলোটা কেউ একটা নিভিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আধা অন্ধকারে সে দেখতে পাচ্ছে পূজাকে। পূজা তার জামার বোতাম খুলে ফেলেছে, তার বুকে মুখ ঘষছে অ্যান্ডি। দেবলীনাও চুপ করে তার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে, তার শরীর সংলগ্ন তমাল। দেবলীনার শরীরের উপরিভাগে কোনও পোশাক নেই, তমালও তার জামা খুলে ফেলেছে।

তিতিরের ন্যায়-অন্যায় বোধটা গুলিয়ে যেতে শুরু করেছে এখন। তার মাথার মধ্যে অনুরাগিত হচ্ছে অর্কর একটা বাক্য ‘ইউ নিড টু গ্রো আপ বেবি!’ সে কি বড় হয়নি এখনও? বড় হতে চায় বলেই তো সে মায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাকে এরা সকলে ছোট মনে করছে নাকি?

সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে জয়েন্টটা অর্ককে ফিরিয়ে দিল তিতির। তারপর নিজের গ্লাসে চুমুক দিল একটা। বড় চুমুক। পানীয়র ঝাঁঝটা জ্বলতে-জ্বলতে নামল তিতিরের গলা দিয়ে।

এবং ঠিক তখনই তিতিরের মাথার মধ্যোটা দুলে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তিতির বুঝল নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

৯

খুব বড় করে ইন্টারভিউ সমেত একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে কাগজে আজ, সেটা দেখে অনেকে সকাল থেকে ফোন করতে শুরু করেছে অরিন্দমকে। কাগজের হেডিং করেছে ‘নায়কের উত্থান ও পতন’—এই পতন শব্দটাই সকাল থেকে এত ফোন আসার প্রধান কারণ। কাগজে বলছে, অরিন্দমের দিন শেষ, অরিন্দম নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছে বলে আন্তে-আন্তে সরে দাঁড়াতে চাইছে অভিনয়ের জগৎ থেকে।

খবরের কাগজের ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজনার জগতে অরিন্দমের জায়গা পাওয়া মুশকিল। অরিন্দমের মধ্যে সৃজনশীলতা আছে, কিন্তু তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি কতটা তা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই সংশয় আছে। নাম না করে অনেকের উদ্ধৃতি আছে কাগজে। তারা প্রত্যেকেই অরিন্দমের প্রযোজনায় আসাকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জানিয়েছে অরিন্দম পুরোপুরি অভিনয়ে মনোনিবেশ করলেই ভালো করত, তার প্রযোজনার জগতে আসাটা সম্ভবত ভুল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অতীতের উদাহরণ টেনে এনেছে তারা।

ইদানীং অনেক বছর অরিন্দমকে নিয়ে খবরের কাগজে কোনও নেগেটিভ লেখা বেরোয় না। সব সময়ে সব রিপোর্টে অরিন্দমকে টালিগঞ্জের অবিসংবাদী নায়ক হিসেবেই বর্ণনা করা হয়, সব সময়েই বলা হয়ে থাকে টালিগঞ্জের এই মুহূর্তে আইকন একমাত্র অরিন্দম। আজ অন্যরকম ঘটেছে।

খবরের কাগজের পাতা জোড়া রিপোর্টটা পড়তে পড়তে অরিন্দম তার খুতনিতে টোকা দিল বারকয়েক। সুকান্ত এরকম লিখবে সে ভাবতে

পারেনি। এই লেখার ফলে অরিন্দমের হয়তো খুব অসুবিধে হবে না— তার নতুন করে আর খ্যাতি-অখ্যাতি নিয়ে ভাবার কিছু নেই, কিন্তু অসুবিধে হবে প্রযোজকদের। অরিন্দমের ছ'টা ছবি এখনও রিলিজ হওয়া বাকি, তার মধ্যে তিনটে এখনও শুটিং ফ্লোরে আছে। খবরের কাগজের রিপোর্টের প্রভাব এই ছবিগুলোর বক্স অফিসের ওপর এসে না পড়ে। গত বছর অরিন্দমের কোনও ছবিরই বক্স অফিস ভালো যায়নি, এ বছর তার অন্তত দুটো বড় হিট দরকার আছে।

খবরের কাগজ পড়ে অরিন্দমের মনে একটু অস্বস্তি হয়েছে আজ। মুখে কিছু বলেনি অরিন্দম, কিন্তু সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে নন্দিতা। নন্দিতাও এ নিয়ে কিছু বলেনি অরিন্দমকে, কিন্তু সে অরিন্দমের মুখ দেখে তার মনের অবস্থা বুঝতে পারে। অরিন্দম রিপোর্টটা পড়ে রেগে গেছে যথেষ্ট, সেটা নন্দিতা বুঝতে পারছে।

সকাল থেকে ফোনের ঠেলায় অরিন্দম এমনিতেই তিত্তিবিরক্ত, সকলে ফোন করে অরিন্দমকে সমবেদনা জানাচ্ছে। অরিন্দম কারও কাছে সমবেদনা চায় না, ফোন আসাতে তার রাগ বাড়ছে আরও। এখন অরিন্দম তার সেলফোন অফ করে দিয়েছে, সে চায় না এ নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে। এমনকী নন্দিতার সঙ্গেও নয়।

সেলফোনটা বন্ধ করায় কিছুক্ষণের নিশ্চিন্তি, তারপরেই বসার ঘরে ল্যান্ডলাইনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে। নন্দিতা ফোনটা ধরল, রিসিভারটা হাত দিয়ে চেপে ধরে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ধরবে? প্রভঞ্জনদা!’

অরিন্দমের কোনও ফোন ধরার ইচ্ছেই ছিল না, প্রভঞ্জনদার নাম শুনে সে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। একটু গম্ভীর গলায় বলল, ‘হ্যাঁ প্রভঞ্জনদা, বলুন।’

প্রভঞ্জনদার গলা উত্তেজিত শোনাগ অপর প্রান্তে। ‘তুমি প্রতিবাদ করো অরিন্দম। ছেড়ে দিও না এভাবে। আমরা কিছু বলি না বলেই ইভাস্ট্রির এই অবস্থা হচ্ছে। তুমি এখনই ফোন করে প্রতিবাদ করো, চিঠি লেখো একটা।’

প্রভঞ্জনদা সত্যিই রেগে গেছেন। রেগে যাওয়ার কারণও রয়েছে, প্রভঞ্জনদার ছবি অরিন্দমকে নিয়েই, এই ছবি ফ্লপ করুক তার প্রভঞ্জনদা নিশ্চয় চান না। তাঁর ছবিতে অরিন্দমের বদলে অন্য কেউ নায়ক হলে

প্রভঞ্জনদা এত রেগে যেতেন কি না সন্দেহ আছে।

অরিন্দম একটু হাসল মনে মনে। তারপর নিষ্পৃহ গলায় বলল, ‘আমি কাউকে কোনও চিঠি লিখব না প্রভঞ্জনদা। একজন সাংবাদিকের মনে হয়েছে, সে লিখেছে। অন্যায় তো কিছু করেনি। আমি খামোখা এর প্রতিবাদ করতে যাব কেন?’

‘কিন্তু তাই বলে এভাবে লিখবে! এমনকী লিখেছে তোমার চেহারা এখন বয়সের ছাপ পড়েছে, তোমার মহিলা ফ্যানের সংখ্যা কমছে দিন-দিন। এটা কোনও কথা হল? শেষদিন পর্যন্ত উত্তমকুমারের কত মহিলা ফ্যান ছিল এরা জানে না? তোমারও তাই। এরা কোনও খবর পর্যন্ত রাখে না!’

অরিন্দম হেসে বলল, ‘উত্তমকুমারের কথা ছাড়ুন। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। তা ছাড়া আমি সত্যি কিছু মনে করিনি। ওদের মনে হয়েছে ওরা লিখেছে, এই নিয়ে আমার আর কোনও বক্তব্য নেই।’

প্রভঞ্জনদা বললেন, ‘তুমি সত্যি কোনও প্রতিবাদ করবে না? অ্যাটলিস্ট সুকান্তকে ফোন করে ঝাড়ে একবার। ছিঃ ছিঃ ছিঃ...’

এবার দরাজ গলায় হেসে উঠল অরিন্দম। এই হাসিটা সে অভিনয় করার সময়েও বহুবার ব্যবহার করেছে। এই হাসি দিয়ে নিজের অনেক সমস্যা ঢেকে ফেলা যায়। সকলেই বলে অরিন্দমের হাসিটা খুব সুন্দর। অরিন্দম বলল, ‘আপনি এত চিন্তা করছেন প্রভঞ্জনদা? আজ কাগজে বেরিয়েছে। দুদিন পরে লোকে ভুলে যাবে। তবু তো আমাকে নিয়ে বেরোল একটা কিছু, নইলে লোকে আমাকে ভুলে যেত না?’

অরিন্দমের কথা শুনে প্রভঞ্জনদা আর কথা বাড়ালেন না বিশেষ। তিনি বুঝে গেছেন অরিন্দম এ নিয়ে কথা বলতে চায় না, সুকান্তকে এ নিয়ে কিছু বলার পক্ষাপাতী নয় সে। অরিন্দমের এ একটা অদ্ভুত স্বভাব, ইন্ডাস্ট্রির ঝগড়া-ঝাঁটিতেও সে মাথা ঘামায় না কখনও, তার মুখ থেকে কোনওদিন কারও বিরুদ্ধে কোনও কথা শোনা যায়নি। এখনও সে অন্য সময়ের মতোই চুপ করে থাকবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, ‘আমাকে একটু চা দিতে বলবে?’

নন্দিতা বলল, ‘বলছি।’ তারপর জিগ্যেস করল, ‘শুটিংয়ে যাবে না আজ?’

‘শুটিং নেই। ক্যানসেল হয়েছে কাল। সেট রেডি হয়নি এখনও।’
 ‘তা হলে কি সারাদিন বাড়িতে?’

অরিন্দম একটুম্ফণ চিন্তা করল। তারপর বলল, ‘না, আমি বেরোব।
 নিজে হাত না লাগালে প্রোডাকশন কোম্পানি দাঁড় করানো যাবে না।
 অন্যের ওপর ছেড়ে রাখলে এ দেশে কিছুই হয় না, বুঝলে?’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘জানি। সেই জন্যই রোজ রোজ আমাকেই হোমে
 দৌড়ে যেতে হয়। প্রোডাকশন কোম্পানি ঠিক করে চালাতে গেলে
 তোমাকেই নামতে হবে। নইলে আগেরবারের মতো অবস্থা হবে। কিন্তু
 প্রশ্ন হল, তুমি সময় দেবে কী করে?’

বছর দশেক আগে অরিন্দম নিজের থেকে একবার সিনেমা প্রযোজনায়
 নেমেছিল। একটা হিন্দি ছবি আর একটা বড় বাজেটের বাংলা ছবি
 প্রযোজনা করে বড় ভাবে এই জগতে প্রবেশ করার ইচ্ছে ছিল তার।
 হিন্দি ছবিটা তৈরি হয়েছিল কয়েক কোটি টাকায়। পরিচালনা করেছিলেন
 মুম্বাইয়ের এক নামকরা বাঙালি নির্দেশক। নায়ক অরিন্দম নিজে, নায়িকা
 মুম্বাইয়ের এক নামি তারকা। ছবি একটুও চলেনি, এক সপ্তাহের মাথায়
 মুখ খুবড়ে পড়েছিল। জোর করে দু-সপ্তাহ চালানো হয়েছিল, তারপর
 সেই ছবি হল থেকে উঠে যায়। ওই সিনেমা প্রযোজনায় অরিন্দমের
 যাবতীয় জমানো টাকা শেষ হয়ে গেছিল। বাংলা ছবির প্রযোজনা বন্ধ
 করে দিতে হয়েছিল মাঝপথে। সুকান্ত তার রিপোর্টে অরিন্দমের সেই
 অতীতের কথা লিখেছে। মস্তব্য করেছে অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি
 অরিন্দম, সে আবার ভুল পথে পা বাড়াতে চলেছে।

অরিন্দম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে অতীতের অসাফল্যগুলোকে মন
 থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। এ ব্যাপারে সে অনেকটা ক্রিকেটারদের মতো।
 ক্রিকেটারদের ফর্ম নিয়ে সমস্যা হলে তারা তাদের পুরোনো সেঞ্চুরিগুলোর
 রেকর্ড করে রাখা খেলাগুলো চালিয়ে-চালিয়ে দেখে। তাতে ক্রিকেটারদের
 মনোবল বাড়ে, একটু-একটু করে তাদের ফর্ম ফিরে আসে। অরিন্দমও
 সেরকম। সে নিজের অসাফল্যের থেকেও সাফল্যের কথাগুলোই ভাবতে
 ভালোবাসে বেশি।

অরিন্দম নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এবারে আর ওই ভুল হবে
 না। এবারে আমি নিজে প্রেজেন্ট থাকব সব ব্যাপারে। যে ছবিগুলো
 আমার হাতে আছে সেগুলো ছাড়া অপাতত আর নতুন কোনও ছবিতে

সই করছি না। অভিনয় পরে হবে আবার।’

নন্দিতা হাসল। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে তার ভিতরের জেদটা সে বুঝতে পারছে পরিষ্কার। আজকের কাগজের রিপোর্ট অরিন্দমকে বেশ উত্তেজিত করে তুলেছে। সে সহজে ছেড়ে দেবে না। প্রোডাকশনের কাজে সে সত্যি-সত্যি মনোনিবেশ করবে। অরিন্দমকে খুব ভালো করে চেনে নন্দিতা।

এগারোটার সময়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে মিটিং ছিল, ঠিক এগারোটার সময়েই পৌঁছে গেল অরিন্দম। গড়িয়াহাটের এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে অরিন্দমের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, তার যাবতীয় অ্যাকাউন্ট এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এই ব্যাঙ্কেই নিজের প্রোডাকশন কোম্পানির নামে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়েছে অরিন্দম।

ব্যাঙ্কের মিটিংটা আজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিন কয়েক আগে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রোডাকশন কোম্পানি চালাতে যে টাকা লাগে তার একটা অংশ সে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেবে। এর পরে অতিরিক্ত কিছু লাগলে সে হাত পাতবে প্রেমাংশু দাগার কাছে। প্রেমাংশু তার ব্যবসায়ে পুরো টাকাটা ঢালতেই আগ্রহী ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক ভেবেচিন্তেই সে ব্যাঙ্কের কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রেমাংশুর কাছ থেকে টাকা নেওয়া মানে কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারে তাকে প্রেমাংশুর কথা শুনে চলতে হবে। অরিন্দম চায় না বাইরের কেউ তার কাজে হস্তক্ষেপ করুক।

অরিন্দম এই ব্যাঙ্কে পা রাখল অনেক বছর পরে। বেশিরভাগ সময়ে তার ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সারতে আসে তার ড্রাইভার, বাকি অংশটা সামলে দেয় ত্রিদিব। এটিএম থেকে টাকা তোলার কাজটা করে নন্দিতা। দিনের বেলা অরিন্দমের নিজের পক্ষে এটিএম থেকে টাকা তোলা অসম্ভব ব্যাপার, সেই চেষ্টা ভুলেও করে না সে।

অরিন্দমকে স্বাগত জানাতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন গেটের সামনে। অরিন্দমকে নিয়ে ম্যানেজার একেবারে হাজির হলেন নিজের চেম্বারে। ব্যাঙ্কের দরজা থেকে চেম্বার অবধি হেঁটে যাওয়ার সময়ে কোনওদিকে না তাকিয়েও অরিন্দম বুঝল তাকে নিয়ে একটা হালকা গুঞ্জন শুরু হয়েছে, অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অরিন্দম নিশ্চিন্ত বোধ করল। খবরের কাগজে যা-খুশি লিখুক, এখনও

তার দিকে সকলে তাকায়!

ব্যাঙ্কের কাজ ত্রিদিব অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল, এখন প্রয়োজন ছিল অরিন্দমের নিজের উপস্থিতি। ব্যাঙ্কের অনেক কাগজপত্রে অরিন্দমকে সই করতে হবে, সেই কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য নিজের কাছে নিয়ে রাখল অরিন্দম। আপাতত অরিন্দম একটা সত্তর লাখ টাকার লোন নেবে, সেই সঙ্গে একটা ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্ট খুলবে আরও সত্তর লক্ষ টাকার, তার বদলে সে কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখবে গলফ গার্ডেন্স অঞ্চলে বছর পাঁচেক আগে কেনা খালি পড়ে থাকা একটা ফ্ল্যাট এবং ঠাকুরপুকুরের কাছে অনেকদিন আগে কিনে রাখা একটা জমি। গলফ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটটাতে ইতিমধ্যেই প্রোডাকশন হাউসের অফিস করার কাজ শুরু করে দিয়েছে অরিন্দম।

এই দুটো ছাড়াও অরিন্দমের নামে আরও তিনটে সম্পত্তি রয়েছে কলকাতা শহরে। যে ফ্ল্যাটে তারা থাকে সেই ফ্ল্যাটটার ভ্যালুয়েশন এখন কোটি টাকার কাছাকাছি। আনোয়ার শাহ রোডের বহুতলে একটা নতুন কেনা ফ্ল্যাট ব্যবহার না হওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে—তার দামও বোধহয় এখন কোটি টাকা পেরিয়ে গেছে। নিউটাউনেও একটা ছিমছাম ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে অরিন্দম, সে ফ্ল্যাটের দামও কিছু কম নয়। ব্যবসায়ে টাকা কম পড়লে এই তিনটে ফ্ল্যাটও কাজে লাগাতে কোনও অসুবিধে নেই অরিন্দমের। বাংলা ছবিতে গত দশ বছরে অরিন্দমের পারিশ্রমিক বেড়েছে লাফিয়ে-লাফিয়ে, অরিন্দমের কিছু-কিছু সম্পত্তি কিনে রাখতে কোনও অসুবিধে হয়নি। অরিন্দমদের সংসার খরচ খুব বেশি নয়, সে কারণে ত্রিদিবই তাকে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করার বুদ্ধি দিয়েছিল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অবশ্য জানালেন, এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি টাকা লোন নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হবে না অরিন্দমের। টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রযোজনা করলে টিভি চ্যানেলের ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতেও লোন পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে খুব তাড়াতাড়ি সেই লোন স্যাংশন করার ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক করে দেবে। ব্যাঙ্ক ‘ভ্যালুড কাস্টমার’ বলে অরিন্দমকে সব থেকে কম রেটে লোন দিতেও রাজি আছে, সে ব্যাপারেও অরিন্দমের কোনও অসুবিধে হবে না। মিটিং সেরে ওঠার সময়ে ম্যানেজার শুধু বললেন, ‘আপনার শুটিংয়ের সময়ে একটু যদি ডাকেন, আমার মিসেস কোনওদিন শুটিং দেখেনি, ওর আপনার শুটিং দেখার খুব ইচ্ছে।’

অরিন্দম হাসল, দরাজভাবে জানিয়ে দিল তাদের প্রোডাকশন কোম্পানির কাজ শুরু হলে সে নিজে ফোন করে ম্যানেজারকে খবর দেবে, ম্যানেজারের স্ত্রীর শুটিং দেখার যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখবে অরিন্দম।

প্রোডাকশনের অফিস যাওয়ার পথে গাড়ির সিটে এলিয়ে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল অরিন্দম। অরিন্দমের গাড়িটা বিলাসবহুল এসইউভি, এই গাড়ির জানলার সব কাচ কালো, যাতে বাইরে থেকে অরিন্দমকে চেনা না যায়। একসঙ্গে কোথাও না-গেলে নন্দিতা এই গাড়িটা ব্যবহার করে না, তার জন্য বাড়িতে আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা আছে। নন্দিতার ড্রাইভারও আলাদা, সেই ড্রাইভার অনুপস্থিত থাকলে নন্দিতা নিজেই তার গাড়ি চালায়।

অরিন্দমও ভালো গাড়ি চালায়, কিন্তু কলকাতার রাস্তায় সে সচরাচর গাড়ি চালাতে চায় না। তার গাড়ির ড্রাইভার বিপিন, সে দীর্ঘদিন রয়েছে অরিন্দমের সঙ্গে, কাছাকাছি শুটিংয়ে গেলে সে অরিন্দমকে সঙ্গে নিয়ে এই গাড়ি করেই শুটিং স্পটে যায়। দক্ষিণবঙ্গে শুটিং হলে নিজের গাড়িতে করে যাওয়াই পছন্দ করে অরিন্দম।

রাস্তায় জ্যাম আছে, অরিন্দম বিপিনকে বলল তার ‘প্রভাত ফেরী’ সিনেমার ডিভিডিটা চালিয়ে দিতে। প্রভাত ফেরী অরিন্দমের কেরিয়ারের প্রথমদিকের সিনেমা, এই সিনেমাটা সেই আমলে সুপার-ডুপার হিট করেছিল। গানগুলো এখনও সুপারহিট, এফ এম চ্যানেলে এই গান হামেশাই বাজানো হয়। প্রভাত ফেরী সিনেমাটা আহামরি কিছু নয়, কিন্তু সিনেমাটা চালিয়ে মাঝে-মাঝে দেখলে অরিন্দমের মনটা ভালো হয়ে যায়। আজ তাকে মন ভালো রাখতে হবে, সকালের কাগজ পড়ার পর থেকেই তার মেজাজ খিচড়ে আছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সে নিশ্চিত হলেও তার মন পুরোপুরি ভালো হয়নি এখনও।

অরিন্দমের গাড়িতে একটা ছোট টিভি আছে, সেটা পিছনের সিটে অরিন্দম যেখানে বসে তার সামনে গাড়ির ছাদ থেকে ঝোলে। এই টিভিতে ছবি খুব ভালো আসে, সামনে ড্রাইভারের আসন সংলগ্ন প্লেয়ার থেকে এই টিভি স্ক্রিনে ছবি আসার ব্যবস্থা করা রয়েছে। ওই প্লেয়ারটায় একটা রিমোট আছে, অরিন্দম ইচ্ছে করলে পিছনের সিটে বসে তার ইচ্ছেমতো নিজের দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তুও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গাড়ি করে লম্বা জার্নিতে

গেলে অরিন্দম এই টিভিতে সিনেমা দেখতে দেখতে যায়। বেশিরভাগই বিদেশি সিনেমা দেখে অরিন্দম, তার মনে হয় এখনও বিদেশি অভিনেতাদের কাছ থেকে তার তার অনেক কিছু শেখার আছে।

আজ অবশ্য পথ একটুখানি, সুতরাং পুরো সিনেমাটা দেখার প্রশ্ন ওঠে না। অরিন্দমের এই সিনেমা মন দিয়ে দেখার কোনও আগ্রহও নেই, সে শুধু নিজেকে দেখে মনটা ভালো করবে এখন। এই সিনেমাটা দেখতে-দেখতে সে অফ-ফর্ম ক্রিকেট প্লেয়ারদের মতো নিজের সেধুগরিগুলোর কথা ভাববে, তার থেকে অনুপ্রেরণা জোগাবে নিজেকে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল অরিন্দম। ছবিটা শুরু হয় নায়িকা মৌমিতাকে দিয়ে। মৌমিতা এখন বিয়ে করে লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে, তার কথা মনে নেই কারও। অরিন্দম যখন ছবিটা করেছিল তখন মৌমিতা ইন্ডাস্ট্রির এক নম্বর নায়িকা ছিল, তার কথাতেই পরিচালক অরিন্দমকে এই ছবিতে কাস্ট করেছিল।

‘কাস্টিং’ কথাটা সিনেমা জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ‘কাস্টিং কাউচ’ কথাটাও। মৌমিতার সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করার লোভে অরিন্দম বাধ্য হয়েছিল মৌমিতাকে তুষ্ট করতে, সে কারণেই মৌমিতা অরিন্দমের কথা বলেছিল পরিচালককে। অরিন্দমের তখন উপায় ছিল না, সেই সময়ে ভালো একটা রোল পেতে গেলে এইটুকু করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মৌমিতার সঙ্গে সেই সময়ের সম্পর্কটার কথা অরিন্দম কাউকে বলেনি কখনও, নন্দিতাকেও নয়। অথচ নিয়ম অনুযায়ী নন্দিতাকে সব কথা খুলে বলার কথা তার। সব কথা খুলে বলবে বলেই নন্দিতার কাছে প্রথম গেছিল অরিন্দম, সেই সূত্রেই তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়।

কেরিয়ারের একেবারে প্রথমদিককার কথা। বাঙালি আন্দাজে অরিন্দমের চেহারাটা সুন্দর, সে কারণে একটা-দুটো ছোট বাজেটের ছবি প্রথমদিকে পেয়ে গেছিল অরিন্দম। পার্থ মজুমদারের একটা ছবি রিলিজ করল, রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লপ। দর্শক নেয়নি অরিন্দমকে। এর পরে আরও দুটো ছবি, একটাও চলল না। টালিগঞ্জের অরিন্দমের নামের পাশে ‘আনলাকি’ বলে ছাপা পড়ে গেল।

সে সময়টা খুব খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে কেটেছে অরিন্দমের।

খারাপ সময়ে অনেক কিছু একসঙ্গে ঘটে—সে তার ব্যাকের চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছিল, দুঃসময়ে সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেল দাদা-বউদি, তার চার মাসের মধ্যে মৃত্যু হল মায়ের। মা ছিলেন একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে অসময়ে চূপ করে বসে থাকলেও মনের শান্তি মিলত অরিন্দমের। এখন জগতে সেরকম কেউ রইল না। ট্যালেন্ট এবং ফ্রাঞ্চেইজের সঙ্গে টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ায় মাদকাসক্তির এক অদ্ভুত যোগাযোগ আছে, অরিন্দম ক্রমে তাতে জড়িয়ে পড়ল। অরিন্দমের জীবনের একমাত্র পাথেয় হয়ে দাঁড়াল সস্তার বাংলা মদ।

নন্দিতার সঙ্গে এইরকম সময়ে আলাপ হয়েছিল অরিন্দমের। অরিন্দমকে তার স্কুলের এক বন্ধু জোর করে টেনে নিয়ে গেছিল একটি এনজিও-তে। ওই এনজিও-তে কাজ করত নন্দিতা, সাইকোলজিস্ট হিসেবে। নন্দিতার তখন বয়স অল্প, সদ্য মনোবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে কাজে জয়েন করেছে সেখানে। অরিন্দমের থেকে প্রায় বছর চারেকের ছোট নন্দিতা, কিন্তু অরিন্দমকে খুব মন দিয়ে কাউন্সেলিং করতে শুরু করেছিল সে। অরিন্দম তার প্রথমদিকের পেশেন্ট, অরিন্দমকে নিয়ে সে কারণে খুব সিরিয়াস হয়ে পড়েছিল নন্দিতা।

একজন মনোবিদকে মনের সব কথা খুলে বলা নিয়ম। সেই কথা বলতে-বলতে একটু-একটু করে অরিন্দম জড়িয়ে পড়েছিল নন্দিতার সঙ্গে। নন্দিতা তাকে মদ ছাডিয়েছিল, সেইসঙ্গে সিনেমা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তারা বিয়ে করবে বনে মনস্থ করেছিল।

এইরকম সময়ে অরিন্দমের জীবনে মৌমিতা এসেছিল। প্রভাত ফেরী ছবিতে নতুন নায়ক নেওয়া হচ্ছে শুনে দেখা করতে গেছিল মৌমিতার অফিসে। অরিন্দম কাজটা করার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল, মৌমিতার প্রস্তাবে সে না করেনি সে-কারণে। ছবি হিট করার পরে মৌমিতার সঙ্গে আরও একটা-দুটো ছবি, তারপর একটা সময়ে মৌমিতাকে ছুড়ে ফেলতে তার অসুবিধে হয়নি।

সিনেমা জগৎটা নায়কনির্ভর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতো। এখানে নায়িকার থেকেও নায়কের গুরুত্ব অনেক বেশি। মৌমিতা স্বার্থের বিনিময়ে অরিন্দমকে সাহায্য করেছিল, পরবর্তীকালে সেই মৌমিতাকে গুণাগার দিতে হয়েছিল অরিন্দমের কাছে। মৌমিতাকে ইভাস্থিতে কোণঠাসা করতে শুরু

করেছিল অরিন্দম। মৌমিতা অরিন্দমের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

গাড়ির ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম এখন মুচকি-মুচকি হাসছে। সুকান্ত জিগ্যেস করেছিল এই এতগুলো বছরে অরিন্দমের কোনও পদস্বলন হয়নি কেন। কী হয়েছে, বা অরিন্দম কী করতে পারে তা সুকান্তকে বলবে কেন অরিন্দম? নন্দিতাকেই সে কখনও কিছু বলে না।

১০

নিজের অফিসটা দেখে খুশি হল অরিন্দম। গত এক মাস ধরে এই ফ্ল্যাটটাকে অফিস হিসেবে গুছিয়ে তোলার কাজ চলছে, এতদিনে একবারও অরিন্দম নিজে এই অফিসে আসার সময় পায়নি। অফিস গুছিয়ে তোলার কাজ সে ছেড়ে রেখেছিল তার কোম্পানিতে নিয়োজিত ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অনিমেষ সেনগুপ্তর হাতে।

অনিমেষের টেলিভিশনের কাজের মধ্যে একটা স্বকীয়তা আছে, অফিসটাকেও বেশ রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে তুলেছে সে। খুব বেশি খরচও হয়নি, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্ট ডিরেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছে। ওই আর্ট ডিরেক্টর নিজে কোনও পয়সা নেয়নি, জিনিসপত্র কেনাকাটা এবং লেবার খরচের হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়েছে অনিমেষকে, অনিমেষ সেই অনুযায়ী পেমেন্ট করে দিয়েছে।

অফিসটার মধ্যে এখনও রঙের গন্ধ রয়েছে, বুকভরে শ্বাস টেনে সেই গন্ধটা উপভোগ করল অরিন্দম। রঙের গন্ধ অরিন্দমের ভালো লাগে, প্রত্যেক শুটিংয়ের নতুন সেটে শুটিং শুরু করার আগে এই ভাবে শ্বাস নেয় অরিন্দম। সিনেমার নেশা নানারকম জিনিস মিলেমিশে তৈরি হয়, তার মধ্যে সেটের এই গন্ধ এবং মেক-আপের গন্ধ অন্যতম। এই নেশা থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় অরিন্দমের জানা নেই। কোনও মনোবিদের রিহাব সেন্টার এই নেশা ছাড়াতে পারে না।

টালিগঞ্জ পাড়ার প্রোডাকশন অফিসগুলো এমনিতে অফিসের মতো দেখতে হয় না। সাধারণত একটা বা দুটো ছোট ঘরে টিনের চেয়ার-

টেবল পেতে বসার ব্যবস্থা থাকে। স্টিলের ট্রাস্ক থেকে বাটার পেপারে রোল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে এদিক-ওদিক। সাধারণত প্রোডাকশন অফিস বন্ধ থাকে সারাদিন, বিকেলের দিকে দু-একজন তালা খুলে চেয়ার-টেবল পেতে বসে আড্ডা মারে, আর সেইসঙ্গে ভাঁড়ে চা আনিয়ে চা খায়। সত্যি কথা বলতে, বেশিরভাগ প্রোডাকশন কোম্পানি তাদের অফিস ব্যবহার করে না বললেই চলে। কাজ চলার সময়ে প্রোডাকশন সংগঠিত হয় স্টুডিও থেকেই।

পুরোনো আমলের এই ব্যবস্থায় অরিন্দম বিশ্বাস করে না। সে দেখে এসেছে, মুম্বাই কিংবা চেন্নাইয়ে বড় প্রোডাকশন কোম্পানির নিজস্ব অফিস থাকে, সেই অফিস সুসজ্জিত এবং কর্পোরেট প্রক্রিয়ায় চলে। কলকাতার সব কিছুই ঢিলেঢালা, এই ব্যবস্থা অরিন্দমের পছন্দ নয়। সে কারণেই সে আলাদা করে সুসজ্জিত প্রোডাকশন হাউসের অফিস করে নিতে চেয়েছিল। আজকাল সিনেমার পাশাপাশি প্রোডাকশন হাউসগুলোকে টেলিভিশনের কাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হয়, টেলিভিশনে কাজ করতে গেলে আজকের যুগে কিছুটা ঠাটবাটের প্রয়োজন আছে।

অফিসের মধ্যে অরিন্দমের জন্য একটা চেম্বার করা হয়েছে, সেই চেম্বারে কম্পিউটারে বসে কাজ করার জন্য একটা ডেস্ক। ডেস্কের সামনে ভিজিটারদের জন্য চেয়ার রাখা রয়েছে ছিমছামভাবে। দেওয়ালে একটা এলসিডি টিভি, তার সামনে দুটো বিলাসবহুল সোফা। ডেস্কের পিছনে অরিন্দমের একটা বিরাট কালো-সাদা ছবি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালে। এই ছবিটা অনিমেস কোথা থেকে জোগাড় করেছে কে জানে, অরিন্দমের নিজের কাছে আছে বলেও তার মনে পড়ছে না। ইন্ডাস্ট্রিতে সকলে জানে অরিন্দমের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে, তার চেম্বার সাজানোর সময়ে সেদিকে যথাযথ খেয়াল রাখতে ভোলেনি অনিমেস।

অরিন্দমের সঙ্গে তার চেম্বারে এসে ঢুকল অনিমেস। অরিন্দম নিজের চেয়ারে বসার পর উলটো দিকের চেয়ার টেনে নিয়ে হেসে বলল, ‘ফাইনালি এলে! নিজের কোম্পানিতে তুমি নিজেই আসো না, এইভাবে কাজ শুরু করা যাচ্ছিল না অরিন্দমদা। এবারে একটু মন দাও, কয়েকটা জায়গায় তোমার হেল্প দরকার আছে।’

অনিমেসের সঙ্গে প্ল্যানিং করবে বলেই অরিন্দম আজ এখানে এসেছে,

সে অনিমেষের কাছ থেকে এখন অবধি কাজ কতদূর এগিয়েছে তার খুঁটিনাটি শুনল। একটা মেগা-সিরিয়াল এবং একটা রিয়েলিটি শো করার ব্যাপারে অনিমেষ কথা বলে রেখেছে টিভি চ্যানেলের সঙ্গে, টিভি চ্যানেল দুটো কনসেপ্টই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মেগা সিরিয়ালের ব্যাপারে অরিন্দমের অত কিছু ইন্টারেস্ট নেই, সে অনিমেষের কাছে রিয়েলিটি শো'র ডিটেল জানতে চাইল। অনিমেষ জানাল, সারা বাংলা জুড়ে ট্যালেন্ট হান্ট করা হবে, সেখান থেকে বেছে নেওয়া হবে নতুন নায়ক এবং নায়িকা। তাদের নিয়ে নতুন ছবি অ্যানাউন্স করা হবে টেলিভিশনের পরদায়। আপাতত এইটুকুই রিয়েলিটি শোয়ের আউটলাইন।

অরিন্দম বলল, 'এরকম রিয়েলিটি শো তো আগেও হয়েছে, এতে নতুনত্ব কী আছে?'

অনিমেষ বলল, 'এই রিয়েলিটি শো তুমি প্রেজেন্ট করছ, তোমার নামে শো টেলিকাস্ট হচ্ছে। ইজন্ট দ্যাট এনাফ?'

অরিন্দম চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বলল, 'আই থিঙ্ক দ্যাটস নট এনাফ। নতুন কিছু ইউএসপি না থাকলে শো কেউ দেখবে না অনিমেষ, আজকের যুগে পাবলিক শুধু নাম দেখে প্রোগ্রাম দেখে না।'

অনিমেষ জিগ্যেস করল, 'তুমি কী ভাবছ আমাকে একটু বলবে?'

'বলব। বাট বিফোর দ্যাট তুমি ক্রিয়েটিভ টিমে কাকে-কাকে রেখেছ সেটা জানাও আমাকে। দরকার হলে সবাইকে নিয়ে বসি। একটা ব্রেন স্টর্মিং করা দরকার।'

অনিমেষ বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা না বলে ক্রিয়েটিভ টিম তৈরি করতে পারছি না অরিন্দমদা। আমি ওভারঅল দেখব। শান্তনু স্ক্রিপ্ট দেখবে, এইটুকু ঠিক হয়েছে। বাকি নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। বাজারে লোকের ভীষণ অভাব, জানেই তো!'

'নতুন যাদের সঙ্গে কথা বলেছ, তাদের সবাইকে ডেকে পাঠাও আজ। আজই বসে রিক্রুটমেন্ট ফাইনাল করব। ভালো টিম তৈরি না করতে পারলে কিছু হবে না। আজকের যুগে টিমওয়ার্ক ছাড়া কিছু হয় না। অ্যান্ড উই নিড ফ্রেশ ব্লাড। নতুন-নতুন আইডিয়া না থাকলে তোমার আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। বলল, 'বিকেলের মধ্যে সবাইকে অফিসে হাজির করে দিচ্ছি অরিন্দমদা, ডোন্ট ওরি।'

অনিমেষ উঠে গেল অরিন্দমের চেম্বার থেকে, শর্টলিস্ট করে রাখা নামের তালিকা থেকে প্রত্যেককে খবর দিতে। অরিন্দম সেই অবসরে তার ল্যাপটপ খুলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তারিখ চেক করতে বসল। সে তার ল্যাপটপের ক্যালেন্ডারে তার নিজের শুটিং ডেটস, এবং সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু কিছু জিনিস লিখে রাখে—সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নেয় তার প্রত্যেকদিনের রুটিন।

ক্যালেন্ডারের একটা জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল অরিন্দমের। ডেটটা সে নিজেই লাল রং দিয়ে হাইলাইট করে রেখেছে। ডেটটা শুক্রবার পড়ছে, সিনেমা রিলিজ করার দিন ওটা। অরিন্দম ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল তার ল্যাপটপে খুলে রাখা পাতায় ওই লাল রঙে রাঙানো ডেটটার দিকে। অজান্তেই নিজের চিবুকে টোকা দিল কয়েকবার।

এই ডেটটা অরিন্দমের কাছে এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ওই তারিখটার সঙ্গে তার নিজের কাজের কোনও সম্পর্ক নেই। ওই দিনটা, অরিন্দম বা নন্দিতার জন্মদিন নয়, তাদের বিয়ের তারিখও নয়। ওই দিনে এমনকী অরিন্দমকের নিজের কোনও শুটিং নেই। ওই দিন অরিন্দমের নিজের কোনও সিনেমাও রিলিজ করছে না। অথচ ডেটটা অরিন্দমের কাছে ভীষণ ভীষণরকম গুরুত্বপূর্ণ।

ওইদিন সঞ্জীব বলে ছেলেটার নতুন সিনেমা রিলিজ করছে। সাত মাস আগে এই সঞ্জীব নামক নতুন নায়কের প্রথম ছবি হিট করেছিল, হই হই করে চলেছিল বাজার মাতিয়ে। গত বছর অরিন্দমের কোনও ছবি বড় হিট নয়, সঞ্জীবের ছবি জুবিলি করেছিল গ্রামে-শহরে সর্বত্র। সঞ্জীবের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছিল পিয়ালি বলে একটা মেয়ে। ওদের জুটি ক্লিক করেছিল দারুণরকম।

একটা ছবি মেগাহিট করলেই ইন্ডাস্ট্রিতে সকলে স্টার বনে যায়। সঞ্জীবও এখন এখানকার সব থেকে উঠতি স্টার। সুকান্ত তার লেখায় লিখেছে, অরিন্দমের আর কোনও উপায় নেই, তার থেকেও এই মুহূর্তে সঞ্জীবের গ্রহণযোগ্যতা যে বেশি তাতে নাকি কারও কোনও সন্দেহ নেই।

সঞ্জীব-পিয়ালির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অরিন্দমের নিজেরও কোনও সন্দেহ নেই। সে খবর নিয়েছে এ বছর সারা বাংলায় যারা খোলা মঞ্চ প্রোগ্রাম করেছে, তাদের মধ্যে সঞ্জীব-পিয়ালির প্রোগ্রাম সব থেকে বেশি হিট। দূর-

দূরান্ত থেকে লোকে সঞ্জীব-পিয়ালিকে দেখতে ছুটে এসেছে দর্শক, তাদের অনুষ্ঠান দেখে খুশি মনে ফিরে গেছে। মঞ্চের প্রোগাম জনপ্রিয় হওয়ার অর্থ হল, সঞ্জীব-পিয়ালির জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। মঞ্চের প্রোগ্রাম সিনেমার জনপ্রিয়তাকে কমপ্লিমেন্ট করে সব সময়ে।

পিয়ালি মেয়েটা অ্যাভারেজ, কিন্তু সঞ্জীবের অভিনয়ে দম আছে। সাধারণ চেহারা ছেলেটার, কিন্তু মুখ-চোখে একটা ইন্টেনসিটি আছে। অভিনয় করে দাপটে, স্ক্রিনে একটা অন্যরকম প্রেজেন্স তৈরি হয়ে যায় আপনা থেকে। সিনেমাটা দেখে ছেলেটাকে মনে-মনে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে অরিন্দম।

কেরিয়ারের যেখানে অরিন্দম এখন দাঁড়িয়ে তাতে মহানুভব হয়ে এই নতুন ছেলেটাকে স্বাগত জানানো উচিত ছিল তার। অভিনয় জগৎ থেকে খ্যাতি এবং অর্থ সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে অরিন্দমের, এই সময়ে একটা নতুন ছেলেকে তার প্রতিযোগী ভাবার আসলে কোনও মানে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঞ্জীবকে খোলা মনে স্বাগত জানাতে পারছে না অরিন্দম। তার কারণ কিন্তু সঞ্জীব নিজেই।

ছবিটা হিট করার পরে খবরের কাগজের পাতায় বিরাট একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিল সঞ্জীব। তার প্রতিটা শব্দ ভালো করে মনে আছে অরিন্দমের। সঞ্জীব বলেছিল, সে টালিগঞ্জ জয় করতে এসেছে, তাকে ঠেকানোর মতো কোনও অভিনেতা নাকি এখানে নেই। অরিন্দমের অভিনয়ের প্রসঙ্গে বলেছিল অরিন্দমের অভিনয় ম্যানারিজমে ভরতি। কথায়-কথায় অরিন্দম দাড়িতে হাত বুলোয়, কথা বলে দাঁত চেপে। সঞ্জীব এই পুরোনো ধারার অভিনয়ে বিশ্বাস করে না।

প্রভাত ফেরী সিনেমাটা যখন হিট করেছিল, তখনও প্রচারমাধ্যমের এত রমরমা ছিল না। খবরের কাগজে সিনেমার থেকেও রাজনীতির খবরই ছাপা হত বেশি। সিনেমার জন্য বরাদ্দ থাকত প্রতি শুক্রবার খবরের কাগজের পাতার একটা কোণ। এর বেশি নয়। এ ছাড়া ছিল কয়েকটা সিনেমা পত্রিকা, সিনেমার প্রচারে সেটাই যথেষ্ট ছিল। সিনেমা চলত সিনেমার গুণে, প্রচার মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে অরিন্দম স্টার হয়ে ওঠার কথা ভাবেনি কখনও। এখন যুগ পালটে গেছে, ফিল্ম স্টারদের ছবি প্রথম পাতাতেও ছাপা হয়।

সঞ্জীবের বিরুদ্ধাচরণ করে অরিন্দমও কাগজে ইন্টারভিউ দিতে পারত।

তাকে অনেক সাংবাদিক এ নিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা বলেছিল, অরিন্দম তা এড়িয়ে গেছে। সুকান্তর ইন্টারভিউতেও সঞ্জীব প্রসঙ্গ এসেছিল, অরিন্দম বলেছে সে সব সময়েই ইভাস্থিতে নতুনদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মিথ্যে করে বলেছিল সে সঞ্জীবের সিনেমা দেখেনি, তাই তার প্রতিভা নিয়ে সে কোনও কথা বলতে চায় না।

কিন্তু অরিন্দম প্রসঙ্গে সঞ্জীবের কথাট মনে রয়ে গেছে তার। অরিন্দমের অভিনয় পুরোনো ধরনের বলেছে সঞ্জীব। এ নিয়ে সামনাসামনি কোনও কথা সে বলবে না, কিন্তু সঞ্জীবকে সে ইভাস্থিতে কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হয় তা বুঝিয়ে দেবে প্রাঞ্জলভাবে।

সঞ্জীবের ছবির রিলিজ ডেটটার দিকে চোখ রেখে অরিন্দম ফোন করল প্রভঞ্জনদাকে। কয়েক ঘণ্টা আগেই প্রভঞ্জনদার সঙ্গে কথা হয়েছে তার কাগজের ইন্টারভিউ নিয়ে। এখন অরিন্দমের ফোন পেয়ে সে কারণে তিনি অবাক হলেন একটু। ফোন তুলে বললেন, ‘কী ব্যাপার অরিন্দম? মত বদলালে? প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়েছ সুকান্তকে?’

অরিন্দম হেসে বলল, ‘না প্রভঞ্জনদা, ওই ইন্টারভিউ নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই। আপনাকে ফোন করেছিলাম অন্য কারণে।’
‘কী হয়েছে বলো!’

‘আপনার ছবির শুটিং তো শেষ। গানও হয়ে গেল, এবারে রিলিজ ডেট কী ঠিক করলেন?’

প্রভঞ্জনদার রিলিজ ডেটটা শুনে নিল অরিন্দম। তার ছবি রিলিজ করছে সঞ্জীবের ছবির দু-সপ্তাহ পরে। অর্থাৎ প্রভঞ্জনদারা কোনও রিস্ক নিতে চাইছেন না, সঞ্জীবের ছবিকে দু-সপ্তাহ ছাড় দিয়ে তবে বাজারে আসতে চাইছেন।

অরিন্দম বলল, ‘প্রভঞ্জনদা, আমার একটা বক্তব্য আছে রিলিজের ব্যাপারে। আপনার ডেটটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, ওই ডেটটা চেঞ্জ করতে হবে!’

‘এই রে, তুমিও আবার এইসব নিয়ে কুসংস্কার শুরু করলে নাকি?’
এরকম কথা তো তোমার কাছে শুনি নি কখনও।’

‘কুসংস্কার নয় প্রভঞ্জনদা। স্ট্র্যাটেজি। আপনার রিলিজ দু-উইক এগিয়ে আনতে হবে।’

‘দু-সপ্তাহ এগোব মানে? ওই দিন অন্য সিনেমা আছে মার্কেটে। ক্ল্যাশ

করে যাবে। ফালতু রেডিও বাড়ি খাবে।’

‘আপনি ছবি রেডি করতে পারবেন কি না বলুন। ক্ল্যাশ যাতে না করে তা দেখার দায়িত্ব আমার।’

‘রেডি তো হয়ে যাবে অরিন্দম। বাকি তো আর কিছু নেই।’

‘গুড। আপনি দু-সপ্তাহ এগিয়ে এনে রিলিজ করবেন। আপনার প্রোডিউসারদের সঙ্গে রাইটস নিয়ে অলরেডি কথা হয়েছে। ছবির গান ভালো, ছবি ভালো হয়েছে, আপনি ভয় পাবেন না ফালতু। রেডিও যাতে বাড়ি না খায় তা দেখার দায়িত্ব আমার।’

প্রভঞ্জনদর ফোনটা ছেড়ে দিয়ে অরিন্দম এবারে ফোন করল ইন্দ্রজিৎ গুহকে। ইন্দ্রজিৎ গুহ বাংলা সিনেমার নামকরা একজিবিটর, কলকাতার তিনটে বাংলা সিনেমার হলের তিনি মালিক। এ ছাড়াও আরও অনেকগুলো হলে কী সিনেমা চলবে তার বুকিং তিনি করেন। ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অরিন্দমের, তার ফোন পেয়ে উষ্ম গলায় ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন, ‘আরে অরিন্দম, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। আমি তোমায় এখনই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কী সব লিখেছে কাগজে ছ্যা ছ্যা ছ্যা! কেনও মানে হয় না। অরিন্দম এখনও বেস্ট, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিস্যু জানে না এরা।’

অরিন্দম হেসে বলল, ‘খবরের কাগজের জানার দরকার নেই ইন্দ্রদা, তুমি-আমি জানলেই চলবে। ওরা কী লিখল তাই দিয়ে তোমার ব্যবসা চলবে?’

‘ঠিক কথা বলেছ। কত দেখলাম। রিভিউ লিখল দারুণ ভালো, ছবি চলল না একটুও। খারাপ লিখল, হইহই হিট। পাবলিক খবরের কাগজ পড়ে খোড়াই সিনেমা দেখতে আসে! এলে তো হয়েই যেত, হে হে। তা বলো কী ব্যাপার?’

অরিন্দম বলল, ‘আজকে সফ্রেটা ফাঁকা রাখো ইন্দ্রদা। তোমার সঙ্গে আমার একটা ব্যাপারে দরকার আছে। ন’টার সময়ে মিট করতে পারবে?’

‘কোনও প্রবলেম নেই। কোথায় বসবে বলো?’

‘ক্লাবে বসব চলো। অনেকদিন তোমার সঙ্গে বসে মাল খাইনি।’

কী ব্যাপার বলো তো? কোনও ষড়যন্ত্র নাকি?’

‘আরে না, না! দেখা হোক, বলছি সব কথা!’

১১

ছোটবেলায় সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়াটা তিতিরের অভ্যেসের মধ্যে ছিল, আজকাল তার ঘুমোতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। রাত জেগে বসে টিভি দেখা এখন তিতিরের অভ্যেসের মধ্যে পড়ে গেছে। অনেক সময়েই বসার ঘরে বসে সারারাত ধরে বিদেশি সিনেমা দেখতে থাকে। রুমি রাত জেগে পড়াশুনা করে, তাদের ঘরের আলো জ্বলে সে কারণে, আলো জ্বললে তিতিরের ঘুমোতে অসুবিধে হয়।

হাতে পয়সা নেই বলে কয়েকদিন ফ্ল্যাট থেকে বেরোচ্ছে না বিশেষ। বেরোলেই অকারণে বেশি খরচ হয়ে যায়, আপাতত ক'দিন না বেরোনোই ভালো। রাতেরবেলা জেগে থাকলে খিদে পেয়ে যায়, রুমি পড়াশুনার ফাঁকে-ফাঁকে কফির সঙ্গে বিস্কুট খায়—তার একটা ভাগ প্রাপ্য হয় তিতিরের। রুমি আজকাল তিতিরের সঙ্গে কথা বলে না খুব একটা, সেদিন সারারাত বাইরে কাটানোর পর থেকে রুমি কেমন যেন গুম মেরে গেছে। তিতিরের প্রতি রুমির কোথাও একটা অধিকারবোধ আছে, সেটা তার এইরকম অভিমानी আচরণে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

আজও ঘুমোতে-ঘুমোতে প্রায় ভোর হয়েছে, ফোনের শব্দে যখন ঘুম ভাঙল তখন ক'টা বাজে তা বুঝতে পারেনি তিতির। ঘুমের ঘোরে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখল অনিমেদার নাম ফুটে উঠেছে। মোবাইলের ঘড়িতে দেখাচ্ছে বেলা প্রায় বারোটা বাজে প্রায়। বহুক্ষণ ঘুমিয়েছে তিতির, এখন তার উঠে পড়ার সময় হয়ে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল বাইরে কটকটে রোদ—ওই রোদের তেজে তিতিরের চোখ জ্বালা করে উঠল। রুমির বিছানাটা খালি, অর্থাৎ সে উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। তার কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হয় সে এই ভয়ঙ্কর রোদের মধ্যেই বাইরে কোথাও বেরিয়েছে।

ফোনটা নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল, কারণ ধরতে-ধরতেই কেটে গেল। ডিসপ্লিতে দেখাচ্ছে অনেকগুলো মিসড কল, তার মধ্যে তিনটেই অনিমেদার। অনিমেদা ছাড়াও মা ফোন করেছিল, ফোন করেছিল পূজা

এবং সেইসঙ্গে অর্ক। পূজা সেই রাতের পর থেকে মাঝে-মাঝেই ফোন করেছে, তার ফোন এড়িয়ে গেছে তিতির। পূজাদের সঙ্গে সেই রাতের অভিজ্ঞতা তিতিরের মোটেও ভালো লাগেনি, সে তাদের এড়িয়ে চলতে চায়।

মা'র ফোনটা দেখে তিতিরের মনটা খারাপ হল একটু। মা'র সঙ্গে তার দেখা হয়নি অনেকদিন হতে চলল। শঙ্করলালের শরীর খারাপ হওয়াতে মা দিল্লিতে আটকে রয়েছে, এখনও কলকাতায় ফেরেনি। পুনরায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার আবেদন জানাতেই নিশ্চয় মা'র ফোন, তিতির মা'র ফোনটাকে সে কারণে খুব গুরুত্ব দিল না। তার বাবা কিংবা তিতিরের থেকেও ওই মল্লিমশাইই বরাবর মা'র কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মায়ের ফোন নিয়ে বেশি ভাবতে চায় না তিতির।

অনিমেষদার ফোনটা অবশ্য ইম্পোর্ট্যান্ট। অনিমেষদা বলেছিল কাজ শুরু হওয়ার আগে তাকে খবর দেওয়া হবে, এখন নিশ্চয় কাজের খবর দিতেই অনিমেষদা ফোন করেছিল। কাজ শুরু হওয়াটা খুব জরুরি, কাজ শুরু না হলে পয়সা-কড়ির সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না তিতিরের। আর কিছুদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা না হলে তাকে তার বাস-প্যাঁটরা গুটিয়ে আবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাড়ি কিছুতেই ফিরতে চায় না তিতির, বাড়ির কথা ভাবলেই তার মন খারাপ হতে শুরু করে আবার। ছোটবেলা থেকেই সে বাড়িতে কখনও শান্তি পায়নি, এখনও তার বাড়ির কথা ভাবলেই মনের মধ্যে অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়। বাড়ির বাইরেই ভালো আছে তিতির, মায়ের সঙ্গে রোজকার ঝগড়া-ঝাঁটি থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। প্রতিদিনের অশান্তির থেকে একটু দূরে থাকলেই মায়ের সঙ্গে তিতিরের সম্পর্ক বরং ভালো থাকবে।

মা'কে পরে কোনও সময়ে ফোন করে নেবে তিতির, কিন্তু সবার আগে তার অনিমেষদাকে ফোন করা প্রয়োজন। কিন্তু তার ফোনের ব্যালেন্স মাইনাসে চলে গেছে, এই ফোন থেকে এখন কাউকে এমনকি মিসড কলও দেওয়া যাবে না। তার হাতে টাকা-কড়ির যা অবস্থা তাতে আপাতত ফোনে ব্যালেন্স ভরাতেও চায় না তিতির, সে ঠিক করল বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে বাইরের পাবলিক বুথ থেকে অনিমেষদাকে একটা ফোন করবে।

মুখ ধুয়ে একটা টি-শার্ট গায়ে গলিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর মুখে

দেখা হয়ে গেল রুমির সঙ্গে। রুমি দোকানে গেছিল, তার হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে নানারকম সামগ্রী। রুমি সারাদিন টুকটাক খাওয়াদাওয়া করতে ভালোবাসে, তার স্টকে সব সময়ে পাঁউরুটি, ডিম, নুডল, বিস্কুট আর ইনস্ট্যান্ট কফির পাউচ থাকে। ফুরিয়ে গেলেই টেনশনে পড়ে যায় রুমি, দোকানে ছোট পুনরায় কেনাকাটা করতে।

আড়চোখে তিতিরের দিকে তাকিয়ে রুমি বলল, ‘কোথায় যাচ্ছিস?’

রুমির কথা বলার ধরনটা একটু শুষ্ক মতো, কয়েকদিন ধরেই অভিমানবশত তিতিরের সঙ্গে ঠিক করে কথা বলছে না সে। এমনিতে হয়তো তিতিরের সঙ্গে কথা বলত না, কিন্তু এই অসময়ে রোদ্দুরের মধ্যে তিতিরকে বেরোতে দেখে সে কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

তিতির বলল, ‘ফোন করতে। একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফোন এসেছিল!’

রুমি এক ঝলক তাকাল তিতিরের দিকে। তারপর একটু শ্লেষের সুরে বলল, ‘হুঃ, ইম্পর্ট্যান্ট ফোন! নিশ্চয় পূজা? প্রাণের বন্ধু জুটেছে এখন!’

তিতির একটু হেসে বলল, ‘পূজাকে ফোন করতে যাচ্ছি না। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না তোকে তো বলেছি। অনিমেষদাকে ফোন করতে হবে। ফোন করেছিল। কাজের ব্যাপারে হয়তো!’

প্যাকেট থেকে জিনিসপত্রগুলো বার করে গুছিয়ে রাখতে-রাখতে রুমি বলল, ‘আমার ফোন থেকে করে নে। তোকে কতবার বলেছি, দরকার হলে বলবি আমাকে!’

তিতির একটু থমকে দাঁড়াল। বাইরে থেকে ফোন করতে গেলে তাকে মোড়ের মাথা অবধি হাঁটতে হবে, তাতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হয়ে যাবে। রুমির ফোন ব্যবহার করতে পারলে কিছুটা সময় বেঁচে যায়। অনিমেষদা কেন ফোন করেছিল জানতে কৌতূহল হচ্ছে তিতিরের।

রুমি পকেট থেকে ফোনটা বার করে এগিয়ে দিল তিতিরের দিকে। ফোনটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে রুমির দিকে তাকাল তিতির। বলল, ‘ইন এনি কেস আমায় বেরোতে হবে রে, সিগারেট কিনতে হবে।’

রুমি বলল, ‘তোমার সিগারেটও আমি কিনে এনেছি। কিন্তু ইউ নো হোয়াট? তুই আজকাল বেশি সিগারেট খাচ্ছিস। আগে সাত-আটটার বেশি খেতি না। আজকাল প্রায় দেড় প্যাকেট!’

তিতির অবাক হল আবার। সে সত্যি-সত্যি বেশি সিগারেট খাচ্ছে,

রুমি সেটা নজর করেছে ঠিক! মা'ও কখনও এইভাবে তিতিরের দিকে খেয়াল রাখত বলে তার মনে হয় না। রুমি মেয়েটা ভালো, তাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসে। এই দুনিয়ার ভালোবাসার লোক কমে যাচ্ছে, তিতিরের চোখ দুটো সামান্য জ্বালা করে উঠল।

অনিমেষদার ফোনটা এনগেজড যাচ্ছে, দু-তিনবার চেষ্টা করে ফোনটা টেবিলে রেখে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিং ব্যাক করল অনিমেষদা। অনিমেষদার কাছে রুমির নম্বর নেই, সুতরাং তিতির হ্যালাও বলার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষদা বলল, 'আমার নাম অনিমেষ সেনগুপ্ত। আমাকে কি কেউ ফোন করেছিলেন এই নম্বর থেকে?'

অনিমেষদা খুব ভদ্র একজন মানুষ, এখনও সে ব্রিটিশ ভদ্রতা অনুযায়ী অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলেও সেই ফোন ফিরিয়ে দেয়। তিতির তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, আজকাল বেশিরভাগ লোকেরই ভদ্রতাবোধ নেই বললেই চলে, অনিমেষদা তার ব্যতিক্রম। তিতিরের সঙ্গে রোজ চৈচামেচি করলেও বাইরের লোকের কাছে তা মা'ও খুব ভদ্র। তিতিরের মধ্যেও সে কারণে এক ধরনের সহজাত ভদ্রতাবোধ আছে।

তিতির বলল, 'আমি তিতির বলছি অনিমেষদা, খুঁজছিলেন আমায়?'

তিতির কে বোঝার জন্য এক মুহূর্ত সময় নিল অনিমেষদা। তারপর বলল, 'খুঁজছি মানে? কখন থেকে খুঁজছি। করোটা কী তোমরা? ফোন ধরো না কেন?'

তিতির যে ঘুমোচ্ছিল তা অনিমেষদাকে বলা মুশকিল ব্যালেন্স নেই বলে ফোন ব্যাক করতে দেরি হল সে কথাও বলা যায় না। তিতির বলল, 'সরি। ফোনটা সঙ্গে ছিল না, সেই জন্য...'

'প্রোডাকশনে কাজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি অন ফোন, অলওয়েজ। এনিওয়ে, তুমি এখন কীভাবে প্লেসড?'

'কীভাবে প্লেসড মানে?'

'মানে তুমি কি কোনও কাজে ব্যস্ত আছো?'

'না তো!'

ওড। তাহলে আর দেরি না করে এখনই আমাদের অফিসে এসো। অরিন্দমদা তোমার একটা এন্টারভিউ নেবেন। দেরি কোরো না, যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। অরিন্দমদাকে বিশ্বাস নেই, ছট করে বেরিয়ে টেরিয়ে গেলে...'

‘এখনই আসব? আসলে আমি...’

‘আসলে আমি আবার কী? এখনই আসবে। যত তাড়াতাড়ি পারো আসবে, অরিন্দমদা থাকতে-থাকতে জিনিসটা ফাইনাল করে যাও।’

‘আচ্ছা।’

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে রুমির দিকে তাকাল তিতির। বলল, ‘অনিমেষদা ফোন করেছিল। এখনই যেতে বলছে অফিসে। জাস্ট হোপ কাজটা আজ হয়ে যাবে।’

ভুরু কুঁচকে রুমি বলল, ‘এখনই যাবি মানে? তুই তো ব্রেকফাস্ট করিসনি এখনও। লাঞ্চ ডেলিভারি আসতে এখনও এক ঘণ্টা কিছু একটা খেয়ে যা।’

‘সময় নেই। কাজটা হোক আগে, খাওয়াদাওয়ার কথা তখন ভাবব।’

রুমি বলল, ‘অ্যাট লিস্ট টপটা চেক কর। এরকম জামা পরে কেউ ইন্টারভিউ দিতে যায়?’

নিজের টি-শার্টটার দিকে তাকিয়ে দেখল তিতির। টি-শার্টটা সত্যি অতি ব্যবহারে একটু ন্যাতা মতো হয়ে গেছে—এই পোশাকে পাড়ার মোড়ের দোকান অবধি যাওয়া গেলেও কাজের জায়গায় না যাওয়াই ভালো।

মাথা নেড়ে ঘরে ঢুকে জামা পালটাল তিতির। জামা বদলানোর সময়ে খেয়াল করল রুমি তাকিয়ে আছে তার দিকে। পিজি-তে এসে তিতির দেখেছে এখানে সবাই সবার সামনে জামা বদলায়, তাই অন্যের সামনে পোশাক বদলানোর ব্যাপারটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু রুমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তিতিরের একটু অস্বস্তি হয়, সে হেসে জিগ্যেস করল, ‘কী দেখিস রে হাঁ করে?’

রুমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। তারপর লাজুক হেসে অস্ফুটে বলল, ‘কিছু না।’ কয়েক মুহূর্তে চুপ করে থেকে অস্ফুটে যোগ করল, ‘তোকে দেখতে আমার ভালো লাগে।’

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চুলটা আঁচড়ে নে। আর দুশোটা টাকা সঙ্গে রাখ, আমি জানি তোর কাছে টাকা নেই কোনও!’

গলফ গার্ডেন্সে প্রোডাকশন অফিসের ফ্ল্যাটটা একটা গলির ভিতরে। অনিমেষদার সঙ্গে কথা বলতে আগে একবার এখানে এসেছিল তিতির। সেদিন সঙ্গে পূজা ছিল, আজ তাকে নিজে-নিজে খুঁজতে-খুঁজতে আসতে

হয়েছে। তিতিরের ডিরেকশন সেন্স খুব খারাপ, আজ নতুন করে আবার তা বুঝতে পারল সে।

আগেরবার এসে দেখেছিল ফ্ল্যাটের মধ্যে জোরকদমে অফিস বানানোর কাজ চলছে, আজ সে ফ্ল্যাটের চেহারাটা দেখে মুগ্ধ হল। দরজা দিয়ে ঢুকে বিশাল হলঘরটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, আগের দিন এখানে মিস্তিরিরা কাঠের কাজ করছিল। হলঘরটার একপাশে একটা রিসেপশন তৈরি হয়েছে, সেখানে অবশ্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রিসেপশনের সামনে অপেক্ষা করার জন্য সোফা সেট, সেখানে কেউ একজন বসে আছে, পিছন থেকে তার মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

তিতির এগিয়ে গেল ওই সোফার দিকে, কারণ সে ধরে নিয়েছে আপাতত তাকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সোফায় বসার সময় তিতির খেয়াল করল সোফায় উপবিষ্ট অপেক্ষমাণ অপর ব্যক্তিটিকে সে চেনে, পূজর মাধ্যমে তার সঙ্গে কয়েকদিন আগে আলাপ হয়েছে তিতিরের। ছেলেটি অর্ক, যাকে আপাতত এড়িয়ে চলতে চাইছে সে।

তিতিরকে দেখে অর্কও অবাক হয়েছে, সেই সঙ্গে মনে হল খুশিও হয়েছে একটু। একটু হেসে অর্ক বলল, ‘তুই এখানে কী করছিস?’

‘কাজের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। তুই কী করছিস?’

‘আমিও তাই। এদের একটা লোগো ডিজাইন করে দিতে হবে।’

‘ও!’

‘তুই কি অ্যাক্টিং করছিস এদের সিরিয়ালে? সেই জন্য এসেছিস?’

‘না! প্রোডাকশন হাউসে কাজ করব এরকম কথা হয়েছে। অ্যাক্টিং নয়।’

‘ও আচ্ছা!’

তিতির অর্কের সঙ্গে কথা বলতে চায় না বেশি। সেই রাতের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে তার ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি হতে থাকে। কী ঘটেছিল তার নিজেই ভালো করে জানে না তিতির, সে শুধু জানে নানারকম নেশার ঘোরে সে একটা সময়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল। সে কী করেছে তার পরের দিন সকালে তার মনে পড়েনি। তার ঘুম ভেঙেছিল সম্পূর্ণ অচেতন একটা ঘরে, সেখানে জানলা দিয়ে এক টুকরো আলো এসে পড়েছিল ঘরের মেঝের ওপর। সেই আলোর ছটা তিতিরের চোখে বিঁধছিল, সে কারণেই তার ঘুম ভেঙেছিল। ঘুম ভেঙে লক্ষ

করেছিল অচেনা ঘরে সে শুয়ে আছে অচেনা একটা খাটে, এই খাটে কস্মিনকালেও ঘুমোয়নি তিতির। তিতির খেয়াল করেছিল তার পরনে পোশাক নেই, গায়ের ওপর চাদর টানা রয়েছে আলগোছে। সেইসঙ্গে বুঝতে পেরেছিল, কাল রাতে পূজাদের সঙ্গে যেখানে গেছিল, এই জায়গা সেটা নয়।

অচেনা ওই ঘরটাতে কেউ ছিল না, তিতিরের পোশাক রাখা ছিল তার মাথার কাছে খাটের হেডরেস্টের ওপর। তড়িৎগতিতে পোশাক পরে নিয়েছিল তিতির, ভদ্রস্থ করে তুলেছিল নিজেকে। তখনও তার আগের রাতের নেশার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি, তার মাথার মধ্যেটা বিম্বিম্ব করে উঠছিল, সে সঙ্গে বুঝতে পারছিল মাথাটা পাথরের মতো ভারি হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকেছিল অর্ক, খুব স্বাভাবিক গলায় তিতিরকে ‘গুড মর্নিং’ বলেছিল। তিতিরের জন্য কাপে করে চা নিয়ে এসেছিল অর্ক।

অর্কের কাছে গত রাতের ঘটনা যা শুনেছিল তিতির তা তার বিশ্বাস হতে চায়নি। জেদ করে পূজার সঙ্গে যে ফ্ল্যাটে সে গেছিল, সেখানে সে রাত কাটাতে চায়নি বলে অর্কের সঙ্গে সে বেরিয়ে এসেছিল অনেক রাতে। অর্কের সঙ্গে সে এসে পৌঁছেছিল অর্কের চিলেকোঠার বর্ষাতিতে। এখানে সে অর্কের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। মুচকি হেসে অর্ক বলেছিল, ‘ইউ আর অ্যামেজিং তিতির, জাস্ট টু গুড ইন বেড!’

স্তুভিত হয়ে গেছিল তিতির! সে কখন সেখান থেকে বেরিয়েছে, কখন সে এখানে এসে অর্কের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেছে এসব কিছু তার স্মৃতিতে নেই। সত্যি কী ঘটেছিল তা তার মনে পড়ছে না অদৌ। মদ এবং গাঁজা-চরসের নেশায় সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। তার শরীর তখন একটি পুরুষের সঙ্গে সন্তোষে লিপ্ত হয়েছিল হয়তো বা, যা নেশার ঘোরে তিতির বুঝতে পারেনি নিজে। পরে তার সেই সময়ের শরীর চাহিদার স্মৃতিটুকুও হারিয়ে গেছে চেতনার অন্য কোনও স্তরে। তিতিরের রাগ হয়েছিল নিজের ওপর, সেইসঙ্গে গ্লানিতে ভরে উঠেছিল তার মন। অবিশ্বাস ভরা চোখে অর্কের দিকে তাকিয়েছিল সে।

কোনওরকমে চা শেষ করে অর্কের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছিল তিতির। রোদের মধ্যে দুবার অটো পালটে ফিরে গেছিল নিজের পিজি ফ্ল্যাটে। রুমি উদ্বেগ করেছে সারা রাত্তির, তার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর

না দিয়ে চুপ করে শুয়েছিল নিজের বিছানায়। নিজেকে খারাপ ভাবতে শুরু করেছিল সে। বরাবর সে ভেবে এসেছে কাউকে মানসিকভাবে ভালো না বাসলে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না—কী করে নেশার ঝোঁকে সে তার এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তা বুঝতে পারছিল না ঠিক করে! তিতির যা করেছে তা তার করা ঠিক হয়নি, এর কোনও ক্ষমা নেই। নিজের অজান্তে নিজের সম্পর্কে সে কী ধারণা দিয়েছে অর্ককে? অর্কর কেন মনে হয়েছে সে বিছানায় খুব ভালো? তিতিরের কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু তার চোখ থেকে জল বেরোয়নি এক ফোঁটাও।

তিতিরের ভয়ও করেছিল। সে আজকের যুগের মেয়ে, তার ভালো করে জানা আছে কারও সঙ্গে এইভাবে শরীরী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। তার শরীরে ভয়ানক কোনও ব্যাধি বাসা বেঁধেছে কি না তার রক্তপরীক্ষা করে দেখার সাহস হয়নি তিতিরের, কিন্তু ওষুধের দোকান থেকে সে গর্ভনিরোধক পিল কিনে খেয়ে নিয়েছিল।

এখন অর্ককে দেখে তিতিরের মনের মধ্যে জমে থাকা সেই গ্লানিগুলো আবার বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে। তার অর্কর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না, তাকালেই নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে তার। অর্কদের সে এড়িয়ে চলবে ঠিক করেছিল, কী দরকার ছিল তার সঙ্গে হঠাৎ করে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার? শরীরের অভিজ্ঞতা তিতিরের কাছে কখনওই সুখকর নয়, সে কিছুতেই কারও সঙ্গে শরীরী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে না। তার কাছে এই মুহূর্তে অনেক বেশি জরুরি একটা কাজ। ভালো করে কাজ করে সকলের কাছে প্রমাণ করা দরকার সে ফেলনা নয়, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে তার কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

অর্কর সঙ্গে বেশি কথা বলার প্রয়োজন হল না, কারণ অনতিপরেই ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অনিমেষদা। তিতিরকে দেখে বলল, ‘ও তুই কখন এলি? এসেছিস, জানাবি তো! তোর জন্যেই ওয়েট করছি আমরা।’ তারপরই অর্কর দিকে ফিরে বলল, ‘আপনি কী ব্যাপারে?’

অর্ক উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, ‘আমি একবার কথা বলতে এসেছিলাম। আপনাদের একটা লোগো ডিজাইন করতে হবে শুনলাম। থ্রি-ডি অ্যানিমেশনে। আমাকে একজন খবর দিল...’

অর্কর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে অনিমেষদা বলল, ‘হু। ঠিক আছে,

আপনার সঙ্গে আমি বসে নিচ্ছি। একটা ফোন করে আসবেন তো, ছুট করে কেউ এভাবে অরিন্দমদার সঙ্গে দেখা করতে আসে নাকি? তিতির, তুই আয়, তোকে অরিন্দমদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এখানে বসুন, আপনাকে আমি ডেকে নিচ্ছি।’

তিতির বুঝল অর্ক গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়, এখানে অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা বলেছে বটে অনিমেঘদা, কিন্তু কোথাও একটা পাত্তা না দেওয়ার সুর। তিতিরের প্রতি বরণ অনিমেঘদা অনেক আন্তরিক, এতে মনে-মনে খুশি হল সে। অর্কের দিকে তাকানোর আর প্রয়োজন মনে করল না তিতির, সে অনিমেঘদার সঙ্গে রওনা হল ফ্ল্যাটের অন্দরমহলের দিকে।

ভিতরে নিয়ে যেতে-যেতে অনিমেঘদা বলল, ‘ঠিক করে কথা বলিস। তোর কথা আমি বলে রেখেছি।’

এতক্ষণ অবধি তিতিরের কিছু মনে হয়নি, অনিমেঘদার কথায় হঠাৎ মনে হল সে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউ দিতে এসেছে, তার আচরণের ওপর তার এই কাজটা পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করছে। তিতিরের বুকের মধ্যেটা একটু দূরদূর করে উঠল, গলাটা শুকোল সামান্য। অরিন্দম মুখার্জির সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার আগে একটু জল খেয়ে নিলে ভালো হত। কিন্তু তার যে জলতেপ্তা পেয়েছে সে কথা অনিমেঘদাকে বলতে চাইল না তিতির। অনিমেঘদা ভাববে সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

অরিন্দমের চেম্বারের দরজা ঠেলে তিতিরকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল অনিমেঘদা। বলল, ‘অরিন্দমদা, এ হচ্ছে তিতির। এর কথা তোমাকে বলে রেখেছি। কথা বলে নিও।’

ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে অরিন্দম তিতিরের দিকে তাকাল। বলল, ‘বোসো। অনিমেঘ, তুইও বোস, একসঙ্গেই কথা বলে নিই।’

অনিমেঘ ইতস্তত করে বলল, ‘তুমিই কথা বলো না অরিন্দমদা। একটা গ্রাফিক ডিজাইনার ছেলে এসেছে, ওকে নিয়ে আমি একটু বসে যাই। ফালতু আটকে রেখে কী হবে!’

অরিন্দম মাথা নাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনিমেঘদা। তিতিরের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, ‘কী হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো!’

অরিন্দমের সঙ্গে আগে পার্টিতে দেখা হয়েছে তিতিরের, অরিন্দম সেদিন সুট পরে ছিল। আজ অরিন্দমের পরনে উজ্জ্বল নীল রঙের টি-

শার্ট। টি-শার্টটা তার গায়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে মানিয়েছে ভালো, তিতিরের আবার মনে হয় স্ক্রিনের থেকে অরিন্দমকে সামনাসামনি বেশি ভালো দেখতে। চেয়ার টেনে নিয়ে অরিন্দমের সামনে বসতে বসতে তিতির লক্ষ করল সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। যেন ওই দৃষ্টির মাধ্যমে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করছে এই মেয়েটাকে দিয়ে তার প্রোডাকশনের কাজ চলবে কি না। তিতিরের সঙ্গে যে অরিন্দমের আগে পরিচয় হয়েছে এমন কোনও লক্ষণ তার দৃষ্টিতে নেই। পার্টিতে তিতিরের উপস্থিতির কথা অরিন্দম ভুলে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। অরিন্দমের মতো একজন মানুষকে নিশ্চয় অনেকের সঙ্গে মিশতে হয়, তিতিরের মতো সাধারণ চেহারার কাউকে তার মনে রাখার কথা নয়। তিতিরকে ভুলে যাওয়া একপক্ষে ভালো, সেদিন পূজার সঙ্গে ছিল সে। পূজা ভয়ঙ্কর মাতলামি করছিল, তিতিরের পরিচয় পূজার সঙ্গে যুক্ত না হওয়াই মঙ্গল।

তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, ‘কফি খাবে?’

তিতিরের গলার মধোটা শুকিয়ে উঠেছিল, অরিন্দমের কথায় তার আড়ষ্টতা দূর হল একটু। সে ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়েই চলে এসেছে এখানে, কফি খাওয়ার প্রস্তাবে মনে-মনে খুশিও হল একটু। একটু লাজুক হেসে তিতির মাথা নাড়ল। তাই দেখে অরিন্দম টেবিলের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা অদৃশ্য বোতাম টিপল, মুহূর্তের মধ্যে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে, তার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, ‘নিধিরাম, চট করে দু-কাপ কফি দিয়ে যা তো!’

কফি আসতে সময় লাগল না খুব বেশি, কফির কাপে চুমুক দিয়ে অরিন্দম জিগ্যেস করল, ‘তোমার সিভি-টা আমি দেখেছি। আগে তো কোনও কাজ করেনি দেখছি, তুমি এখানে কাজ করতে পারবে তো?’

তিতির মাথা নেড়ে জানাল সে পারবে।

তিতিরের মাথা নাড়া দেখে অরিন্দম মুচকি হাসল। তারপর বলল, ‘কাজটা কী তাই তো জানো না তুমি! কী করে জানলে তুমি পারবে?’

এর কোনও উত্তর হয় না। তিতির বলল, ‘আস্তে-আস্তে শিখে নেব স্যার। আর কেউ যদি দেখিয়ে দেয় আমি ঠিক পেরে যাব।’

অরিন্দম বলল, ‘স্যার বলবে না। এই ইন্ডাস্ট্রিতে স্যার বলার কালচার নেই। বসে বা চেনাই গেলে স্যার বোলো। আমাকে অরিন্দমদা বলে ডাকবে, এখানে সেটাই নিয়ম।’

‘আসলে আপনি অনেক সিনিয়র...’

অরিন্দম মুচকি হাসল। তারপর বলল, ‘আমাদের প্রোফেশনে সিনিয়র-জুনিয়র বলে কিছু হয় না। বরং জুনিয়ররাই এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। নতুন আইডিয়া আসে জুনিয়রদের থেকেই, আমাদের মতো সিনিয়রদের মাথায় আর কিছু আসে না। বুড়ো হয়ে গেলে যা হয় আর কী!’

অরিন্দম লোকটা খুব মজার তো। এত পরিচিত সুপারস্টার, নিজেকে বুড়ো বলছে! তিতির হেসে ফেলে বলল, ‘আপনি মোটেই বুড়ো নন অরিন্দমদা। আপনাকে দেখে কেউ বলবে না আপনি বুড়ো!’

অরিন্দম হাসল, তারপর আরও অনেক কথা বলতে শুরু করল তিতিরের সঙ্গে। একে ঠিক ইন্টারভিউ বলা যাবে না, কফি খেতে-খেতে অরিন্দম আসলে গল্প করল তিতিরের সঙ্গে। বলল, সিনেমা এবং টেলিভিশনের কাজের কোনও কাজের সময়সীমা থাকে না, কাজ থাকলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আউটডোর শুটিংয়ে কলকাতার বাইরেও যেতে হতে পারে, এ সব নিয়ে বাড়িতে সমস্যা হলে তিতিরের পক্ষে এই কাজে জয়েন না করাই ভালো। তিতির বলল না সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, এখন একটা পিজি অ্যাকোমোডেশনে থাকে। শুধু জানাল, এ সব নিয়ে তার বাড়িতে কোনও অসুবিধে হবে না। কাজের এই বেয়ারা রুটিনের কথা অনিমেঘদা তাকে আগেই জানিয়েছে।

একেবারে শেষে অরিন্দম জিগ্যেস করল, ‘তুমি এখানে মাছুলি স্যালারিতে জয়েন করবে, এরকমই কথা হয়েছে তো অনিমেঘের সঙ্গে?’

‘হ্যাঁ, অনিমেঘদা সেরকমই বলেছিল।’

‘কত স্যালারি এক্সপেক্ট করো তুমি?’

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না তিতির, তার কোনও ধারণা নেই এই ধরনের কাজে একজন শিক্ষানবীশকে কত টাকা মাইনে দেওয়া হয়। একটু চিন্তা করে বলল, ‘আপনারা যেটা ঠিক মনে করবেন সেটা দেবেন। আমি আসলে জানি না আমার কী বলা উচিত।’

তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম হাসল। বলল, ‘তাও একটা কিছু বলবে তো! নিজের খরচ চালানোর জন্য একটা প্ল্যানিং তো তোমার আছে নাকি? তার থেকে কম স্যালারি পেলে তোমার এখানে জয়েন

করা উচিত হবে না, তাই না?’

তিতির ভুরু কৌঁচকাল। এ তো মহা মুশকিল হল, তাকে কেন স্যালারি নিয়ে জিজ্ঞাসা করে সমস্যায় ফেলা হচ্ছে? অরিন্দমের উচিত একটা কিছু অফার করা, তার অফারটা শুনলে বরং তিতিরের সুবিধে হবে। সে নিজে একটা হিসেব করেছিল কয়েকদিন আগে। কলকাতা শহরে বাড়ির বাইরে আলাদা করে থাকতে গেলে তার মাস গেলে অন্তত ছ’-সাত হাজার টাকার প্রয়োজন, এর থেকে কম কিছু হলে তার পোষাবে না।

একটা প্রোডাকশন কোম্পানি কত মাইনে দেয় তা জানা নেই তিতিরের, পূজার কাছ থেকে যা আভাস পেয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল শুরুর দিকে এইরকম অঙ্কের টাকাই পাওয়া যাবে। তিতির ঠিক করেছিল সে ছ’-সাত হাজার টাকা পেলে তবেই কাজটা করবে, নইলে চাকরি খুঁজবে অন্যত্র। সে ইংরেজিটা ভালো বলতে পারে, আর কিছু হোক না হোক একটু কল-সেন্টারের চাকরি তার জুটে যাবে বলে তার ধারণা। কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়েই সে একটা কলসেন্টারে চাকরির অফার পেয়ে গেছিল, সেই সময়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার আগে চাকরি করার ইচ্ছায় মা বাধা দিয়েছিল।

অরিন্দম বলল, ‘কী হল, চুপ করে রইলে কেন? কিছু একটা ফিগার তো বলবে!’

তিতির একটা টোক গিলে বলল, ‘আসলে কী বলব বুঝতে পারছি না। আমার আইডিয়া নেই।’

‘তাও শুনি তোমার কত টাকা হলে সুবিধে হয়।’

দম বন্ধ করে তিতির এবারে বলল, ‘সাত হাজার। এর থেকে কম হলে আমার পোষাবে না।’

তিতির দেখল ভুরু কুঁচকে অরিন্দম তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। ডান হাতের তর্জনি দিয়ে নিজের চিবুকে টোকা মারছে অবিরত। তিতিরের অস্বস্তি হচ্ছে এখন, সে কি একটু বেশি চেয়েছে কাজটার জন্য? হয়তো এখানকার মাইনে-কড়ি কম, অরিন্দম এবারে বলবে, ‘ঠিক আছে তোমার কথা শুনে রাখলাম। উই শ্যাল গেট ব্যাক টু ইউ।’

খবরের কাগজের কেরিয়ার বিষয়ক প্রবন্ধে কী করে ইন্টারভিউ দিতে হয় সে সব কথা বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে। সেই সঙ্গে লেখা থাকে ইন্টারভিউয়ের পর ‘উই শ্যাল গেট ব্যাক টু ইউ’ বাক্যটির আসল মানে

হল, তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়নি, তোমাকে চাকরিটা অফার করতে পারছি না। তিতিরের মনে হল, এই কথাটাই বলবে অরিন্দম, তাকে আপাতত এই রিজেকশনের জন্য একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে।

অরিন্দম বলল, ‘কাল থেকে জয়েন করবে। একটু চ্যানেলের সঙ্গে প্রোগ্রামের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে রয়েছে, ওই জিনিসটার কো-অর্ডিনেশন দেখবে তুমি। ওই চ্যানেল থেকে দুটো প্রোগ্রাম বার করতে হবে, তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে। আমি নিজে যাব চ্যানেল-হেডের সঙ্গে কথা বলতে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। পারবে কাল থেকে জয়েন করতে?’

তিতিরের মনের মধ্যেটা নেচে উঠেছে। তাকে অরিন্দম মুখার্জি খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়নি, সে চাকরিটা সত্যি-সত্যি পেয়ে গেছে! আর তাকে টাকাকড়ি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, মা’র কাছে হাত পাততে হবে না টাকার জন্য। সে সত্যি-সত্যি ইন্ডিপেন্ডেন্ট! ভিতরকার উত্তেজনা অনেক চেষ্টা করে বাইরে ফুটে উঠতে দিল না তিতির, বলল, ‘কাল থেকে জয়েন করতে পারব।’

‘গুড। কাল এসে অনিমেষের কাছে রিপোর্ট করবে। কখন আসবে জিগ্যেস করে যাও। হোপফুলি কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

ইন্টারভিউ শেষ। অরিন্দমের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ‘এবার তুমি এসো’ এরকম ইঙ্গিত। তিতির ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, তার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অরিন্দমও। এই লোকটা বিরাট বড় স্টার, কিন্তু এরও অসম্ভব ভদ্রতাবোধ আছে, নইলে তিতিরের মতো একজন চুনোপুটির জন্য তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।

করমর্দন করার জন্য অরিন্দম হাত বাড়াল তিতিরের দিকে। সামান্য হেসে বলল, ‘ওয়েলকাম টু অরিন্দম মুখার্জি প্রোডাকশনস। তুমি মাস গেলে দশ হাজার টাকা পাবে, আপাতত এটাই তোমার ফিক্সড স্যালারি। ছ’মাস পর তোমার পারফরম্যান্স দেখে উই শ্যাল টেক আ ফারদার কল অন দিস।’

তিতিরের চোখ সামান্য বিস্ফারিত হয়ে গেছে। সে সাত হাজার টাকা মাইনে চেয়েছিল, তার বদলে অরিন্দম মুখার্জি নিজের থেকেই তাকে দশ হাজার অফার করেছে! একটু কাঁপা হাতে সে অরিন্দমের সঙ্গে হাত মেলাল, লক্ষ করল অরিন্দমের হাতটা তার ব্যবহারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটু উষ্ণ।

তিতির ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারে বসে একটুক্ষণ চুপ করে রইল অরিন্দম। তিতির মেয়েটাকে ওই পার্টিতে দেখার পর থেকেই তার মনে থেকে গেছিল। যদিও সে যে তিতিরকে চিনতে পেরেছে এমন কোনও ইঙ্গিত আজ কথা বলার সময়ে অরিন্দম ঘুণাক্ষরেও দেয়নি।

তিতিররা আজকের যুগের মেয়ে। এই মেয়েটাকে তার ভালো করে জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন, এরা অরিন্দমের কাছ থেকে কী চায়। সিনেমা মূলত ইয়ুথ মিডিয়াম, এই প্রজন্মের সঙ্গে কানেক্ট না করতে পারলে স্টার হয়ে টিকে থাকা মুশকিল।

চিবুকে টোকা দিতে দিতে পার্থদার কথা ভাবল অরিন্দম। একজন স্টারের আসল দম বোঝা যায় তার অভিনয় দিয়ে নয়। তাকে নিয়ে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ ফ্যান্টাসাইজ করে কি না, সেটাই একজন স্টারের জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। কুড়ি-বাইশ বছরের এই তিতির নামক মেয়েটি কীভাবে তার সম্পর্কে তা অরিন্দমের বোঝা দরকার। বোঝা দরকার তিতির তাকে নিয়ে আদৌ ফ্যান্টাসাইজ করে কি না। নাকি এই প্রজন্ম সঞ্জীবের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়?

১২

একেকটা দিন থাকে যেদিন হঠাৎ করে সব কিছু ভালো লাগতে শুরু করে। মনে হয়, জীবনটা অত কিছু খারাপও নয়, সব সময়ে জীবনে মনখারাপ করে থাকার কোনও মানে হয় না। গত বেশ কয়েকদিন ধরে তিতিরের মন ভালো যাচ্ছিল না, টাকাকড়ি থেকে শুরু করে জীবনের সব কিছু নিয়ে তার টেনশন হতে শুরু করেছিল, অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলার পর তার মনটা ভালো হয়ে গেল। অরিন্দমকে তার ভালো লেগেছে, এত বড় স্টার হওয়া সত্ত্বেও খুব ভদ্র একজন মানুষ। তিতিরের মনে হয়েছে এই লোকটা চারিপাশের অন্যদের মতো নয়, এই লোকটাকে নির্দিধায় বিশ্বাস করা যায়।

অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলার পর অনিমেঘদার সঙ্গে একবার দেখা করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল তিতির। অনিমেঘদা আগামিকাল এগারোটায় অফিসে চলে আসতে বলেছে, কাল থেকেই তিতিরের কাজ শুরু হয়ে

যাবে। তিতিরের মনটা এখন এক ধরনের ভালোলাগায় ভরে আছে, এমনকী দুপুরের কড়া রোদও তার গায়ে লাগছে না। আসার সময়ে এই রোদের তেজে তিতিরের চোখ জ্বালা করছিল, এখন মনে হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর রোদটাও যেন শীতকালের রোদের মতো মিষ্টি। তিতির সকাল থেকে এককাপ কফি ছাড়া আর কিছু খায়নি, অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার শরীরের একটা চিনচিনে খিদে তৈরি হতে শুরু করেছিল। এখন ওই খিদে ভাবটাও ক্রমশ উধাও!

রাস্তার ওপর একটা ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী চায়ের দোকান, সেই দোকানের বেঞ্চিতে বসে রয়েছে অর্ক, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। একটু আগে তার চোখের সামনে অর্কের উপস্থিতি অসহ্য লেগেছিল তিতিরের, এখন অর্কেও তার খারাপ কিছু লাগছে না। সে অর্কের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘কী রে তুই এখনও এখানে? কাজ হয়নি?’

অর্ক বলল, ‘হয়ে গেছে। তোর জন্য ওয়েট করছিলাম।’

তার জন্য অর্কের অপেক্ষা করার কথা নয়, অর্কের ফোন সে গত কয়েকদিন ধরে এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও অর্ক তার জন্য অপেক্ষা করছে—এতে তিতির এমনিতে বিরক্ত হত, মনে হত ছেলেটা বড্ড বেশি গায়ে পড়া। তিতির কিন্তু বিরক্ত হল না, মুচকি হেসে বলল, ‘আমার জন্য অপেক্ষা করছিলি? কেন?’

‘জাস্ট লাইক দ্যাট। দেখা হল বেশ ক’দিন পর, ভাবলাম একটু কথা বলে যাই। তোর কাজ হল এখানে?’

‘হল। কাল থেকে জয়েন করছি।’

‘বাঃ, দারুণ তো! কত মাইনে দিচ্ছে?’

‘টেন কে। আমি ভাবিনি এত দেবে!’

‘ফেয়ার এনাফ। অরিন্দম মুখার্জির টাকা আছে। আমার কাজটা পছন্দ হলে আমাকেও ভালোই দেবে মনে হয়।’

‘তোর কাজটা কী তাই জানি না, আমি কী বলব?’

‘তুই একটু হেল্প কর না, তুই যখন জয়েনই করছিস, ওদের তো বলতে পারিস আমার কাজটা অ্যাকসেপ্ট করতে।’

তিতির সেদিন শুনেছে অর্ক একজন গ্রাফিক ডিজাইনার, আজ শুনল সে অরিন্দম মুখার্জি প্রোডাকশনের অফিসে এসেছিল একটা লোগো

বানানো নিয়ে কথা বলতে। গ্রাফিক ডিজাইনিং একটা প্রোডাকশনের ঠিক কী কাজে লাগে সে সম্পর্কে তিতিরের ভালো ধারণা নেই। সে বলল, ‘আমার কথায় কাজ হবে কি না তো জানি না। তবে চান্স পেলে নিশ্চয় বলব।’

তিতিরের কথায় অর্কর মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখাল। তারপর বলল, ‘কী করবি এখন? পিজি-তে ফিরে যাচ্ছিস?’

‘তাই যাই। কাজ নেই তো কোনও।’

‘খেয়ে বেরিয়েছিস? আমার খুব খিদে পেয়েছে, চাইনিজ খাবি? খাওয়াব।’

পিজি অ্যাকোমোডেশনে ফিরে গেলে নিশ্চয় খাবার পাওয়া যাবে। রুমি আছে ওখানে, ডাক্বাওয়াকে বলে নিশ্চয় দুপুরের খাবারের আয়োজন করে রেখেছে। তিতির স্নান করেনি এখনও—এমনিতে সে স্নান না করে দুপুরবেলা খেতে পারে না, তার অস্বস্তি হয়। কিন্তু চাইনিজের কথা শুনে তার মনে কেমন করে উঠল। তাদের জোকার বাড়ির কাছে একটা ভালো চাইনিজ খাবারের দোকান হয়েছে, ওখানে থাকলে তিতির মাঝে-মাঝে ফোন করে সেখান থেকে খাবার আনাত। একটা সময়ে মা’র সঙ্গেও মাসে একবার-দুবার পার্ক স্ট্রিটের একটা নামি দোকানে খেতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল, ওই দোকানের খাবারের স্বাদ এখনও তিতিরের মুখে লেগে আছে।

তা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে না বলল তিতির। সে এখন চাইনিজ খেতে যেতে চায় না। অর্কর সঙ্গে খেতে বেরোলে তার উচিত বিলের টাকার অর্ধেকটা অফার করা, এখন তা করা সম্ভব নয় তিতিরের পক্ষে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সে রুমির থেকে দুশো টাকা ধার নিয়ে বেরিয়েছে, তাকে এখনও একমাস মতো হিসেব করে চালাতে হবে। ভিতরে ভিতরে তিতির অসম্ভব জেদি, কারও কাছে হাত পাততে তার লজ্জা করে। সে চায় না কারও মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করতে।

তাকে মাথা নাড়তে দেখে অর্ক বলল, ‘না কেন? চল না পার্ক স্ট্রিটে যাই। কাজ নেই তো কোনও এখন। বলছি আমার কাছে টাকা আছে, তুই এখানে মাইনে পাওয়ার পর আমায় খাইয়ে দিস।’

অর্কর এখনকার অফারটা মন্দ নয়, এর মানে হল তিতির পরে তার টাকার শোধ দেওয়ার একটা সুযোগ পাবে। তিতিরের সত্যি চাইনিজ খেতে

ইচ্ছে করছে এখন, নতুন করে তার মনে পড়ে যাচ্ছে সে সকাল থেকে কফি ছাড়া খায়নি কিছু। তিতির বলল, ‘না রে বাড়িই যাই। রুমি ওয়েট করবে। বসে থাকবে না খেয়ে আমার জন্য।’

‘একটা ফোন করে জানিয়ে দো।’

‘ব্যালেন্স নেই আমার।’

‘আমার ফোন থেকে কর। আমার কথা বলিস না, বল অফিসের কাজে আটকে গেছিস, অফিসেই খেয়ে নিচ্ছিস। মিটে গেল।’

তিতির চিন্তা করে নিল কয়েক মুহূর্ত। সে রুমির কাছে এমনিতেই পূজা আর অর্কর নাম করতে চায় না। পূজা আর অর্কর নাম করলে রুমি রাগারাগি করবে, সে অনেকবার করে বলেছে এই গ্রুপটার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। অর্কর ফোন থেকে রুমিকে ফোন করা উচিতও হবে না, রুমির কাছে অর্কর নম্বর সম্ভবত আছে। তার থেকে একটা দশ টাকার ছোট রিচার্জ করে রুমিকে ফোন করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পার্ক স্ট্রিটে অনেক ফোন রিচার্জের দোকান আছে, সেখান থেকে তিতির তার ফোন রিচার্জ করে নেবে’খন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তিতির, অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে চল। আজ তুই ট্রিট দে, আমি তোকে মাইনে পেয়ে খাইয়ে দেব।’

কথা বলতে বলতে গলি ছাড়িয়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। এখান থেকে অটো করে টালিগঞ্জ ট্রামডিপো চলে যাওয়া যায়, সেখান থেকে মেট্রো করে পার্ক স্ট্রিট পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগে না। অর্ক কিন্তু সেসব লাইনে গেল না, হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি থামাল। তিতিরের জন্য দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, ‘উঠে আয়। ট্যাক্সিতে গল্প করতে করতে যাব। আর অনেকক্ষণ জয়েন্ট ধরাইনি, একটা জয়েন্ট মেরে দিতে হবে এবারে।’

ট্যাক্সি চালু হওয়ার পরেই কোমরের পাউচ ব্যাগ থেকে একটা হাতে পাকানো সিগারেট বার করে নিল অর্ক। নাকের কাছে এনে একবার গন্ধ শুকল মন দিয়ে। তারপর তিতিরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘খাবি নাকি?’

‘কী এটা?’

‘হ্যাশ। ভালো জিনিস। মানালি থেকে এসেছে। দারুণ ট্রিপ হয়। খাবি?’

‘না।’

অর্ক আর কিছু বলল না, পকেট থেকে লাইটার বার করে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল। একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁওয়াটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে দিল কিছুক্ষণ। তারপর তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ডোন্ট বিহেভ লাইক আ সিসি। অনেক বড় হয়েছিস এখন, গেট ইনটু রিয়েল লাইফ ম্যান। আর মধ্যবিত্ত হয়ে কতদিন থাকবি?’

তিতির তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অর্কের দিকে। বলল, ‘হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি মধ্যবিত্ত?’

‘আবার কী! টিপিকাল মধ্যবিত্ত। সেদিন রাতে কী এমন ঘটেছে যে তুই বাচ্চাদের মতো আমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে রাখবি? গ্রো আপ প্লিজ, ডোন্ট সান্ক লাইক আ কিড।’

তিতির বলল, ‘আই ওয়জ নট সালকিং। জাস্ট হেটেড দ্য অ্যাটমসফিয়ার। অ্যান্ড হোয়াটেভার হ্যাপেন্ড আমি নেশা করতে চাই না, কন্ট্রোল করতে পারি না।’

অর্ক কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর বলল, ‘ক্রিয়েটিভ লাইনে কাজ করতে এসেছিস অ্যান্ড নেশা করবি না? নেশা না করলে কোনও ক্রিয়েটিভ কাজ হয় না। পৃথিবীতে কোথাও হয় না।’

তারপর একটু থেকে যোগ করল, ‘আর সব কিছু কন্ট্রোল করতে হবে এমন কথা কে বলেছে? দেয়ার আর টাইমস হোয়েন ইউ নিড টু লেট গো, নিড টু ফ্লোট ইন দ্য এয়ার। অভ্যেসের ব্যাপার। কোনও জিনিসই প্রথমে ভালো লাগে না। কয়েকদিন পর থেকে ভালো লাগতে শুরু করে।’

তিতির আর কথা বাড়াল না। সে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রোদের হলকা মেশানো হাওয়া ঢুকছে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে, তাতে এখন আবার তিতিরের চোখ জ্বালা করছে। অর্কের সিগারেটের ঝাঁঝালো কিন্তু মিষ্টি গন্ধটা তিতিরের নাকে আসছে। আগেরদিন এই গন্ধটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তিতির, সেদিন তার গন্ধটা খুব কিছু ভালো লাগেনি। আজ গন্ধটা ভালো লাগছে, মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা আবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকে।

সেই রাতের অদ্ভুত নেশার ঘোরের স্মৃতি উঁকি দিয়ে গেল তিতিরের মনে। অদ্ভুত ওই বিমমধরা নেশা, তার আমেজ যেন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল তিতিরের শরীরের শিরায়-শিরায়। অর্কের সিগারেটায় তার টান দিতে

ইচ্ছে করছে এখন, সে কথা বুঝতে পেরে তিতিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চুপ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে।

বিকেলের দিকে ঝুঞ্জুস এক ধরনের ঘোরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল তিতির। এক অদ্ভুত ভালো লাগার ঘোর। অর্ক ঠিকই বলেছিল যে কোনও নেশাই একটু অভ্যেস হয়ে গেলে আর গ্লানির উদ্রেক করে না, বরং তা ভালো লাগতে শুরু করে। তিতিরেরও ভালো লাগছিল, তার মনটা খুশি হয়ে উঠেছিল। তা মনে হচ্ছিল, সে যেন এই মাটির পৃথিবীর থেকে একটু ওপরে অবস্থান করছে, ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ার মধ্যে। এই ভাবনাটা তার মাথাটাকে খালি করে দিচ্ছিল, ঝিমঝিমে অনুরণন টের পাচ্ছিল শরীরের প্রতিটা কোষে।

অর্কের ওই ‘গ্রো আপ’ কথাটার মধ্যে আসলে শ্লেষ ছিল। ওই কথায় তিতিরের মনে হয়েছিল সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেও আসলে সে তার পারিপার্শ্বিক মানুষজনের সমকক্ষ নয়। অর্করা কোনওকিছুর পরোয়া করে না, তারা দিব্যি চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে একটা জয়েন্ট বানিয়ে তা ধরিয়ে ফেলতে পারে। এদের ন্যায়-অন্যায় বোধ অন্যরকম, এরা সত্যিই মধ্যবিভ জীবনযাপনের ঘেরাটোপে নিজের বন্দি করে রাখেনি। এরা অনায়াসে আগুন নিয়ে খেলতে আগ্রহী।

তিতিরও তো আসলে তাই চেয়েছিল। সে তো চায়নি মা’র মতো সরকারি চাকরির মোহে আটকে থাকতে। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে বলে মা, আরও বেশি পড়াশোনা করার কথাও মা বলতে থাকে বারবার। তিতির তো সে কথা শোনেনি। সে তো বেরিয়ে পড়েছে জীবনটাকে দেখবে বলে। তার কিসের ভয়? অর্করা যা পারে, তার তারও না-পারার কোনও কারণ নেই তো। তার আটকাচ্ছে কোথায়? সনাতন মূল্যবোধ? সেটাই বা কী? ছোটবেলা থেকে তিতির দেখে এসেছে মা তার বাবাকে অবহেলা করেছে, সম্পর্ক স্থাপন করেছে বয়সে অনেক বড় একজন বিখ্যাত রাজনীতিকের সঙ্গে—এই কি মানুষের মূল্যবোধ? এই মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে তো অর্করা অনেক ভালো আছে!

খাবার অর্ডার দেওয়ার আগে অর্ক বিয়ার খেতে চেয়েছিল, জিগ্যেস করেছিল তিতিরও খেতে আগ্রহী কি না। তিতির না করেনি। বিয়ার খেতে তিতিরের ভালো লাগে না, বরাবর তার মনে হয় এত তেতো একটা

তরল পদার্থ কী করে মানুষ খেতে পারে! আজ সে খাওয়ার সময়ে একটুও মুখবিকৃতি করেনি। অভ্যেস করে নিলে সবই ভালো লাগে নিশ্চয়, নইলে আর এত মানুষ মদ খেয়ে নেশা করে কেন?

দুজনে মিলে পাঁচ বোতল বিয়ার খেয়েছিল রেস্তোরাঁয় বসে, তিতিরের মনের মধ্যে তখন থেকে ওই তিরতিরে অনুভূতিটা তৈরি হতে শুরু করেছিল। আগের দিন সে অর্কদের কার্যকলাপ দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল, আজ অর্ককে একটু একটু ভালোও লাগছিল তার। সেদিন রাতে ভালো করে খেয়াল করেনি অর্ককে, আজ তার মনে হচ্ছিল অর্কর ঢুলঢুলু চোখের মধ্যে স্বপ্ন দেখার নেশা আছে। অর্ককে দেখতে ভালো, তার বাবার চেহারার সঙ্গে অর্কর কোথায় যেন মিল আছে। অর্কও বাবার মতো নেশা করে, বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের অলিতে-গলিতে তার অবাধ যাতায়াত। বাবাও তো এমনই ছিল, এই নেশা করা নিয়েই বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত।

রেস্তোরাঁতে চাইনিজ খাবারের প্রতি তিতিরের মনোযোগ ছিল না। খুব বেশি খায়নি কিছু, বিয়ার খেয়েই তার পেট ভরে গেছিল অনেকখানি। ওখান থেকে বেরিয়ে অর্ক তাকে বলেছিল তার সঙ্গে অর্কর চিলেকোঠার ঘরে যেতে। তিতির আপত্তি করেনি। আগেরদিন সে অর্কর বাড়িতে এসেছিল অচৈতন্য অবস্থায়, আজ সে ঠিক করে অর্ককে চিনতে চেয়েছিল।

সেলিমপুরের একটা গলির মধ্যে কিছুটা ঢুকে অর্কর থাকার আস্তানা। একটা তিনতলা বিরাট বাড়ি, চারতলার চিলেকোঠার ফ্ল্যাটটা অর্কর বাসস্থান। চারতলায় উঠতে দম বেরিয়ে যায়, কিন্তু একবার উঠে এলে জায়গাটা ভালোই লাগে। এই জায়গাটা এখনও ফাঁকা-ফাঁকা, সে কারণে ছাদ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কলকাতা দেখা যায়।

ছাদ সংলগ্ন চিলেকোঠার ঘরটা বেশ বড় সাইজের, সেখানে দেওয়ালের একপাশে খাট—এই বিছানাতেই আগের দিন ঘুম ভেঙেছিল তিতিরের। ঘরের অন্যপাশে বিরাট টেবিল, তাতে প্রমাণ সাইজের কম্পিউটার, ওই কম্পিউটারে বসে অর্ক তার গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের কাজ করে। ঘরের মধ্যে দিয়ে একটা বাথরুম, অন্যদিকে একটা কিচেন। একা একজন ব্যাচেলার থাকার পক্ষে এই ধরনের ফ্ল্যাট আদর্শ। ফ্ল্যাটটা খুব অগোছালো, জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, কানা ভাঙা কাপের মধ্যে ভরতি সিগারেটের টুকরো। ইচ্ছে করলেই এই জায়গাটা গুছিয়ে

রাখা যায়, তিতির এখানে থাকলে জায়গাটা নিশ্চয় গুছিয়ে রাখত ভালো করে।

ফ্ল্যাটটা দেখে তিতিরের একটু লোভ হল। এইরকম একটা ফ্ল্যাটে একা থাকতে পারলে মন্দ হত না। পিজি-তে যতই যাই হোক সকলের সঙ্গে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হয়, এখানে অর্কর কাউকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার নেই। তিতির ঠিক করল ছ'মাস পরে তার মাইনে বেড়ে গেলে সেও পিজি অ্যাকোমোডেশন ছেড়ে দেবে, অর্কর মতো একেবারে একা-একা থাকবে।

এই মুহূর্তে অর্ক বসেছিল তিতিরের থেকে কিছুটা দূরে মেঝেতে, একটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। তিতির বসেছিল খাটের ওপর, সেখান থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে অর্ককে দেখছিল। অর্কর চোখ দুটো লাল, সে মাঝে-মাঝে আপনমনে গুণগুণ করে গান গাইছিল, আপনমনে মাথা নাড়াচ্ছিল। সে তিতিরের তুলনায় অনেক বেশি নেশাগ্রস্থ, সেই নেশার প্রতিটা পল সে উপভোগ করছে এখন।

একটু আগে পর্যন্ত সে তিতিরের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। তার নিজের কথা, তার মফস্সল শহরে বড় হয়ে ওঠার কথা, ডিজাইন ইনস্টিটিউটে চান্স পেয়ে ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করতে যাওয়ার কথা। সেখানকার পড়াশোনা শেষ করেনি অর্ক, তার আগেই সে চলে এসেছে কলকাতায়। এখানে এসে একা থাকতে শুরু করেছে, একটু-একটু করে পয়সা জমিয়ে নিজের কম্পিউটার কিনেছে, গ্রাফিক্সের কাজ করে নিজের খরচ চালায়। কলকাতা শহরে ভালো টু-ডি এবং থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের কাজ করার লোক নাকি নেই, সে কারণে অর্কর কাজের একটা কদর আছে এই শহরে। টেলিভিশনের অনেক প্রোগ্রামের টাইটেল মন্তাজ নাকি অর্কর কম্পিউটারে বানানো।

অর্কর কাজের কোনও নমুনা তিতির এখনও পর্যন্ত দেখেনি। অর্ক তাকে বাড়ি নিয়ে আসার পর থেকে শুধুই গল্প করেছে, আর সেইসঙ্গে একটার-পর-একটা জয়েন্ট বানিয়ে খেয়েছে। আগের দিনের তুলনায় তিতির এখন স্বচ্ছন্দ বেশি, সেও মাঝে-মাঝেই অর্কর নেশা-ভরা সিগারেট থেকে টান দিয়েছে। এই নেশার মজাটা সে এখন বেশ অনুভব করতে পারছে— তিতিরের শরীরটা হালকা লাগছে, তার এখন কোনও ব্যাপারে কোনও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না।

অর্কর সঙ্গে সময় কাটাতেও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তিতিরের। আগের দিন সে ভয় পেয়েছিল, আজ তার মধ্যে ভয়ের কোনও অনুভূতি নেই। অর্ক তার থেকে বয়সে বেশ কিছুটা বড়, কিন্তু তাকে আজ যথেষ্ট আপন বলে মনে হচ্ছে তিতিরের। একেকজন থাকে যারা খুব চট করে বন্ধু হতে পারে, অর্ক এমনিতে সেরকম। তার থেকে বয়সে আট-দশ বছরের বড় হবে অর্ক, তা সত্ত্বেও আগের দিনই তার সঙ্গে তুই করে কথা বলেছিল তিতির। আজ মনে হচ্ছে অর্কর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হয়ে ভালো হয়েছে, তার জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে—অর্কর কাছ থেকে সে বিন্দাস জীবনযাপনের রহস্যটা শিখে নিতে পারবে।

অর্ক বলছিল যারা ক্রিয়েটিভ হয় তাদের নাকি নেশা না করলে চলে না। একটু অন্যরকম ভাবে জীবনযাপন করা শিল্পী জীবনের অঙ্গ। এখন তিতিরের নেশা করতে ভালো লাগছে, এর অর্থও সেও ক্রিয়েটিভ। তার মধ্যে নিশ্চয় একটা শিল্পীসত্তা আছে, যা সে আগে কোনওদিন বুঝতে পারেনি!

সঙ্গে হয়ে আসছে, বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে হু-হু করে। জানলা দিয়ে সেই অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল তিতির। বলল, ‘আলোট জেলে দে এবারে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না আর—’

অর্ক উঠল, সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে ঘরের আলোটো জেলে দিয়ে তিতিরের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তিতিরের দিকে। ঘামে লেপ্টে থাকা কপালের চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে-দিতে বলল, ‘তুই একটা নোজ রিং পর। দারুণ সেক্সি দেখাবে তোকে।’

নাকে একটা রিং পরার ইচ্ছে তিতিরের দীর্ঘদিনের। মা’র ভয়ে সে এখনও নোজ পিয়াসিং কবায়নি, সামনের মাসে মাইনের টাকা পেয়ে সে পিয়াসিং করিয়ে ফেলবে! কোথা থেকে করাবে সে ব্যাপারে সে অর্কর সঙ্গেই কথা বলে নেবে—অর্কর দু-কানেই পিয়াসিং আছে, সেখানে পাথর বসানো স্টাড থেকে আলো ঠিকরাচ্ছে।

তিতির হাসল। মুখ তুলে তাকাল অর্কর দিকে। অর্ক এখন তার খুব কাছে, তার নিঃশ্বাসের আভা এসে লাগছে তিতিরের মুখে। অর্কর চোখদুটো উজ্জ্বল, চোখের জমিতেও আলো চিকচিক করছে।

অর্ক তার হাতটা তিতিরের কপাল থেকে সরিয়ে আনল তার ঠোঁটের

ওপর। তিতির শিউরে উঠল একটু। তারপর বলল, ডোন্ট ডু এনিথিং অর্ক। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু এনিথিং হোয়েন আই অ্যাম নট ইন মাই সেন্সেস।’

অর্ক হেসে বলল, ‘সেক্সও এক ধরনের নেশা, ইউ নিড নট বি ইন ইয়োর সেন্সেস। জাস্ট ডু ইট, ইউ উইল লাইক ইট, আই অ্যাম শিওর।’

তিতির আর কিছু বলল না, শুধু মুখ তুলে একবার তাকাল অর্কের দিকে। অর্ক তার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, তার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়েছে তিতিরের মুখের ওপর। তিতির মুখ তুলে অর্কের ঠোঁটে কুট করে একটা কামড় বসাল।

১৩

ইন্দ্রজিৎ গুহ মানুষটা অদ্ভুত। এই একবিংশ শতাব্দীতেও তিনি তার পুরোনো বনেদি মেজাজ ধরে রেখেছেন পুরোদস্তুর। সিনেমার পার্টিতে আসেন গিলে করা ফিনফিনে আদ্রির পাঞ্জাবি পরে, সেইসঙ্গে পরেন ধাক্কা পারের ধুতি। বলেন ধুতি-পাঞ্জাবি না পরলে বাঙালির বাঙালিয়ানা থাকে না, উত্তমকুমারের সব হিট ছবিতে সে কারণেই নাকি উত্তমবাবু কোনও-না-কোনও সিনে একবার ধুতি পরে অ্যাপিয়ার করতেন।

আজও তিনি অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। বনেদি ব্রিটিশ আমলের ক্লাবে শার্ট-প্যান্টের সঙ্গে জুতো না থাকলে ভিতরে ঢুকতে দেয় না, কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কেউ এলে তাকে আটকানোর নিয়ম নেই। অরিন্দমের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎবাবু দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন ক্লাবের বারের একটা ফাঁকামতো কোণায়, এর মধ্যে দু-পেগ স্কচ নামিয়ে দিয়েছেন।

এতক্ষণ মন দিয়ে অরিন্দমের কথা শুনছিলেন ভদ্রলোক, এখন তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন অরিন্দমের দিকে, অল্প-অল্প মাথা নাড়াচ্ছেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না সম্ভবত। অরিন্দম বলল, ‘ইন্দ্রদা, তুমি হেল্প না করলে হবে না। বুঝতেই পারছ পুরো ব্যাপারটা একা-একা করা যাবে না। ডিস্ট্রিবিউশনে সমস্যা তৈরি করতে গেলে তোমাকে লাগবেই।’

ইন্দ্রজিৎবাবু অবশেষে মুখ খুললেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘দাও একটা সিগারেট দাও।’

ইন্দ্রজিৎবাবু মদের ব্যাপারে শৌখিন হলেও সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে খুব সংযত। নিজে সিগারেটের প্যাকেট কেনেন না কখনও, মাঝেমধ্যে পটিতে অন্য লোকের সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধূমপান করেন। সাধারণত ইন্দ্রজিৎবাবুর সিগারেট ধরানোর অর্থ হল তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, কিংবা কোনও কারণে তাঁর মেজাজ খোলতাই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কী হয়েছে অরিন্দম বুঝতে পারছে না, সে তাড়াতাড়ি করে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎবাবুর দিকে।

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে তিনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন অরিন্দমের দিকে। তারপর বললেন, ‘তুমি যা করতে বলছ তা অনৈতিক, আমি তোমরা আসার আগে থেকে এই ট্রেডে আছি অরিনকুমার। এরকম কাজ কখনও করিনি। করাটা উচিত হবে না। আমাদের ব্যবসায়ে এখনও কতগুলো নিয়ম আমি নেমে চলি, তুমি তার থেকে সরে আসতে বলছ আমাকে।’

অরিন্দম মাথা নাড়ল। বলল, ‘তোমাকে কোনও অনৈতিক কাজ করতে বলছি না ইন্দ্রদা। আমি শুধু এই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা অন্যভাবে ব্যবসা করতে বলছি। দেখছ তো যুগ কতটা পালটে গেছে, এখন কি আর ওই সব পুরোনো ধ্যানধারণা নিয়ে বসে থাকলে চলে, বলো?’

‘তুমি বলছ ওদের সঙ্গে কনট্রাক্ট থাকা সত্ত্বেও আমি লাস্ট মোমেন্টে ওদের সিনেমা নেব না? তার বদলে তোমার সিনেমাটা চুকিয়ে নেব? এরকম আবার হয় নাকি?’

‘কেন হয় না ইন্দ্রদা? যদি ওরা তোমাকে লাস্ট মোমেন্টে প্রিন্ট না দিতে পারত, তুমি কী করত? তোমাকে অন্য কোনও সিনেমা চালাতে হত না কি? তাহলে এখনই বা পারবে না কেন? তোমার হল, তোমার যা ইচ্ছে ছবি চালাবে, কার কী বলার আছে এতে? হল তো বন্ধও হয়ে যেতে পারত লেবার প্রবলেমে। তখন ওরা কী করত? কনট্রাক্ট দিয়ে ধুয়ে জল খেত?’

তীক্ষ্ণ চোখে ইন্দ্রদা তাকালেন অরিন্দমের দিকে। বছর চারেক আগে একবার বাংলা সিনেমার হলগুলোতে তুমুল শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল।

সেই সময়ে সারা রাজ্যে মাসখানেক প্রায় সবক'টা হলই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল হিন্দি সিনেমার হলগুলো আর ইন্দ্রবাবু সিনেমার চেন। তাঁর সিনেমার চেন যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য ইন্দ্রদার অনুরোধে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিল অরিন্দম। ইন্দ্রদার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে হলের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেছিল। অরিন্দমের মতো একজন স্টারের উপস্থিতিতে কাজ হয়েছিল, শ্রমিকরা হল বন্ধ না করার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। সেই সময়ে অরিন্দম সাহায্য করেছিল ইন্দ্রজিৎ গুহকে, এখন সে প্রতিদান চাইছে বলেই কি এই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাঁর কাছে?

ইন্দ্রজিৎবাবু সিগারেটে আবার একটা টান দিলেন। তাঁর সিনেমা হল এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবসা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত, তিনি ছাড়া এই ব্যবসায়ে বাঙালি আর কেউই বিশেষ অবশিষ্ট নেই। কলকাতা শহরে ইন্দ্রজিৎ গুহর মালিকানায় তিনটে বাংলা সিনেমা হল চলে। একটা উত্তর কলকাতার সিনেমা পাড়ায়, একটা শিয়ালদা অঞ্চলে এবং অপরটি ভবানীপুরে। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আরও প্রায় ষাটটা সিনেমা হলের বুকিং হয় ইন্দ্রজিৎ গুহর মাধ্যমেই। ওই হলগুলোতে কী সিনেমা চলবে তার সিদ্ধান্ত বকলমে ইন্দ্রজিৎবাবুই নিয়ে থাকেন।

কলকাতা শহরে বাংলা সিনেমার বেশিরভাগ চেন আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে, ইন্দ্রজিৎবাবু তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহে এখনও নিজের হলের সিনেমা দেখানোর কোয়ালিটি মেনটেন করেন। তাঁর সবক'টা হলই এখন নতুন প্রোজেক্টর বসেছে, উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেম বসানোর কথাও তিনি বিবেচনা করছেন। ইন্দ্রজিৎবাবু এই ব্যবসায়ে দীর্ঘদিনের লোক, তিনি মনেপ্রাণে চান টালিগঞ্জের ব্যবসা রমরম করে চলুক। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে হিন্দি ছবির পাশাপাশি বাংলা সিনেমার যেমন রমরমা ছিল, ইন্দ্রজিৎবাবু সেই যুগ ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেন। সে কারণে অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের হলে কখনও বাংলা ছাড়া অন্য ছবি রিলিজ করতে দেন না। বলেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার বাঙালিয়ানা ছাড়ব না। তাতে যা হওয়ার হোক!'

ইন্দ্রজিৎবাবুর ধারণা তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁদের এই তিনটে সিনেমা হল নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ থাকবে না। কালের নিয়মে এই হলগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। উত্তর কলকাতায় নিজের সিনেমা হল সংলগ্ন

পৈতৃক বাড়িতে জনসংখ্যা কমতে-কমতে এখন প্রায় নগণ্য। অকৃতদার ইন্দ্রজিৎবাবুর একমাত্র ওয়ারিশ তার ভাগ্নি—সে ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি করে ব্যাঙ্গালোরে। ইন্দ্রজিৎবাবুর ধারণা, তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা শহরের প্রাইম লোকেশনে তাঁদের হলগুলোকে ভেঙে ফেলে সেখানে প্রোমোটরি হয়ে যাবে। ভাগ্নি জামাই মাঝে-মাঝে এখনও এসে ইন্দ্রজিৎবাবুকে সেই প্রস্তাব দিয়ে যায়।

মৃত্যুর পরে কী হবে সেটা পরের কথা, এখনই অরিন্দম যা চাইছে তা মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎবাবুর। অরিন্দম চাইছে একেবারে শেষ মুহূর্তে সঞ্জীব-পিয়ালির নতুন সিনেমা তার হলগুলোতে না চালাতে, তার বদলে চালানো হোক অরিন্দমের নতুন ছবি! শেষ মুহূর্তে সঞ্জীবদের ছবি হড়কে দেওয়ার অর্থ, রিলিজের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতা শহরে ভালো চেন না পেয়ে একেবারে মুখ খুবড়ে পড়বে সঞ্জীবদের ছবি। ভালো করে রিলিজ না হলে যে-কোনও ছবিই ফ্লপ করে। সঞ্জীবদের নব্য-অর্জিত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেটা যে হবে, তা একদম অবধারিত।

এই বিষয়টাই মন থেকে মানতে পারছেন না ইন্দ্রজিৎবাবু। তিনি বাংলা সিনেমার ব্যবসা সুস্থভাবে করার পক্ষপাতী, মনে করেন সবাইকে তার যথাযথ জায়গা দেওয়া উচিত। অন্যরা ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করে না, কিন্তু তিনি এখনও তাঁর পুরোনো আমলের প্রিন্সিপল ছাড়তে পারেননি। তা ছাড়া টালিগঞ্জে এখন নতুন মুখ আসার খুব দরকার, আগের ছবিটা দেখে তাঁর মনে হয়েছে সঞ্জীব-পিয়ালি হয়তো বাংলা সিনেমার এই নতুন মুখের অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারবে।

ইন্দ্রবাবু বললেন, ‘অরিন্দম, তুমি তো জানোই আমি কী ধরনের মানুষ। তুমি আমাকেই এই রিকোয়েস্ট করছ কেন বলবে?’

অরিন্দম হাসল, তারপর নিজের সিগারেটে একটা টান দিল। সিগারেটে এই টান দিয়ে কিছুটা সময় কাটানো আসলে ইচ্ছাকৃত, এতে পরিস্থিতির মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। ওই নাটকীয়তা তৈরি হতে দিল অরিন্দম; তারপর বলল, ‘তুমি অন্যরকম বলেই তোমাকে বলছি। অন্যদের ক্ষেত্রে এত ঝামেলা করার তো দরকার হত না। একটা ফোন করে বলে দিলেই যথেষ্ট হত।’

একটু দম নিয়ে অরিন্দম যোগ করল, ‘ব্যাপারটা কী জানো, তুমি যদি লাস্ট মোমেন্টে ওই ছবিটা না নাও, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যরকম

একটা ইমপ্যাক্ট হবে। তুমি ছবি না নিলে তার মধ্যে পলিটিক্স আছে এই কথাটা কেউ ভাববে না। সবাই ধরে নেবে ছবিটায় সত্যিকারের দম নেই। এবং ওদের আগের ছবিটা ফ্লুকে চলেছিল।’

প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন ইন্দ্রজিৎবাবু। সিগারেটটা মুঠো করে ধরে তার থেকে লম্বা একটা টান দিয়ে সেটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর বললেন, ‘হয় না অরিন, এই কাজ করা যায় না। তুমি আমায় বললে আমি শুনলাম, কিন্তু এই কাজ আমি করতে পারব না...’

ইন্দ্রদা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ইন্দ্রদার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এই বয়সে উত্তেজিত না হওয়াই ভালো। ইন্দ্রদাকে উত্তেজিত হতে দেখে অরিন্দম হাসল সামান্য, তারপর নিজের সোফায় এলিয়ে বসল। বলল, ‘তুমি অকারণে রাগ করছ ইন্দ্রদা। আমরা সবাই জানি তোমাকে দিয়ে জোর করে কিছু করানো যায় না।’

অরিন্দমের কথায় নিশ্চিত হলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তারপর অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘চলো আরেক পেগ করে হয়ে যাক, নাকি?’

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎবাবুর কথায় আপত্তি করল না, ওয়েটারকে ডেকে তাঁর জন্য আরও একটা পেগের অর্ডার দিয়ে দিল। নিজের অর্ডার এখনই দিল না সে। সে তার স্বাস্থ্যের কারণে আস্তে আস্তে মদ্যপান করার অভ্যাস করেছে, এখানে এসেও সেই অভ্যাস সে বজায় রাখে।

ইন্দ্রজিৎবাবু তার গ্লাসে চুমুক দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্লাবে এসে উপস্থিত হল প্রেমাংশু। অরিন্দমদের দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাত নাড়ল, তারপর এসে বসল তাদের টেবিলে। প্রেমাংশুর আগেই আসার কথা ছিল, তার পৌঁছোতে দেরি হওয়ার কারণ সে একটা হিন্দি ছবি রিলিজ করার ব্যাপারে মুম্বাইয়ের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সে ছিল। মুম্বাইয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ ছবি, এই সপ্তাহে সারা ভারতে রিলিজ করছে, পূর্ব ভারতে ওই ছবির পরিবেশক প্রেমাংশু।

প্রেমাংশুকে ইন্দ্রজিৎবাবু একদম পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেমাংশুদের মতো নব্য যুবকদের অনুপ্রবেশই এই ইন্ডাস্ট্রির বারোটা বাজার মূল কারণ। প্রেমাংশুদের পারিবারিক ব্যবসা আবিরের, বড়বাজারে তাদের হেলির রং ও আবির সাপ্লাইয়ের বিরাট ব্যবসা। ভারতের সর্বত্র তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রেমাংশু তাদের পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ না দিয়ে চলছে এসেছে সিনেমার লাইনে।

ইন্দ্রজিৎবাবু এই হঠাৎ করে চলে আসা ব্যবসায়ীদের পছন্দ করেন না একেবারে তাঁর বক্তব্য : সিনেমা শুধু ব্যবসা নয়—এখানে ব্যবসায়ী বুদ্ধির পাশাপাশি প্যাশন না থাকলে এই ব্যবসায়ে কারও আসা উচিত নয়। প্রেমাংশুদের কাজে এখনও পর্যন্ত প্যাশনের কোনও ছিটেফোঁটা নজির দেখতে পাননি ইন্দ্রজিৎবাবু, এরা ব্যবসার স্বার্থে যে-কোনওরকম কাজই করতে রাজি থাকে। আগেকার দিনে যাঁরা সিনেমার ব্যবসায় আসত, তারা শুধু টাকার লোভে আসত না। ব্যবসার পাশাপাশি সিনেমার প্রতি ভালোবাসাও তাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল!

প্রেমাংশু চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে মদের অর্ডার দিয়ে ইন্দ্রজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘কী দাদা, সব সেটেল করে নিয়েছেন তো? আপনি সেটেল না করলে আমরা সবাই মুশকিলে পড়ে যাব?’

বিরসবদনে ইন্দ্রজিৎবাবু তাকালেন প্রেমাংশুর দিকে। বললেন, ‘সেটেল আর কী করব? আমি এ রকম করি না, তোমরা জানো তো সবই!’

প্রেমাংশু হাসল ইন্দ্রজিৎবাবু দিকে তাকিয়ে। ওয়েটার এসে তার মদ টেবিলে দিয়ে গেছে, সেই গ্লাস থেকে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, ‘আপনাকে আসল কথাটা বলেনি তাহলে অরিন্দমদা?’

ইন্দ্রজিৎবাবুর এবারে অবাক হওয়ার কথা। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন দু-জনার দিকে। তারপর জিগ্যেস করলেন, ‘আসল কথা? আসল কথা আবার কী আছে এর মধ্যে?’

‘আসল কথা একটা আছে। সেই কথাটা শুনলে আপনি এ ব্যাপারে না করতে পারবেন না।’

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন, ‘কী সেই আসল কথা, সেটা তো বলবে!’

প্রেমাংশু হেসে তাকাল অরিন্দমের দিকে। জিগ্যেস করল, ‘কী অরিন্দা, তুমি বলবে? না আমি বলব ব্যাপারটা?’

‘তুমিই বলবে। এটা তোমার এরিয়া, তুমি বলবে বলেই তোমাকে আমি আসতে বলেছি।’

নিজের গ্লাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে প্রেমাংশু তার কথা শুরু করল। বলল অরিন্দমের প্রোডাকশনের ব্যবসার কথা। সেই প্রোডাকশন টেলিভিশনের পাশাপাশি সিনেমা করবে প্রেমাংশুর সঙ্গে কোলাবোরেশনে। সিনেমার পরিবেশক থাকবে প্রেমাংশু নিজে। বছরে পাঁচটা করে ছবি করার

পরিকল্পনা আপাতত, প্রথম বছরের রেজাল্ট দেখে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।

প্রেমাংশ বলল, ‘এই কাজে আপনাকে চাই। বছরে পাঁচটা সিনেমা মানে আপনার অন্তত কুড়ি উইক গ্যারান্টি। আপনাকে হলের প্রোগ্রাম করা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আর, বুঝলেন কি ব্যাপারটা?’

ইন্দ্রজিৎবাবু চুপ করে রইলেন। প্রেমাংশু যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সত্যি সত্যি লাভ হবে তাঁর নিজের। এতদিন ধরে ব্যবসা করছেন তিনি, এখন বাংলা সিনেমার কোয়ালিটির যা অবস্থা তাতে সত্যি-সত্যি বছরে বাহান্ন সপ্তাহ প্রোগ্রাম করতে তাঁর অসুবিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সংখ্যার দিক থেকে টালিগঞ্জ সিনেমা বেড়েছে, কিন্তু চলার মতো সিনেমা দিনকে দিন কমে আসছে। বছরে বহু সময়েই ফাঁকা হলে সিনেমা চালাতে বাধ্য হচ্ছেন ইন্দ্রজিৎবাবু, অন্য কোনও সিনেমা নেই বলে। বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি ছবি চালালে হয়তো তাঁর এই অসুবিধে হত না, কিন্তু তিনি হিন্দি সিনেমার ঘোর বিরোধী, নিজের হলে হিন্দি ছবি ঢোকাতে চান না।

ইন্দ্রজিৎবাবুর মতো সমস্যা বাংলার সব হল মালিকদেরই। ভালো প্রোগ্রাম না থাকলে আস্তে-আস্তে হলে দর্শকসংখ্যা কমে যায়, তাতে হলের ক্ষতি হয়। হলের রক্ষণাবেক্ষণে এর প্রভাব পড়ে, হলের খারাপ অবস্থা তৈরি হলে সেই হলে দর্শকরা যেতে চান না। এই কারণে গত দু-বছরে পশ্চিমবাংলায় প্রায় সত্তরটা হল বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের হলগুলোতে আলুর গুদাম হয়েছে, কলকাতায় হলগুলোতে প্রোমোটোরি হবে এমন কথাবার্তা চলছে।

এই অবস্থার মধ্যেও মাত্র বছরখানেক আগে প্রায় সত্তর লাখ টাকা খরচ করেছেন ইন্দ্রজিৎবাবু, তার জন্য কিছুটা সরকারি অনুদান তাঁর প্রাপ্য। সেই টাকা এখনও এসে পৌঁছয়নি তাঁর কাছে, ফলে ছবি ভালো না চললে কর্মচারীদের মাইনে দিয়ে ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট দিতে টাকায় টান পড়ে যাচ্ছে। হলে ছবি চলার সময়ে প্রতি সপ্তাহে পরিবেশকদের কাছ থেকে ভাড়া পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু বিক্রির ওপরে বাড়তি টাকা নির্ভর করে। জোর করে ফাঁকা হলে ছবি চালালে সেই টাকার অঙ্ক বাদ পড়ে যায়। বছরে পাঁচটা ছবি প্রেমাংশুদের কাছ থেকে আসবে এমন কথা শুনে সে কারণে উৎসাহিত হলেন তিনি, এতে সত্যি-সত্যি তাঁর প্রোগ্রাম করার সমস্যা

অনেকাংশে কমে যাবে। তিনি প্রেমাংশুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাঃ, এ তো দারুণ খবর! এইটাই তো আসল কথা। তা এই কথাটা না বলে অন্য কথা বলছিলে কেন অরিন?’

অরিন্দম হাসল। বলল, ‘কারণ দুটোর মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। সেই কথাটা প্রেমাংশু বুঝিয়ে দেবে এবারে।’

ইন্দ্রজিৎবাবু অবাক হয়ে তাকালেন প্রেমাংশুর দিকে। তাদের নতুন ব্যবসার সঙ্গে সঞ্জীব-পিয়ালিদের ছবিটা রিলিজ না করার কী সম্পর্ক, তা তিনি এখনও বুঝতে পারেননি!

প্রেমাংশু বলল, ‘দাদা প্রভঞ্জনদার ছবিটা আমাদের প্রথম প্রোডাকশন। ওই ছবিটার সব রাইটস আমি কিনে নিচ্ছি। ওইটা নিয়েই প্রথম নামব। সে কারণে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি সঞ্জীবের ছবিটা নেবেন না, আমাদেরটা রিলিজ করুন।’

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। বললেন, ‘কিন্তু, তোমরাও তো তোমাদের ছবি কয়েক উইক পিছিয়ে দিতে পারো, ওদেরটা আটকাচ্ছে কেন?’

‘না দাদা। আমরা ওই ডেটেই আসব। ব্যবসা করতে গেলে অন্যদের হেল্প করা যায় না। ওরা ছোট প্রেডিউসার, ওদের প্রথম ধাক্কাতেই ঝাড় খাওয়াতে হবে। এবারে আপনি বলুন দাদা, বল এখন আপনার কোর্টে।’

‘আমার কোর্টে কেন? তোমাদের সঙ্গে তো আমার ঝগড়া নেই। এর পরের ছবিটার সময়ে একটু আগে বলবে, ‘আমি তোমাদের ছবি চালাব। ছবি পেলে তো আমারই সুবিধে, কী বলো?’

প্রেমাংশু মাথা নাড়ল। বলল, ‘না দাদা। ওটা হবে না। আমার ছবি নিতে গেলে প্রথম ছবি থেকেই নিতে হবে। নইলে পরের ছবিও আপনি পাবেন না, সব অন্য হলে যাবে।’

ইন্দ্রজিৎবাবু চুপ করে রইলেন। প্রেমাংশুরা আজকের যুগের পরিবেশক, হিন্দি সিনেমা রিলিজ করার সময়ে সে মাফিয়াদের মতো ব্যবহার করে। যে যে হল তার কথা মতো চলতে রাজি হয় না, তাদের ছবি দেওয়া বন্ধ করে দেয় প্রেমাংশু। বাংলা ছবির ব্যবসা প্রেমাংশু করেছে কালেভদ্রে, এবারে যদি সে নিয়মিত এই ব্যবসায় ঢুকে পড়ে, তাহলে এখানেও তার নিয়মের পরিবর্তন হবে না বিশেষ।

ইন্দ্রজিৎবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নিজের সনাতন নিয়মে তিনি

বাংলা সিনেমার ব্যবসা করে এসেছেন এতদিন ধরে, এখন এই নব্য-ব্যবসায়ীদের আগমনে তাঁকে নিয়মের নড়চড় করতে হবে। নইলে যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তাঁর পক্ষে সিনেমা হল চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন, ‘ঠিক আছে, তোমার প্রোপোজালটা নিয়ে আমি ভাবব। কয়েকটা দিন সময় দেবে তো আমাকে, নাকি এখানে বসেই আমার ডিসিশন জানিয়ে দিতে হবে?’

প্রেমাংশু হেসে বলল, ‘কোনও তাড়া নেই দাদা। এখনও তিন সপ্তাহ দেরি আছে। আমরা পোস্টার রেডি করি, আপনি নেস্টট উইকে জানালেই আরামসে হয়ে যাবে।’

বিষয়মুখে মাথা নাড়লেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তারপর চুমুক দিলেন নিজের গ্লাসে।

১৪

দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর দুবার তিতিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে দেবারতির। যেদিন সকালের ফ্লাইটে দেবারতি ফিরেছে সেদিন সকালে বাড়ি এসে দেখা করে গেছে তিতির। দ্বিতীয়বার তিতিরের সঙ্গে দেখা করতে দেবারতিকে আসতে হয়েছিল তাদের পিজি অ্যাকোমোডেশনে।

মা’র সঙ্গে দেখা করতে এসে তিতির বলেছিল, সে বাড়িতে ফিরবে না। গত পনেরোদিন ধরে সে তার পিজি অ্যাকোমোডেশনের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাড়িতে থেকে রোজ-রোজ ঝগড়া করার থেকে বাড়ির বাইরে সুস্থ জীবনযাপনে সে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। দেবারতি অবাক হয়ে দেখেছিল তিতিরের কথা বলার মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের কনফিডেন্স এসেছে, সে তার সঙ্গে কথা বলছে ঝগড়া করার ভঙ্গিতে নয়, বরং অনেক শান্তভাবে। সে যে বাড়ির বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তা তার কথা বলার ভঙ্গি থেকে একেবারে পরিষ্কার।

দেবারতি আপত্তি জানানোর চেষ্টা করেছিল, তাতে তিতির হেসে বলেছিল, ‘তোমাকে ছাড়া আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না মা। আমাকে ছাড়া তোমারও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া, একটা কথা ভেবে দ্যাখো, তুমিও এই বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হস্টেলে ছিলে। আমিই

বা পারব না কেন?’

দেবারতির জীবনকাহিনি তিতির অনেকটাই জানে। ছোটবেলা থেকে তাকে একা হাতে মানুষ করতে-করতে অনেক সময়েই নিজের জীবনের কথা আপনমনে বলে গেছে তিতিরকে। দেবারতি তিতিরের বয়সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে গেছিল শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় চাম্প পেয়েও তার কলকাতার বাইরে পড়তে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল একা থাকবে বলে। দেবারতি মন দিয়ে উচ্চশিক্ষা করতে চেয়েছিল, বাড়িতে থেকে সেটা অসম্ভব ছিল। বাড়িতে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রবল চাপাচাপি করা হচ্ছিল সেই সময়ে। দেবারতি তখনই বিয়ে করতে চায়নি, তাই তার শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়া অনেকটা বাড়ি থেকে পালানোর নামান্তরই ছিল।

তিতিরের প্রশ্নটার কোনও সদুত্তর দেবারতি দিতে পারেনি। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সেসব সময়েই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, সে নিজে যে কারও কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে একা হাতে সংসার চালিয়েছে এবং তিতিরকে বড় করে তুলেছে তার জন্য যথেষ্ট গর্ববোধ করে। এই বয়স মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার বয়স তা মনে মনে স্বীকার করে দেবারতি; সহসা তিতিরের কথার প্রতিবাদ সে সেই কারণেই করতে পারেনি।

কিন্তু এই বয়সটা আবার অনেক কিছু ভাঙা-গড়ার বয়সও বটে। এই বয়সে ছুট করে অনেক সিদ্ধান্ত নেয় মানুষ, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে যুক্তিবোধ যতটা কাজ করে তার থেকে অনেক বেশি কাজ করে আবেগ। তিতিরের এখন যা বয়স, সেই বয়সেই শান্তিনিকেতনে পড়তে অর্থকমলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল দেবারতি। বাড়ির অমতে অর্থকমলকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আবেগের বশে। এখন পরিণত বয়সে এসে দেবারতির মনে হয় ওই বয়সের সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। সে অনেক সুস্থভাবে জীবনটাকে কাটাতে পারত সেই সময়ে ওই ভুলটা না করলে।

তিতিরকে নিয়ে সে কারণেই ভয় করে দেবারতির। তিতির কোনও ভুল করবে না তো? বয়সোচিত উন্মাদনায় সে ভেসে যাবে না তো ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে? পরে সারাটা জীবন ধরে তাকে ওই ভুলের মাশুল বয়ে বেড়াতে হবে না তো দেবারতির মতো?

তিতিরের কথা শুনে দেবারতি সে কারণে বলেছিল, ‘তুমি আলাদা থাকতে চাও, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি তোমার মাসের

খরচ দেব, চিন্তা কোরো না তুমি। আজকের যুগে শুধু গ্র্যাজুয়েশন করে কিছু হয় না, তুমি ফারদার পড়াশুনা করার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করো, রুমি যেমন করছে।’

‘আমি আর পড়াশুনা করব না মা। পড়াশুনা করতে আমার ভালো লাগে না। তোমার মতো ধৈর্য নেই আমার, একটার-পর-একটা পরীক্ষায় পাশ করার এনার্জি নেই। আমি মাস্টার্স করতে চাই না, তোমার মতো ডক্টরেট করে তারপর পোস্ট-ডক্টরেট কাজ করে তারপর চাকরি করার কথা আমি ভাবতে পারি না। আমি আমার পছন্দমতো কাজ পেয়ে গেছি, আমি আর পড়াশুনা করব না। সবাই পড়াশুনায় ভালো হয় না, আমি তোমার মতো নই।’

পড়াশুনায় অর্ধ্যকমলও ভালো ছিল না। সেও বেশি পড়াশুনা করতে চায়নি কখনও। ধরাবাঁধা চাকরি করতে চায়নি, সে চেয়েছিল স্বাধীন ব্যবসা করে নিজের মতো জীবনযাপন করতে। তিতিরের কথা শুনে তার বাবার কথা মনে পড়ে গেল দেবারতির, অর্ধ্যকমল ঠিক এই ভাবে একইরকম কথা শুনিয়েছিল দেবারতিকে। দেবারতি তখন না করতে পারেনি। না কার মতো কিছু ছিলও না তখন, দেবারতি মনে করত অর্ধ্যকমল খুব ট্যাালেটেড একজন মানুষ, সে ইচ্ছে করলে সত্যি সত্যি চাকরি না করে অন্যরকমভাবে জীবনযাপন করতেই পারে। দেবারতি তখন বিশ্বাস করত মানুষ চাইলে সব করতে পারে।

যৌবনের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল দেবারতির। অর্ধ্যকমল উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের ছেলে, তার পক্ষে ব্যবসার টাকা জোগাড় করার কোনও সমস্যা ছিল না। টাকা জোগাড় করে ব্যবসায় নেমেও পড়েছিল অর্ধ্যকমল, কিন্তু কোনওদিন সে নিজের ব্যবসা দাঁড় করাতে পারেনি। এর কারণ, ব্যবসা করতে গেলে যে ধৈর্য লাগে তা ছিল না অর্ধ্যের। তার থেকেও বড় কথা অর্ধ্যকমল নিজের ব্যবসার থেকেও বেশি জড়িয়ে পড়েছিল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায়। মদের নেশাকেই সে ক্রমে তার জীবনের পাথেয় করে তুলেছিল।

অর্ধ্যকমল যে এতটা বদলে যাবে তা কখনও ভাবেনি দেবারতি। কিংবা হয়তো অর্ধ্যকমল বরাবর এরকমই ছিল। কম বয়সে আবেগের বশে সেটা বুঝতে ভুল করেছিল সে। সে কারণে এই বয়সটাকে নিয়েই চিন্তা হয় তিতিরের জন্য।

দেবারতির থমথমে মুখটা দেখে তিতির বলেছিল, ‘আমায় নিয়ে তুমি এত ভাবছ কেন বলবে? আই নো হাউ টু টেক কেয়ার অফ মাই লাইফ। তুমি দেখে নিও।’

তিতিরের মুখে এই কথা শুনে দেবারতির মুখে কথা সরেনি। তার মনে পড়েছিল একইরকম কথা সেও বলেছিল তার বাবাকে, বাড়ির মতের বিরুদ্ধে অর্ধ্যকমলকে বিয়ে করার সময়ে। পরিস্থিতি পালটে যায়, মানুষের চরিত্রের বদল ঘটে না কোনও। এই বয়সে বাবা-মা’র মতের বিরোধিতা করাই যেন মানুষের ধর্ম।

তিতির বলেছিল, ‘তা ছাড়া, তুমি ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? আমার যখন ইচ্ছে হবে আমি তো বাড়িতে ফিরে আসতেই পারি, এতে তো কোথাও কোনও অসুবিধে নেই। তা ছাড়া, শঙ্করলালবাবুর এখন শরীর খারাপ, তুমি নিজেই তো বললে ওর বাড়িতে তুমি একমাস থাকবে। ওর দেখাশুনা করাটা এখন তোমার পক্ষে জরুরি, আমার কথা তোমায় না ভাবলেও চলবে।’

তিতিরের এই কথাটার পর আর তার বাইরে থাকার সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারেনি দেবারতি। শঙ্করলাল একা মানুষ, সে দেবারতির সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে নিজের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। শঙ্করলাল তার সরকারি ফ্ল্যাটে একা জীবনযাপন করে, তার বাড়িতে সঙ্গী বলতে তার ড্রাইভার আর সরকারি মাইনেতে নিযুক্ত একজন বেয়ারা। শরীরের এখন যা অবস্থা তাতে তার সঙ্গে কোনও একজন নিকটজনের থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্তে দেবারতি ছাড়া তার কেউ নেই।

তিতিরের পিজি অ্যাকোমোডেশনে থাকার ব্যাপারে সে কারণে খুব কঠিন হয়ে বাধা দিতে পারেনি দেবারতি। তবু বারবার করে সেখানকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। তারপর হঠাৎ করে এক রবিবার বিকেলের দিকে পিজি অ্যাকোমোডেশনে চলে গেছিল দেবারতি। একবার নিজের চোখে মেয়ের অবস্থান দেখে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।

অন্যান্য দিন তিতিরের কাজের কোনও ঠিকঠিকানা থাকে না, সেদিনই ভাগ্যক্রমে বাড়িতে ছিল সে। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে গল্প করছিল রুমির সঙ্গে। রুমি তার জীবনের অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছিল, তাই শুনে আশ্চর্য হয়েছিল তিতির।

রুমি তিতিরের সমবয়সি, তার সঙ্গে তিতিরের পরিচয় কলকাতায়

কলেজে পড়তে এসে। গুয়াহাটিতে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সে কলেজ করতে এসেছিল কলকাতায়। কলকাতায় স্নাতক স্তরের পড়াশুনার পাশে সে ভরতি হয়েছিল কলকাতার একটি নামকরা অ্যাভিয়েশন ইনস্টিটিউটে, সেখানে কী করে ভালো এয়ার-হোস্টেস হয়ে ওঠা যায় তার ট্রেনিং দেওয়া হয়। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ওই এয়ারহোস্টেস ট্রেনিংয়ের ক্লাস হত, তারপর সেখান থেকে কলেজের ক্লাস করতে ছুটত রুমি। খুব পরিশ্রম করতে হত, কিন্তু সেটা গায়ে লাগত না রুমির। এই পরিশ্রমটুকু করার পর সে এয়ার-হোস্টেস হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল ততদিনে।

রুমিকে ঠিক মেধাবী বলা যায় না, কিন্তু সে যে-কোনও ব্যাপারে অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে। এয়ারহোস্টেস ট্রেনিংয়ের পরীক্ষার রেজাল্ট তার ভালো হয়েছিল, সে ইন্টারভিউয়ের কল পেয়েছিল নামকরা একটি বিদেশি এয়ারলাইন্স থেকে। তার সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের কল পেয়েছিল নেহা বলে আরও একটি মেয়ে। ইন্টারভিউ ভালো হয়েছিল দুজনের, রুমি আশা করেছিল সে ওই বিদেশি এয়ারলাইন্সের চাকরিটা পেয়ে যাবে।

বাস্তবে চাকরিটা হয়নি রুমির, তার কারণ ইন্টারভিউয়ের কয়েকদিন পর তার কাছে একটি ফোন এসেছিল। এক ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে রুমিকে জানিয়েছিলেন তিনি রুমিকে ওই চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন, পরিবর্তে তাকে সামান্য একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে। ছ'মাসের ট্রেনিং পিরিয়ড থাকবে ওই এয়ারলাইন্সে, সেই সময়টা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকতে হবে, তাঁকে সব রকমভাবে সঙ্গ দিতে হবে। প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা মাইনের একটা চাকরির পরিবর্তে এইটুকু নাকি মানুষকে করতেই হয়।

ফোনের ওই প্রস্তাব শুনে রুমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছিল। তার মনে হয়েছিল, চাকরির ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার কোনও কারণ নেই, সে চাকরি পেলে নিজের মেধায় পাবে, তার জন্য অন্য একজনের সঙ্গে এই ভাবে ছ'মাস কাটানোর প্রস্তাব তার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। ভদ্রলোকের প্রস্তাবে না করে দিয়েছিল রুমি। নেহা কিন্তু না করেনি। সে গিয়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিল, তাঁর প্রস্তাবে রাজিও হয়ে গিয়েছিল। নেহার চাকরি পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। রুমি এর পরেও কয়েকটা

এয়ারলাইন্স থেকে ইন্টারভিউয়ের কল পেয়েছিল, কিন্তু ততদিনে তার এই পেশা সম্পর্কে মোহ ঘুচে গেছে, সে আর ইন্টারভিউ দিতে যায়নি কখনও।

তার জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনার কথা রুমি কোনওদিন কাউকে বলেনি। মা'কে বলার প্রশ্নই ছিল না, মা এই কথা শুনে গুয়াহাটিতে বসে অকারণে এ বিষয়ে টেনশন শুরু করে দিত। আজ কথায় সে কথাটা বলে ফেলেছে তিতিরকে। গল্পটা শুনে তিতির অবাক হল, তারপর বলল, 'বাট দিস ইজ স্ট্রেঞ্জ। মেয়ে হয়ে জন্মালে সবাই অ্যাডভান্টেজ চায়, এই ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে।'

রুমি বলল, 'বাট দিস ইজ লাইফ। তুই যে প্রোফেশনে আছিস, সেখানেও শুনেছি কাজ করতে গেলে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয়। তোকেও ফেস করতে হতে পারে।'

'না, হবে না। প্রথমত আমার মনে হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে এই ধারণাটা ঠিক নয়। দুই, আমাকে অ্যাপ্রোচ করার সাহসই হবে না কারও। ইটস আ ম্যাটার অফ হাউ ইউ হ্যান্ডল পিপল।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়েছিল রুমি। তারপর বলেছিল, 'আই কেয়ার ফর ইউ তিতির। যা করবি সাবধানে করবি। আমি বাড়ির বাইরে আছি অনেকদিন হল, আই ক্যান টেল ইউ, ইটস আ হার্ড লাইফ ফর উইমেন লিভিং অ্যালোন।'

দেবারতিও এসে একই কথা বলেছিল তিতিরকে। বলেছিল আজকের যুগে ছেলে এবং মেয়ে একরকম—এটা শুধুমাত্র কথার কথা। মেয়েদের এই জগতে এখনও ভোগের পণ্য হিসেবেই দেখা হয়, এর বেশি কিছু নয়। কথাটা বিশ্বাস হয়নি তিতিরের। অরিন্দম মুখার্জি প্রোডাকশনসে এখনও অবধি কারও কাছ থেকে সে খারাপ কোনও ইঙ্গিত পায়নি। তিতিরের মনে হল রুমি এবং তার মা জগৎ সম্পর্কে যা বলছে তা সম্ভবত ঠিক নয়।

তবে তিতিরের সঙ্গে দেখা করতে এসে পিজি অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থাপনা দেখে দেবারতি খুশি হয়েছিল। তার ধারণা ছিল খুব খারাপ কোনও জায়গায় খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তিতির, বাস্তবে ব্যাপারটা অন্যরকম। এই ফ্ল্যাটটার মধ্যে একটা ছিমছাম রুচির ছাপ আছে, ঘর অন্য একজনের সঙ্গে শেয়ার করতে হলেও প্রত্যেকের আলাদা পরিপাটি

বিছানা। ওয়ার্ডরোব রয়েছে জিনিসপত্র রাখার জন্য, বাথরুমটাও ভালো। সকলের ব্যবহারের জন্য কমন ব্যবস্থাও রয়েছে—রান্নাঘর এবং বসার ঘরটাও সুন্দর। মোটের ওপর দেবারতির ভালো লাগল, মনে হল তিতির ভেবেচিন্তে ঠিক-ঠিক জায়গাই নিজের জন্য বেছে নিয়েছে।

তিতির ব্যবহারেও অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল দেবারতি। তিতির ইদানীং তার সঙ্গে সব সময়ে চোঁচিয়ে কথা বলত, এখন তার কথা বলার ভঙ্গি ভদ্র ও সংযত। নিজের ঘরটাও খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে সে, পরিপাটি করে তার জামাকাপড় সাজানো রয়েছে ওয়ার্ডরোবে। বাড়িতে ভীষণভাবে অগোছালোভাবে থাকত তিতির, এখন তার সেই স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। মাত্র কয়েকদিন বাড়ির বাইরে স্বাবলম্বীভাবে থেকে হঠাৎ করে যেন বড় হয়ে গেছে তিতির।

যখন দেবারতি এসেছিল তখন রুমির সঙ্গে বসে গল্প করছিল তিতির। বেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিয়েছিল সে-ই। মা'কে দেখে যারপরনাই অবাক হয়েছিল। দেবারতির মনে হয়েছিল সেই অবাক হওয়ার মধ্যেও যেন একটু ভালোলাগা ছিল। হঠাৎ করে মা'কে দেখে তার মুখে যেন একটু খুশির ভাব ফুটে উঠেছিল। তিতির অবাক হয়ে বলছিল, 'ও মা, তুমি! খুঁজে পেলে কী করে জায়গাটা?'

'না পাওয়ার কী আছে? আগের দিন তো তুই বলে গেলি জায়গাটা কোথায়, এখানে এসে খুঁজে নেওয়া আর কী এমন ব্যাপার!'

'এসো, ভেতরে এসো।'

মা'কে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটটা দেখিয়েছিল তিতির। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রুমির সঙ্গে। রুমির কথা দেবারতি শুনেছে, তার সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছে একবার—এই প্রথম সামনাসামনি আলাপ হল। রুমি মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় সে খুব শান্ত প্রকৃতির, তিতিরের একেবারে উলটো। রুমির বাংলা উচ্চারণে অদ্ভুত একটা অবাঙালি টান আছে, উচ্চারণের ওই টানটা দেবারতির শুনতে খুব মিষ্টি লাগল।

তিতিররা কফি করে খাওয়াল দেবারতিকে। সেই সঙ্গে বিস্কুট দিল খেতে। মেয়ের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হল দেবারতি। ওদের সঙ্গে বসে কফি খেল, গল্প করল খানিক। বেরোনের সময়ে মেয়ের হাতে দু-হাজার টাকা দিল। বলল, 'এটা রেখে দে। কাজে লাগবে।'

তিতির আপত্তি করল না। টাকাটা রেখে দিল নিজের কাছে। তারপর

বলল, ‘তুমি শঙ্করলালবাবুর ওখান থেকে বাড়ি ফিরলে আমাকে জানিও। আমি বাড়ি গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব।’

দেবারতি বলল, ‘জানাব। আর এখানে কোনও অসুবিধে হলে জানিও আমাকে। আরও টাকার দরকার হলে ফোন করো। আমি ড্রাইভারের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেব।’

তিতির বলল, ‘টাকা আর লাগবে না, মা। আর দিন দশেক পরে স্যালারি পেয়ে যাব।’

‘ঠিক আছে। নিজের দিকে খেয়াল রেখো। খাওয়াদাওয়া করো ঠিক মতো।’

তিতির মাথা নাড়ল। তারপর বলল, ‘মা তুমিও খাওয়াদাওয়া করো ঠিকমতো। অনেক রোগা হয়ে গেছ, জানো? শরীরের যত্ন করো একটু।’

দেবারতি চুপ করে তাকিয়ে রইল তিতিরের দিকে। গত কয়েক সপ্তাহ সে শুধু শঙ্করলালের চিন্তায় অস্থির থেকেছে, নিজেকে নিয়ে ভাবেনি। সত্যি কথা বলতে কী, নিজের শরীর নিয়ে ভাবার সময় তার কোনওদিনই ছিল না। সারাটা জীবন সে শুধু অন্যকে কী করে ভালো রাখা যায়, সে দিকেই নজর দিয়ে গেছে। তার শরীরের কথা অন্যরাও কেউ ভাবেনি কখনও, কেউ তাকে বলেনি শরীরের যত্ন করতে। তিতির যতদিন তার কাছে ছিল, তিতিরও কখনও খোঁজ নেয়নি। দেবারতি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে কি না, নিজের শরীরের দিকে যত্ন নিচ্ছে কি না।

আজ তিতিরের কথায় দেবারতির চোখে বাষ্প জমা হতে চাইল। তার মেয়ে এখন সত্যি-সত্যি বড় হয়ে গেছে, কী সুন্দর তাকে বলল নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে!

দেবারতি আর দাঁড়াল না। তিতিরকে হাত নেড়ে তাদের পিজি অ্যাকোমোডেশন থেকে রওনা দিল। তিতিরের সামনে সে কখনও চোখের জল ফেলেনি। মেয়ের সামনে সব সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতাবান, প্রতাপশালী রমণীর ভূমিকা পালন করে এসেছে, আজও সে নিজের দুর্বলতা কারও সামনে প্রকাশ করতে চায় না।

গাড়ি করে সন্টলেক ফিরে চলল দেবারতি। শঙ্করলালের কাছে ফিরে যাচ্ছে সে। শঙ্করলালকে বেশিক্ষণ একা ফেলে রাখা ঠিক নয়।

গাড়িতে যেতে-যেতে দেবারতি খেয়াল করল, তার চোখ থেকে

দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে আপনমনে। এই অশ্রুপাতের কারণ কী, তা নিজেও ভালো করে বুঝতে পারল না দেবারতি।

১৫

গত কয়েকদিন ধরে তিতিরের কাজ খুব বেড়ে গেছে। অফিসে পৌঁছে যেতে হচ্ছে সকাল-সকাল, তারপরই অফিসের গাড়ি নিয়ে তাকে দৌড়তে হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের কাছে অবস্থিত চ্যানেলের অফিসে। চ্যানেলের অফিসে তাদের একজিউকিউটিভ প্রোডিউসারদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসতে হচ্ছে প্রস্তাবিত কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়ে, সেই মিটিং চলছে সকাল থেকে সন্ধ্য পর্যন্ত।

আপাতত দুটো প্রোগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা চলছে চ্যানেলের সঙ্গে। একটি প্রোগ্রাম আসার কথা সন্ধ্যাবেলা প্রাইম টাইমে। সেটা মেগা-সিরিয়াল, সেটা নির্দেশনার দায়িত্বে থাকবে অনিমেষদা। অনিমেষটা এই চ্যানেলের হয়ে আগেও হিট মেগা-সিরিয়াল করেছে, সুতরাং ওই প্রোগ্রামটা প্রায় চোখ বুজে পাস করে দিয়েছে চ্যানেল। তাদের ধারণা মেগা-সিরিয়াল ব্যাপারটা অনিমেষদা ভালো বোঝে, এ নিয়ে কারও আপত্তি হয়নি সে কারণে। চ্যানেলের সঙ্গে গোলমাল বাধছে অন্য প্রোগ্রামটা নিয়ে, সেটা সামলানোর ভার পড়েছে তিতিরের ওপর। তিতির একেবারে নতুন এই কাজে, সে বিশেষ কিছু বোঝে না অডিও-ভিসুয়ালের ব্যাপারে। তবু সব বুঝি টাইপের একটা হাবভাব করে সে দিব্যি মিটিং করে যাচ্ছে চ্যানেলের লোকদের সঙ্গে।

এই ‘সব বুঝি’ ভাবটা কী করে করতে হয় তা এখন বুঝে গেছে তিতির। এ ব্যাপারে অর্ক তাকে সাহায্য করেছে যথেষ্ট। নিজে যে অজ্ঞ নয় সেটা বোঝানোর সব থেকে ভালো উপায় হল গম্ভীর হয়ে থাকে। যারা গম্ভীর থাকে তাদের সম্পর্কে এমনিই এক রকম শ্রদ্ধা তৈরি হয় মানুষের মনে, লোকের একটা ধারণা থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির কাম কথা বলে। তিতির লক্ষ করে দেখেছে যে কোনও প্রোগ্রামের ব্যাপারে সবাই অনেক কিছু বলতে চায়, তাদের সকলের নানান মতামত আছে। নিজে কিছু বলার থেকে তাদের কথা মন দিয়ে শোনাটা বুদ্ধিমানের কাজ। চুপ করে

থাকলে এক ধরনের ইমপ্যাক্টও তৈরি হয়।

সবার এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে নিজের মনোযোগ ধরে রাখার আরেকটা উপায় আছে। মিটিংয়ে ঢোকার আগে একটা জয়েন্ট বানিয়ে সেটা খেয়ে নেওয়া। অর্কর কথায় এই পন্থা নিয়ে দেখেছে তিতির, প্রোগ্রামিংয়ের হাজার অবাস্তুর আলোচনার মধ্যেও নিজেকে বেশ শান্ত রাখা যায়, কনসেনট্রেশন ধরে রাখা যায় অনেকক্ষণ। শুকনো নেশা বেশ একটা ফিণ্টারের কাজ করে তিতিরের মনে। অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বাদ চলে যায়, দরকারি কথাগুলো থেকে যায় মাথায়। সেগুলো সন্ধের পরে অফিসে ফিরে এসে কম্পিউটারে নোট করে নিতে অসুবিধে হয় না। লেখার সময়েও একটা জয়েন্ট খেয়ে নিলে লিখতে সুবিধে হয় তিতিরের।

মাত্র কয়েক সপ্তাহে এই গাঁজার নেশায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছে তিতির। শুরু হয়েছিল অর্কর সঙ্গে গাঁজা ভরা সিগারেট ভাগ করা দিয়ে, এখন সে নিজের কাছে রেখে দেয় প্লাস্টিকে মোড়া গাঁজার পাউচ। অর্কর সঙ্গে গিয়ে কোথা থেকে জিনিসটা সংগ্রহ করতে হয়, সেটাও জেনে গেছে তিতির। গাঁজার তামাক সিগারেটের তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োজন মতো সে তার নিজের জয়েন্ট বানিয়ে নেয়, একটু ফাঁকা জায়গা দেখে একা একা সেটা দিব্যিই খেয়েও ফেলা যায়। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা জয়েন্ট খেয়ে নেয় তিতির, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও একটা খায়। এ ছাড়া সারাদিনে প্রয়োজন মতো আরও কয়েকটা খেয়ে নিলে মাথাটা পরিষ্কার থাকে বলে মনে হয় তিতিরের।

এই নেশার সব থেকে বড় সুবিধে হল, এর কোনও গন্ধ হয় না। খাওয়ার সময়ে উগ্র একটা গন্ধ বেরোয়, কিন্তু লোকজনকে এড়িয়ে খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে খেলে বোঝা যায় না। লোকজনের মধ্যে থাকলে বাথরুমে ঢুকে খেলেও কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মদ খেলে মুখ থেকে গন্ধ বেরোয়, এ ক্ষেত্রে সেটাও হয় না—সুতরাং দিব্যি লোকজনের সঙ্গে মিটিং করতে বসে পড়া যায়, কেউ সন্দেহ করতে পারে না। গাঁজার দামও বেশি নয়, পঞ্চাশ টাকার প্যাকেটে যে পরিমাণ মেলে তাতে তিতিরের দিব্যি তিন-চারদিন চলে যায়।

এই নেশাটা করে তিতির বেশ খুশি, কাজে বেশ একটা ফোকাস পাওয়া যায়। নিজের সমস্যাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরে না একেবারে, বেশ

একটা ফুরফুরে ভাব তৈরি হয় মনের মধ্যে। অর্কর কথাটা একদম ঠিক— একবার অভ্যেস হয়ে গেলে সারাদিন ধরে এই নেশায় বঁদ হয়ে থাকতে যে ভালো লাগে তাতে এখন আর সন্দেহ পোষণ করে না তিতির। ক্রিয়েটিভ কথাটার মানে ঠিকমতো না বুঝলেও নেশার গতি-প্রকৃতিগুলো এখন তিতিরের করায়ত্ত।

রিয়েলিটি শো'টা নিয়ে গতকাল থেকে চ্যানেলের লোকজনের সঙ্গে একটা গন্ডগোল লেগে গেছে। তিতিরদের কোম্পানি প্রোগ্রামের ব্যাপারে যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেছিল তা চ্যানেলের কর্তাব্যক্তিদের পছন্দ হয়নি। গতকাল অফিসে ফিরে গিয়ে অনিমেসদার নির্দেশে নতুন করে আবার একটা প্রেজেন্টেশন বানাতে হয়েছে তিতিরকে। সেই প্রেজেন্টেশন নিয়ে আজ মিটিং হবে চ্যানেলের সকলের সঙ্গে, তিতিরকে নিজের কোম্পানির পক্ষে অনেক কথা বলতে হবে।

তিতিরের সঙ্গে তাদের কোম্পানির হয়ে কথা বলতে এসেছে রাঘব বলে একটি ছেলে, সে অনিমেসদার সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজ করবে বলে সবে জয়েন করেছে তিতিরদের ওখানে। ছেলেটা কতটা কাজ বোঝে তা নিয়ে তিতিরের নিজের সন্দেহ আছে, যদিও সব সময়ে খুব পাকা টাইপের হাবভাব করে ঘুরে বেড়ায়।

তিতির দেখেছে, অডিও-ভিসুয়ালে কাজ করতে গেলে এই হাবভাবটা বজায় রাখা খুব জরুরি। কাজ জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু অনেক কাজ জানি এমন একটা ভাব দেখানো খুব জরুরি। রাঘব সেই কাজে বেশ পোক্ত। চ্যানেলের পক্ষ থেকে চারদিন ধরে আলোচনা করছে ভাস্কর আর প্রীতম বলে দুজন। এদের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়তরিশের মধ্যে, এরাও খুব বেশি কিছু বোঝে বলে তিতিরের মনে হয়নি, এরা কথা বলার সময়ে নানান থিওরি আউড়ে বরং প্ল্যানিংটায় সবসময়ে একটা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করে।

আজ ভাস্কর এবং প্রীতমের সঙ্গে মিটিংয়ে যোগ দিয়েছে শুভঙ্কর বলে একজন। তাকে তিতির আগে কখনও দেখেনি, রাঘবের কাছে শুনেছে ভদ্রলোক চ্যানেলের প্রোগ্রামিং হেড। কনফারেন্স রুমে এসে তিনি আপাতত চুপ করে বসে আছেন, তিতির লক্ষ করে দেখল চ্যানেলের সকলে তাঁর সঙ্গে 'স্যার, স্যার' করে কথা বলছে। তিতির এই ভদ্রলোককে কী সম্বোধন করবে ঠিক বুঝতে পারল না, অরিন্দমদা কিন্তু বলেছিল

কর্মক্ষেত্রে কাউকে স্যার বলার প্রয়োজন নেই, বয়োঃজ্যেষ্ঠদের দাদা বলাটাই সম্ভব।

মিটিংয়ের আলোচনা শুরু করল ভাস্কর। অনেকক্ষণ ধরে সে কথা বলল, তার কথা বলার সময়টুকু সে কী বলছে তার দিকে নজর না দিয়ে তিতির নিজের মস্তিষ্কে তার নেশার অনুরণনের দিকে মনোযোগ দিল বেশি। তার মধ্যেই ভাস্কর আসলে কী বলতে চাইছে তা বুঝে নিতে পারল সে। ভাস্কর ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলছে, মাঝে একবার অকারণে রবীন্দ্রনাথের কোটেশনও ব্যবহার করে ফেলেছে—কিন্তু আসলে যে যা বলতে চাইছে তা হল তিতিরদের সাজানো প্রোগ্রাম আর যে-কোনও রিয়েলিটি শোয়ের মতোই, এতে নতুন কী বিশেষত্ব আছে তা সে বুঝতে পারেনি এখনও। তার বক্তব্য, যে-কোনও প্রোগ্রাম হিট করাতে গেলে স্বকীয়তা থাকা প্রয়োজন, ইউএসপি না থাকলে সেই প্রোগ্রাম চ্যানেলের কোনও কাজে লাগবে না।

কাজে যোগ দেওয়ার পরে ইউএসপি কথাটার মানে শিখে নিয়েছে তিতির। কথাটা যততর ব্যবহার করা হয়, যে-কোনও অনুষ্ঠানের ঘাড়েই ইউনিক সেলিং প্রোপোজিশন নামক এই তকমা লাগিয়ে দেওয়া খুব জরুরি। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানকেই স্বকীয় হয়ে উঠতে হবে, যাতে অন্য প্রোগ্রামের থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায়—তবেই নাকি দর্শক সেই অনুষ্ঠান দেখতে চাইবে।

তিতির কাছে এই ইউএসপি বস্তুটা এখনও ঠিক পরিষ্কার নয়। তার কাছে টেলিভিশনের সব প্রোগ্রাম মোটামুটি একই রকম লাগে, তার মনে হয় সবক'টা চ্যানেলের সব কটা বস্তুত একইরকম। সবক'টার গল্প প্রায় এক, একই চরিত্রাভিনেতা সবক'টা সিরিয়ালে অভিনয় করে, ফলত একটার সঙ্গে আরেকটার তফাত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। রিয়েলিটি শো ব্যাপারটাও তাই, হয় লোকে গান গাইবে নয় নাচবে। কিংবা লোকে মজার মজার কথা বলে লোক হাসানোর চেষ্টা করবে। সেই সব দেখে শুনে প্রোগ্রামে উপবিস্তি বিচারকরা ঠিক করবেন কে বেশি ট্যালেন্টড। এই ধরনের প্রোগ্রাম আজকাল খুব চলে, কিন্তু তাতে আলাদা কী থাকতে পারে তা এখনও মাথায় ঢোকে না তিতিরের। তবু খাতায়-কলমে এই ইউএসপি নামক অথবা জিনিসটার গুরুত্ব দেওয়া প্রোগ্রাম তৈরি করার পক্ষে জরুরি।

গত তিন-চারদিন ধরে এই ইউএসপি প্রসঙ্গ নিয়ে কাটা রেকর্ডের মতো কথা বলে যাচ্ছে ভাস্কর, তার কথা শুনতে-শুনতে তিতির নেশার ঝোঁকে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল। নেশা হলে অনেক সময়ে অকারণে হাসি পেয়ে যায় তিতিরের, সেটা অনেকসময়ে তাকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আজ অবশ্য তিতিরের হাসি কেউ লক্ষ করেনি বলে মনে হয়, সে তাড়াতাড়ি করে মুখ নামিয়ে নিল।

ভাস্করের কথা বলা শেষ হওয়ার পরে শুভঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তিতিরদের দিকে। এর অর্থ হল, চ্যানেলের তরফ থেকে অনেক কিছু বলা হল; এবার প্রোডাকশন কোম্পানির কথা বলার পালা। তিতির কিছু বলার আগেই কথা বলতে শুরু করে দিল রাঘব। রাঘব ভয়ানক টেকনিকাল কথাবার্তা বলে, সে এখন প্রোগ্রামে ক'টা ক্যামেরা থাকবে, তাদের কী পোজিশন হবে এই সব নিয়ে কচকচি শুরু করে দেবে—বোঝানোর চেষ্টা করবে এই প্রোগ্রাম অন্যদের থেকে টেকনিকালি এত উন্নত মানের হবে যে তাতেই আলাদা একটা স্বকীয়তা তৈরি হয়ে যাবে, ফলে দর্শকেরা হাঁ করে তাদের প্রোগ্রাম দেখবে!

এই টেকনিকাল কচকচি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারে না তিতির। সে এখনও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও অডিও ভিসুয়ালের কাজ করেনি, তার কাছে ক্যামেরায় কী করে ছবি ওঠে এই ব্যাপারটাও খুব পরিষ্কার নয়। সুতরাং একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার ক্ষেত্রে তিতির অন্যরকমভাবে ভাবে এখনও। সে অনুষ্ঠানটাকে দেখে দর্শকের চোখ দিয়ে। দর্শক হিসেবে কোন প্রোগ্রাম তার ভালো লাগছে সেটাই আসল কথা বলে মনে হয় তিতিরের।

দর্শকেরা তারই মতো ইউএসপি অথবা অনুষ্ঠানের টেকনিকাল কারিকুরি নিয়ে মাথা ঘামায় না বলে তিতিরের ধারণা, তার প্রোগ্রাম তাদের মনে কোনও আবেগ তৈরি করতে পারছে কি না তার ওপরে অনুষ্ঠানের ভালো-মন্দ বিচার করে। তিতির মুখ নামিয়ে নিল, রাঘবের কথাও মন দিয়ে শোনার খুব বেশি প্রয়োজন তার নেই, তার থেকে নিজের নেশার ঘোর মন দিয়ে উপভোগ করাই শ্রেয়।

বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসে রইল তিতির, যদিও তার মুখ দেখে মনে হবে সে সব কথা খুব মন দিয়ে শুনছে। সে শুধু খেয়াল করল, রাঘবের কথা বলা শেষ হওয়ার পরে হঠাৎ করে চুপচাপ হয়ে গেল

সকলে, শুভঙ্কর নামক গুরুত্বপূর্ণ লোকটা শুধু আপনমনে মাথা নাড়াতে লাগলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল রাঘবের প্রেজেন্টেশন তাঁর পছন্দ হয়নি মোটেই।

বেশ কিছুক্ষণ নাটকীয়ভাবে চুপ করে থাকার পরে শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন শুভঙ্কর। জিভ দিয়ে চুকচুক করে একটা আওয়াজ করলেন তিনি। তারপর বললেন, ‘আয়াম সরি। আপনারা আভারপ্রিপেয়ার্ড। আপনাদের প্রোগ্রামে পছন্দ করার মতো কিছু পাচ্ছি না আমরা।’ তারপর একটু থেমে যোগ করলে। ‘আই থিঙ্ক আপনাদের কোম্পানিদের সিনিয়ারদের একটু বলুন এই প্রোগ্রামটা নিয়ে ঠিক করে ভাবতে। ইউ পিপল আর টু জুনিয়র টু হ্যান্ডল দ্য প্রোজেক্ট!’

শুভঙ্করের কথা বলার ভঙ্গি একটু উদ্ধত, তা অবশ্য হতেই পারে। তাঁর কথার ওপরেই তিতিররা এই প্রোগ্রাম পাবে কি না তা শেষপর্যন্ত নির্ভর করবে। তারা জুনিয়ার বলে এই প্রোগ্রামটা মনঃপূত হচ্ছে না মনে হল তিতিরের, এবং সেটা ভাবতেই তার শরীরে রাগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল একটু-একটু করে। তিতির জুনিয়র মানে? তার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, স্বাবলম্বীভাবে জীবনযাপন করতে শিখেছে, তাকে এই মধ্যবয়সি একটা লোক বয়সে ছোট বলে অবজ্ঞা করবে? সে কমবয়সি বলে অরিন্দম তো তাকে অবজ্ঞা করেনি, বরং তাকে বলেছিল, এই প্রোফেশনে সিনিয়র-জুনিয়র বলে কিছু হয় না। বরং কমবয়সিরাই অনেক সময়ে নতুন-নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতে পারে।

শুভঙ্কর কথা বলায় ঘরের সকলে চুপ করে গেছে, রাঘবও তার পাকা-পাকা হাবভাব বন্ধ রেখে তাকিয়ে রয়েছে তিতিরের দিকে। এর অর্থ হল, তিতির এবারে কিছু বলুক। প্রোগ্রামটা তাদের কোম্পানির পক্ষে খুব জরুরি, শুধু একটা মেগা সিরিয়াল দিয়ে একটা কোম্পানি চালানো যাবে না—এ কথা অনিমেঘদা বারবার করে বলে দিয়েছে। বলে দিয়েছে এই রিয়েলিটি শো’র প্রোগ্রামটা যে করে হোক চ্যানেলের কাছ থেকে তাদেরই বার করে আনতে হবে। তা ছাড়া অরিন্দম মুখার্জি নামটার একটা প্রেস্টিজ রয়েছে, তার নামাঙ্কিত কোম্পানির প্রস্তাবিত কোনও প্রোগ্রাম চ্যানেল নাকচ করে দিয়েছে এই ব্যাপারটা কোনওমতেই কাম্য নয়।

তিতিরের নেশাটা ছড়িয়ে রয়েছে তার চেতনার সর্বস্তরে। সেই সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে তিরতিরে রাগের অনুভূতি। সে অল্প করে একটু

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, তারপর সরাসরি তাকাল শুভঙ্করের চোখের দিকে। একবারও চোখের পলক না ফেলে বলল, ‘আপনাকে সবাই স্যার করে বলছে, আমাকেও কি স্যার বলতে হবে নাকি?’

১৬

ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময়ে অফিসে এল অরিন্দম। তার নিজের সিনেমা রিলিজ নিয়ে তাকে গত দু-সপ্তাহ ভয়ঙ্কর ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তিনদিন আগে রিলিজ হয়েছে সিনেমাটা। এখন অবধি সেলস রিপোর্ট অ্যাভারেজ, কিন্তু সেটা খুব একটা গায়ে মাখেনি অরিন্দম। সে সঞ্জীবের সিনেমাটার রিলিজ পুরোপুরি ঘেঁটে দিতে পেরেছে, সেটাই এই মুহূর্তে তার কাছে সব থেকে বড় কথা। সঞ্জীবের সিনেমাটা যেভাবে রিলিজ করেছে, তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট। ওই সিনেমা শ্রেফ রিলিজের দোষে কিছুতেই হিট করবে না। আপাতত সঞ্জীবকে আরও কিছুদিন অরিন্দমের ধারেকাছে পৌঁছোনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খবরের কাগজে করা সুকান্তর ভবিষ্যদ্বাণী এই মুহূর্তে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

ইন্দ্রদা একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে অরিন্দমদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। রাজি না হয়ে আসলে তাঁর কোনও উপায় ছিল না, কারও পক্ষেই বছরে টানা কুড়ি-পঁচিশ সপ্তাহের প্রোগ্রামে না করা মুশকিল, তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভাবার সময় নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আখেরে সুবিধে হয়েছে অরিন্দমদেরই। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে হল না পাওয়ায় সঞ্জীবের সিনেমা রিলিজ করেছে বি-গ্রেড সেন্টারগুলোতে। তাতে ছবির বিক্রি এমনিই কমে যায়, তার ওপর সকলের ধারণা হয় ছবি ভালো হয়নি বলে এই ভাবে ছবি রিলিজ করা হয়েছে।

স্বভাবতই সঞ্জীবের ছবির ওই হাল দেখে সুকান্ত ফোন করেছিল অরিন্দমকে। অরিন্দম তাকে সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছে সে রিলিজের ব্যাপারে কোনও খবরই রাখে না, এসব ব্যাপার ডিরেক্টর এবং পরিবেশকরা ভালো জানে। এর পরে প্রভঞ্জনদা, প্রেমাংশু এবং ইন্দ্রদাকে ফোন করেছিল সুকান্ত। তারা প্রত্যেকে বলেছে সঞ্জীবের থেকে অরিন্দম এখনও সেফ বেট। সে কারণে সঞ্জীবের ছবি মার্কেটে তেমন পাত্তা পায়নি।

অন্য ছবির কম্পিটিশন কম থাকলে এমনিই ছবির কালেকশন বাড়ে। অরিন্দমের ছবির ইনিশিয়াল অ্যাভারেজ হলেও শেষ পর্যন্ত তা মার্কেটে পুষিয়ে নেবে এ কথা সকলেই জানে। হলে গিয়ে যারা ছবি দেখে তারা ছবি না দেখে থাকতে পারে না। অন্য কোনও ছবি না থাকলে শেষ পর্যন্ত অ্যাভারেজ ছবিই হিট করে যায়। অরিন্দমের এই ছবিটার ক্ষেত্রেও সে রকমই হবে। জুবিলি না হলেও ছবি যে যথেষ্ট চলবে তা নিয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না আর। অরিন্দম নিশ্চিত হয়েছেন এখন, অনিমেষের জরুরি ফোন পেয়ে অফিসে আসতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি সে কারণে। গত কয়েক সপ্তাহ রিলিজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় প্রোডাকশন কোম্পানির কাজে একেবারে মনোযোগ দিতে পারেনি অরিন্দম।

অফিসটা এই মুহূর্তে ফাঁকা, মেগা-সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লেখার টিমের লোকেরা কাজকর্ম শেষ করে একে-একে রওনা দিয়েছে। প্রোডাকশনের কাজ যারা করবে তারাও চলে গেছে, অফিসে এই মুহূর্তে রয়ে গেছে তিতির, রাঘব, অনিমেষদা আর সর্বক্ষণের পাহারাদার কাম বেয়ারা নিধিরাম। নিধিরামের বয়স বেশি নয়, সে এই অফিসে সকলের কফি খাওয়া থেকে শুরু করে প্রয়োজন মতো দুপুরের খাবারের জোগান দেয়। একটু আগেও নিধিরাম তিতিরকে জিগ্যেস করে গেছে সে কফি খাবে কি না।

তিতির কফি খায়নি। আজ সারাদিনে তার খাওয়া হয়নি, উলটে কাপের পর কাপ চা আর কফি খেয়ে তার এখন গা গুলোচ্ছে। সে মিটিং শেষ করে রাঘবের সঙ্গে অফিসে ফিরেছে বিকেলবেলা, মিটিংয়ের ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে অনিমেষদার কাছ থেকে তুমুল বকা খেয়েছে তিতির। অনিমেষদার বক্তব্য তিতির কাউকে জিগ্যেস না করে চ্যানেলকে যা প্রস্তাব দিয়ে এসেছে তা রূপায়ণ করা অসম্ভব, এই রকম প্রস্তাব দেওয়ার আগে তিতিরের উচিত ছিল অনিমেষদার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া।

তা ছাড়া শুভঙ্করকে তিতির স্যার না বলে শুভঙ্করদা বলে ডেকেছে শুনে আরও রেগে গেছে অনিমেষদা। 'তোমার কী ধারণা যাকে যা খুশি বলে ডাকা যায়? শুভঙ্করদার প্রচণ্ড ইগো আছে সব ব্যাপারে? এখন তুমি কী বলে ডাকলি তাতে রেগে গিয়ে লোকটা আমাদের প্রোগ্রাম নাও দিতে পারে সেটা জানিস? এই লাইনে সব কিছু নিজের ইচ্ছেমতো হয়

না, কাকে কী বলে ডাকবি তা ঠিক করার দায়িত্ব তোকে কে নিতে বলেছে?’

অনিমেষদার ধারণা, শুভঙ্কর নামের ওই চ্যানেলের হর্তাকর্তা ব্যক্তিটি শ্রেফ তিতিরকে অপছন্দ করার কারণে তাদের কোম্পানিকে দিতে অস্বীকার করতে পারে। তিতিরের কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করার সঙ্গে তাদের প্রোগ্রাম দেওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে! অনিমেষদা বলল, ‘একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা কর, তিতির। এই জগৎটা তোর নিয়মে চলে না। নিজেকে সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। শুভঙ্কর লোকটা ডেঞ্জারাস, এমনিতে টাকা না খাওয়ালে ওর কাছ থেকে প্রোগ্রাম বার করা যায় না। আমাদের বেলায় রাজি হয়েছিল শ্রেফ অরিন্দমদার নাম শুনে। তুই পুরো ঝুলিয়ে দিয়ে এলি!’

মুখ গোঁজ করে তিতির বলেছিল, ‘আমি কোথায় ঝুলিয়ে দিয়ে এলাম? আমি তো বরং এমন একটা প্রোপোজাল দিলাম যেটা ওরা না করতে পারল না। বলল তো প্রোগ্রাম আমাদের দেবে!’

‘তুই যা প্রোগ্রামের কথা বলে এলি সেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব কি না জানিস? জানিস অরিন্দম মুখার্জির সময়ের কত দাম? তুই কাউকে জিগ্যেস না করে বলে এলি অরিন্দম মুখার্জি ওই রিয়েলিটি শো-তে জাজ হবে? অরিন্দমদা সময় দিতে পারবে কি না কাউকে জিগ্যেস করারও প্রয়োজন মনে করলি না? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ফিল্ম স্টারেরা টেলিভিশনের কাজ করে কখনও? অরিন্দমদা একজন সুপারস্টার, তাকে দিয়ে তুই টিভি প্রোগ্রাম করাবি!’

‘আমি বুঝতে পারছি না অরিন্দমদা প্রোগ্রাম করবে না কেন? নিজের কোম্পানির প্রোগ্রাম, অরিন্দম মুখার্জি থাকলে প্রোগ্রামের ওজন বাড়বে। সবাই তো টেলিভিশনের লোক দিয়ে প্রোগ্রাম করে, সিনেমার লোক দিয়ে প্রোগ্রাম করলে সেই প্রোগ্রাম হিট করবে! নিজের কোম্পানির জন্য এইটুকু করে না লোকে?’

অনিমেষদা বলল, ‘তুই নিজে এই কথা অরিন্দমদাকে বলিস। বলিস, যে তুই বলে এসেছিস অরিন্দমদা টেলিভিশন প্রোগ্রাম করবে। তারপর কী হয়, দেখে নিস একবার। আজ অবধি টেলিভিশনের পরদায় মুখ দেখায়নি অরিন্দমদা, তোর কথায় করবে, হুঃ! অরিন্দমদাকে আসতে বলেছি আজ সন্ধ্যাবেলায়, তখন ধাতানি খাবি, আমি কিন্তু সামলাতে আসব না।

আর অরিন্দমদা যদি তোকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে, তাহলেও আমার কিছু করার থাকবে না।’

অনিমেষদা বরাবর তিতিরকে সামলে সামলে এসেছে, আজই প্রথম তার কাছ থেকে এত কড়া ভাষায় কথা শুনতে হল তিতিরের। তিতিরের খারাপ লেগেছে তাতে সে নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা করেছে বারংবার। নিজেকে সামলাতে গিয়ে সে ছাদে উঠে দুবার দুটো জয়েন্ট খেয়ে এসেছে, তাতেও তার নার্ভাস ভাব যাচ্ছে না। অরিন্দম যখন অফিসে এল তখন তিতির লবিতেই বসে ছিল, অরিন্দমকে দেখে তার গলার কাছটা শুকিয়ে উঠল।

অরিন্দমকে সে এই ক’দিনে মাত্র কয়েকবারই দেখেছে, কখনওই সে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। প্রথমদিন অরিন্দমের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একটা পার্টিতে, সেদিনের কথা অরিন্দমের মনে থাকার কথা নয়। সেদিন পূজাকে সামলাতে ব্যস্ত ছিল তিতির। দ্বিতীয়দিন অরিন্দম তার ইন্টারভিউ নিয়েছিল এই অফিসে বসে, সেদিনও তার সঙ্গে আড্ডার মতো করে অনেক গল্প করেছিল অরিন্দম। এর পরে অরিন্দম অফিসে এসেছে কম, তিতিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে দু-তিনবার মাত্র। তিতিরের সঙ্গে কথা হয়নি কোনওদিন, কিন্তু চোখাচুখি হওয়াতে প্রত্যেকবারই ভদ্রতা করে হেসেছে অরিন্দম।

আজ যেখানে তিতির বসেছিল সেখান থেকে অরিন্দমকে প্রবেশ করতে দেখলেও অরিন্দম তিতিরকে দেখতে পায়নি, সুতরাং তার দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের পক্ষে হাসা সম্ভব ছিল না। তাও তিতিরের মনে হল চোখাচুখি হলেও অরিন্দম আজ হাসত না। অন্যদিন তাকে হাসিখুশি দেখতে লাগে, আজ মনে হল অরিন্দম যেন একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর। অনিমেষদা তাকে ফোনে তিতির সম্পর্কে কী জানিয়েছে কে জানে! অনিমেষদা তিতিরের ওপর সত্যি খুব রেগে গেছে, এখনও হয়তো অরিন্দম তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলবে। বলবে, তোমার দ্বারা হচ্ছে না তিতির, ইউ আর ইনকম্পিটেন্ট। নিজের রাস্তা তোমাকে খুঁজে নিতে হবে এবারে।

অরিন্দম এরকম কিছু বলতেই পারে। আজকের যুগে যখন-তখন চাকরি চলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। চাকরিটা চলে গেলে সেটা বেশ খারাপ ব্যাপার হবে, তিতির এখন মাস গেলে দশ হাজার টাকায়

অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকায় আনন্দ আছে, তিতির সেখানে থেকে নিজের বাড়ির বন্দি জীবনে ফেরত যেতে চায় না। তা ছাড়া প্রোডাকশনের এই কাজ করতে তার বেশ ভালোও লাগছে, তার মনে হয়েছে কর্পোরেট অফিসের বাঁধাধরা কাজ কিংবা কল-সেন্টারের ঘড়িতে বাঁধা নিয়মিত জীবনের থেকেও এই কাজে মজা অনেক বেশি।

অরিন্দম এসে তার নিজের চেম্বারে ঢুকে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অনিমেঘদা দরজা ঠেলে ওই চেম্বারে ঢুকল। একটু পরেই ঘরের বেল বেজে উঠল, নিধিরাম এসে তিতিরকে খবর দিল তাকে ওই চেম্বারে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিতিরের গলাটা শুকিয়ে উঠল আবারও, কিন্তু জল না খেয়েই সে রওনা দিল অরিন্দমের চেম্বারের দিকে। তিতিরের সঙ্গে রাঘবকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে, সে অফিসের অন্য কোনও প্রাপ্তে ছিল—চেম্বারে ঢোকার মুখে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তিতিরের। রাঘব তিতিরকে দেখে মুচকি হাসল একটু। অনিমেঘদার হিসেবমতো আজকের মিটিংয়ে কোনও গণ্ডগোল করেনি, চ্যানেলের সঙ্গে সমস্ত সমস্যার জন্য তিতিরই দায়ী। তিতিরের গলা শুকিয়ে উঠলেও রাঘবের হাসতে কোনও অসুবিধে নেই।

অরিন্দম বসে ছিল টেবিলের অপরপ্রান্তে। টেবিলের একপাশে একটা চেয়ার টেনে বসে রয়েছে অনিমেঘদা। তিতিররা ঘরে ঢুকতেই অনিমেঘদা গম্ভীরমুখে তাকাল তাদের দিকে। হাতের ইশারায় চেয়ার টেনে বসতে বলল। রাঘব তার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে, তার দেখাদেখি তিতিরও বসল, একটু জড়সড় ভাবে। তার মাথার মধ্যেটা দপদপ করছে এখন, একটু-একটু ভয় করছে। সাধারণত নেশা করে থাকলে মনের মধ্যে এক ধরনের শান্ত সৌম্যভাব তৈরি হয়, আজ কোনও কারণে তা অনুপস্থিত।

অনিমেঘদা বলল, ‘তিতিরকে এবারে জিগ্যেস করে নাও। না জেনে সব কমিটমেন্ট করে এসেছে, এবারে আমি জানি না প্রোগ্রামটা কী করে করব আমরা।’

অরিন্দম স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিতিরের দিকে। বলল, ‘তুমি চ্যানেলকে এই প্রোপোজাল কেন দিয়ে এলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?’

অরিন্দমের গলায় কোনও অভদ্রতা নেই, তার কথা শুনে মনে হল

না সে তিতিরের ওপর রাগ করে আছে। তার প্রশ্নে বিরক্তির থেকেও কৌতূহলটাই বেশি যেন। তা সত্ত্বেও তিতিরের গলা শুকোল আবার। তার বুকের মধ্যেটা গুড়গুড় করে উঠল। সে বলল, ‘আমি আসলে বুঝতে পারিনি আপনার পক্ষে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয়। আমি না জেনে বলেছি। অনিমেষদা আমায় পরে বলেছে ব্যাপারটা। আয়াম সরি ফর হোয়াটেভার হ্যাপেন্ড।’

অরিন্দম বলল, সরি-টরি পরের কথা। কিন্তু চ্যানেল চাপ দিচ্ছে বলেই তুমি অসম্ভব একটা প্রস্তাব দিয়ে দেবে? যেন-তেন প্রকারে যে-কোনও একটা প্রোগ্রাম করা আমাদের কোম্পানির উদ্দেশ্য নয়। চ্যানেলকে তেল দেওয়ার জন্য তাদের যা খুশি প্রোপোজাল দেব, এটাও ঠিক নয়। আমরা ভালো প্রোগ্রাম করতে চাই, তার জন্য যা করার করব। কিন্তু চ্যানেলকে খুশি করার জন্য আজো প্রোগ্রাম দেব না।’

তিতির মাথা নাড়ল। একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, ‘আমি আসলে প্রোগ্রামটা ভালো হবে বলেই ওই প্রোপোজালটা প্লেস করেছিলাম। চ্যানেলকে খুশি করা উদ্দেশ্য ছিল না আমার। মনে হয়েছিল প্রোগ্রামটা অন্যরকম করা দরকার, আর পাঁচটা চ্যানেলে যেভাবে রিয়েলিটি শোয়ের প্রোগ্রাম হয় তার থেকে আলাদা হত। অন্য একটা ভ্যালু তৈরি হত। প্রোগ্রামটা লোকে মন দিয়ে দেখত।’

অরিন্দম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তিতিরের দিকে। তারপর বলল, ‘ঠিক কীভাবে এ জিনিসটা তৈরি হবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে একটু?’

তিতির বলল, ‘আমি বলেছিলাম ট্যালেন্ট হান্টের জাজ হিসেবে আপনি থাকবেন। আপনি নিজে প্রতিযোগীদের জাজ করছেন এই ব্যাপারটার একটা অন্য মর্যাদা আছে। আপনি কখনও টেলিভিশনের প্রোগ্রামে আসেন না বলে লোকে আপনাকে দেখবে বলেই প্রাইমারিলি প্রোগ্রামটা চালিয়ে দেখবে। তারপর বলেছিলাম একেবারে শেষ পর্যন্ত এই রিয়েলিটি শো’তে যারা জিতবে তাদের মধ্যে থেকে আপনি নিজে হিরো আর হিরোইন বেছে নেবেন। তাদের লঞ্চ করবেন বড় পরদায়। এই প্রোডাকশন হাউস এই নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সিনেমা তৈরি করবে। একটা রিয়েলিটি শো’তে এর থেকে বেশি প্রাইজ মানি আর কিছু হতে পারে না। এই অ্যানাউন্সমেন্ট আগে থেকে করে দিলে সারা বাংলা থেকে আমরা সত্যি সত্যি ভালো কোয়ালিটির ছেলেমেয়ে পাব। প্রোগ্রামটা জমে যাবে।

আমাদের কোম্পানির পক্ষে এইটাই আইডিয়াল রিয়েলিটি শো বলে মনে হয়েছিল আমার। সে কারণে আমি এই প্রোপোজাল দিয়েছি। চ্যানেলকে খুশি করার জন্য নয়।’

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে তিতির থামল। তার এমনিতেই তাড়াতাড়ি কথা বলার স্বভাব, এখন এত কথা একসঙ্গে বলে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে রক্তিম আভা জমে উঠতে চাইছে। তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল অরিন্দম। এই মেয়েটাকে এমনিতে খুবই সাধারণ দেখতে, কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে এক ধরনের নিজস্বতা আছে, যা তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ভালো করে চেনে না সে। সে ঠিক করেছিল তিতিরের সঙ্গে ভালো করে মিশে দেখবে আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা আসলে কী চায়। সময়ের অভাবে এতদিন সেটা অরিন্দম করে উঠতে পারেনি, এখন সিনেমা রিলিজ করে যাওয়ার পরে সেই চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? তিতির মেয়েটাকে প্রথম দিন পার্টিতে দেখেই অরিন্দমের ভালো লেগেছিল, আজ তাকে আরও ভালো লাগল অরিন্দমের।

অরিন্দম বলল, ‘কিন্তু একটা টেলিভিশন প্রোগ্রাম করতে গেলে অনেক সময় দিতে হয়। তুমি কী করে ভাবলে টেলিভিশনের পরদার জন্য আমি সেই সময়টা দেব?’

একই প্রশ্ন করেছিল অনিমেঘদাও। অনিমেঘদার রাগের কারণ সেটাই। বড় পর্দার নায়কেরা ছোট পর্দায় মুখ দেখাতে চায় না, তাতে নাকি স্টারদের ইমেজের ক্ষতি হয়। তা ছাড়া সিনেমার ব্যবসা এবং শুটিং নিয়ে অরিন্দম মুখার্জিকে ব্যস্ত থাকতে হয় সর্বদা, টেলিভিশনের জন্য সময় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণেই কাউকে জিগ্যেস না করে চ্যানেলকে কোম্পানির তরফ থেকে প্রোপোজাল দিয়ে দেওয়ার চটে গেছে অনিমেঘদা।

তিতির দম নিল একটু। তারপর বলল, ‘প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমি একটা হিসেব করেছি। আপনাকে অনেক সময় দিতে হবে না। মাসে চার থেকে পাঁচ দিন দিলেই যথেষ্ট। কোন সময়ে শুটিং হবে সেটা আপনার শিডিউল দেখে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারব, অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, সেটা আরও বেশি ইম্পরট্যান্ট।’

অরিন্দম কৌতূহলী চোখে তাকাল তিতিরের দিকে। তিতির বলল, ‘মুন্সাইতে অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে সলমন খান অবধি সবাই টেলিভিশনে শো করেছে। সবাই জানে টেলিভিশন শোটা একজন সুপারস্টারের আসল জায়গা নয়, সকলে প্রোগ্রামগুলোকে এক্সেপশন হিসেবেই ধরে। কলকাতায় আপনার মতো একজন স্টার টেলিভিশনে এলে তার কী এফেক্ট হবে ভাবা যায় না। আমি ভেবেছিলাম আপনি প্রোগ্রামটা করতে রাজি হবেন। অনুষ্ঠানটা আপনার নিজের কোম্পানির, এর জন্য আপনি যদি কিছু না করেন, তা হলে কে করবে?’

অরিন্দম স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিতিরের দিকে। তারপর বলল, ‘টেলিভিশন আমাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না। আমার পার ডে রেট কত জানো? একটা ইভেন্টে আমার অ্যাপিয়ারেন্স ফি কত, সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?’

তিতির মাথা নাড়ল। তার সত্যি ধারণা নেই অরিন্দম মুখার্জি দিনে কত টাকা রোজগার করে। সে শুধু বলল, ‘টাকা নিয়ে চ্যানেলের কারও সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। তবে আপনি প্রোগ্রাম করলে টাকাটা কোনও প্রবলেম হবে না বলে আমার মনে হয়নি। আপনার টাকা ওরা দেবে, নইলে আপনাকে নিয়ে যে প্রোগ্রাম করা যায় না সে তো জানা কথা।’

অরিন্দম চুপ করে গেল। তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘শুভঙ্করকে ফোনে ধরো তো একবার। বলো, আমি কথা বলব।’

অরিন্দম কথা বলতে চাইছে এ কথা শুনে শুভঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে লাইনে এলেন। এমনিতে তাঁকে ফোনে ধরা খুব মুশকিল। অরিন্দম বলল, ‘মিস্টার ব্যানার্জি, আপনারা প্রোগ্রামটা করতে ইন প্রিন্সিপল রাজি হয়েছেন শুনলাম।’

ওপ্রান্তে শুভঙ্কর কী বললেন তা এ পাশ থেকে শুনতে পেল না তিতির। কিন্তু চ্যানেলের যে প্রোগ্রামের ব্যাপারে উৎসাহ আছে সেটা অরিন্দমের পরের কথাতেই পরিষ্কার হল। অরিন্দম বলল, ‘আমি তিনদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে বসব। ফিন্যান্সের ব্যাপারে কথা বলতে হবে। আর প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু আইডিয়া আছে, সে সব নিয়েও অনেক কথা আছে।’

ফোনে কথোপকথন শেষ করে অনিমেষদা আর রাঘবের দিকে না তাকিয়ে অরিন্দম সরাসরি তাকাল তিতিরের দিকে। বলল, ‘কাল আমার সঙ্গে তিনদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে পারবি? তোর সঙ্গে বসে প্রোগ্রাম স্ট্রাকচারটা ঠিক করে ফেলব তাহলে। কাল বিকেলে বেরোব আমরা। সিনেমার প্রমোশন আছে বোলপুর, বর্ধমান আর মেমারিতে। পারবি যেতে? না অসুবিধে আছে?’

অরিন্দম এতদিন পর্যন্ত তিতিরকে তুমি বলে কথা বলে এসেছে, এখন হঠাৎ করে তাকে তুই বলতে শুরু করায় তিতির খুশি হল। তুই সম্বোধনটা তার খুব প্রিয়, ‘তুমি’র বদলে ‘তুই’ বললে মানুষটাকে অনেক আপন বলে মনে হয় তিতিরের। মা তাকে কখনও ‘তুই’ করে ডাকেনি, ছোটবেলা থেকেই তাকে ‘তুমি’ সম্বোধন করে এসেছে।

তিতির মাথা নেড়ে জানাল তিনদিনের জন্য অরিন্দমের সফরসঙ্গী হতে তার কোনও অসুবিধে নেই।

১৭

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছিল তিতিরের। এসে দেখল ঘরের আলো নিভিয়ে রুমি নিজের বিছানায় শুয়ে আছে চুপ করে। সাধারণত এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে এমবিএ এন্ট্রান্সের পড়াশুনা করে রুমি, তার এই অসময়ে শুয়ে থাকাটা তিতিরের অদ্ভুত লাগল। ঘরের আলো জ্বালাতেই চোখ কুঁচকে তাকাল রুমি, তিতির দেখল রুমি কাঁদছে, রুমি একটু নরম প্রকৃতির, কিন্তু তাকে কখনও চোখের জল ফেলতে দেখেনি তিতির, অবাক হয়ে জিগ্যোস করল, ‘কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?’

রুমি জানাল সে আজ ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেছিল, তখন দেখেছে তার ওয়ালেটে এটিএম কার্ডটা নেই। এর পর ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছে এটিএম কার্ডটা কেউ একটা ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা কেউ তুলে নিয়েছে, তার অ্যাকাউন্টে এখন মাত্র একশো তেত্রিশ টাকা পড়ে আছে।

অবাক হয়ে তিতির বলল, ‘মানে! তোর এটিএম কার্ড চুরি গেল কী করে? আর যদি চুরি গিয়েও থাকে, কেউ এটিএম থেকে টাকা তুলবে

কী করে? তোর পিন নম্বর তুই ছাড়া আর কে জানবে?’

রুমি চুপ করে তাকিয়ে রইল তিতিরের দিকে। তারপর বলল, ‘আমার মনে হয় পূজা। ও সম্ভবত আমার পিন নম্বরটা জানত।’

‘পূজা! তোর পিন নম্বর পূজা জানবে কী করে? ওর সঙ্গে তো তোর যোগাযোগ নেই বললেই হয়। আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা হয়, কিন্তু আমিও আজকাল ওকে এড়িয়ে চলি!’

রুমি মাথা নেড়ে বলল, ‘তুই অফিসে ছিলি, এর মধ্যে একদিন পূজার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। শপিংমলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শপিং করতে এসেছিল। আমিও শপিং করব বলে গেছিলাম সেখানে।’

‘তারপর?’

‘ওখানে এটিএম থেকে আমি টাকা তুলেছি। টাকা তোলার সময়ে পূজা আমার সঙ্গে এটিএম কাউন্টারে ঢুকেছিল। পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়ে আমি কী পিন দিচ্ছি নিশ্চয় দেখেছে, আমি বুঝতেও পারিনি।’

পুরো জিনিসটা অবিশ্বাস্য লাগল তিতিরের। জিগ্যেস করল, ‘কিন্তু ও তোর কার্ডটা পেল কী করে? কার্ডটা কোথায় রাখিস তুই?’

‘কার্ডটা আমার ওয়ালেটে থাকে। সেদিনের পরে আর ব্যবহার করিনি। পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা পূজা এখানে এসেছিল। এসে বলল, এখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাই আমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ওয়ালেটটা আমার ড্রয়ারে ছিল, ওখান থেকে টাকা বার করে ইস্তিরিওয়ালাকে টাকা দিয়েছি। তারপর পূজার জন্য কফি বানাতে রান্নাঘরে গেছিলাম, সেই সময়ে মনে হয়...’

তিতির স্তব্ধ হয়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘ব্যাঞ্জে গিয়ে কী খবর পেলি?’

রুমি বলল, ‘গতকাল তিনবারে সব টাকা তুলে নিয়েছে, কিছু রাখেনি...’

রুমির চোখ জলে ভরে এসেছে। বলল, ‘আই জাস্ট কান্ট বিলিভ দিস। নিজের বন্ধুরা যদি এরকম করে, আমি কাকে ট্রাস্ট করব বল?’

তিতিরের মনটা খারাপ হয়ে উঠছে ক্রমশ। মাত্র কয়েকদিন আগেই রুমি তাকে প্রয়োজনে টাকা ধার দিয়েছে, সে কথা মনে পড়ে গেল তিতিরের। পূজার কিসে টাকা লাগল যে তাকে চুরি করতে হল এইভাবে? পূজা তো যথেষ্ট রোজগার করে বলে নিজের মুখে বলে, একেকদিন

মডেলিং করেই সে নাকি অনেক টাকা পায়। তিতির তো মাস চালাচ্ছে দশ হাজার টাকায়, পূজা একসঙ্গে এতগুলো টাকা দিয়ে কী করবে?

তিতির জানে রুমি মাস চালায় মা'র পাঠানো টাকায়। তার যেহেতু খরচ কম সেই জন্য একটু-একটু করে তার ব্যাঙ্কে সে টাকা জমিয়ে রাখতে পারে। এ ছাড়া ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষার ফি বাবদ সাত হাজার টাকা তার মা পাঠিয়েছে কয়েকদিন আগে, সেই টাকাটাও রুমির ব্যাঙ্কে জমা ছিল। এখন এই অবস্থায় তাকে আবার মা'র কাছে হাত পাততে হবে। তিতিরের কাছে টাকাকড়ি জমে না একটুও, রুমিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা তিতিরের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিতির বলল, 'মা'কে বলেছিঁস?'

'ফোন করেছিলাম। মা খুব রেগে গেছে। আমাকে ইরেসপন্সিবল বলে গালি দিয়েছে। বলেছে পুলিশে কমপ্লেন করতে। কী করব বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় আন্টি ঠিকই বলেছেন। পুলিশে কমপ্লেন করা উচিত।'

'আমি এখানকার থানায় গেছিলাম। ওরা বলল এখানে কমপ্লেন নেবে না। যে এটিএম থেকে টাকা তোলা হয়েছে সেখানকার থানায় গিয়ে ডায়রি করতে হবে।'

'কোথা থেকে টাকা তোলা হয়েছে তুই জানিস?'

'জানি। ব্যাঙ্ক থেকে বলেছে আমায়। যাদবপুরের কাছে দুটো এটিএম থেকে।'

টাকাটা যে পূজা নিচ্ছে তাতে এখন আর সন্দেহ রইল না তিতিরের। যাদবপুরেই পূজার বাড়ি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ওখানকার থানাতেই যাব। কাল সকালে আমি আর তুই গিয়ে থানায় ডায়রি করে আসব। কাল বিকেলে আমায় বেরোতে হবে, তার আগে পুলিশের ঝামেলাটা মিটিয়ে নিতে হবে।'

'কাল বিকেলে বেরোতে হবে? কোথায় যাবি তুই?'

তিতির হাসল। তারপর বলল, 'অরিন্দমদার সঙ্গে তিন দিনের ডিস্ট্রিক্ট টুর। আয়াম অন টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাউ। অরিন্দম মুখার্জির সঙ্গে তিনদিন কাটাব, জাস্ট ভাবতেই পারছি না। হি ইজ সো সেক্সি, ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

মুখ বেঁকিয়ে রুমি বলল, ‘সেক্সি না মুন্ডু। হি ইজ হ্যান্ডসাম, কিন্তু সেক্সি দেখতে এ কথাটা মানতে পারছি না আমি।’

রুমির পেটে একটা খোঁচা মেরে তিতির বলল, ‘কোন ছেলে সেক্সি, কে নয়, তুই বুঝবি কী রে?’ তারপর হাসতে-হাসতে যোগ করল, ‘অরিন্দমদা যদি আমায় শুতে বলে আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাব, বুঝলি কিছু? এনিথিং ফর অরিন্দম মুখার্জি উ-উফ...’

সারা রাত্তির ঘুমোল না তিতির। রুমির সঙ্গে শুয়ে-শুয়ে গল্প করল। নিজের কথা, নিজের বাবার কথা, মা’র কথা। শঙ্করলালের সঙ্গে মা’র সম্পর্কের কথা বলবে না বলবে না করেও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল রুমিকে। কোনও-কোনও সময়ে নিজের গোপন সব কথা কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে মানুষের ইচ্ছে করে। তিতিরের আজ অনর্গল রুমির সঙ্গে কথা বলে যেতে ইচ্ছে করছিল।

রুমির সঙ্গে তিতিরের জীবনের একটা মিল আছে। তিতির এবং রুমির মা দুজনেই একা হাতে মানুষ করেছে তাদের মেয়েদের, দুজনেই বাবার সাহচর্য পায়নি বিশেষ। রুমির বাবা গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিলেন, রুমির তখন মাত্র ছ’বছর বয়স। রুমির বাবা সিআইএসএফ-এর অফিসার ছিলেন, তিনি মারা যাওয়ায় কমপেন্সেশন হিসেবে সিআইএসএফ এই চাকরি জুটে গেছিল রুমির মা’র। চাকরিসূত্রে রুমির মা এখন গুয়াহাটিতে পোস্টেড, পড়াশুনার সুবিধের জন্য ক্লাস ইলেভেন থেকেই রুমি এসে রয়েছে কলকাতায়। একা জীবনযাপনে রুমি এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তিতিরের বাবা অবশ্য অত ছোটবেলায় মারা যায়নি। তিতিরের বাবার মৃত্যু হয়েছে যখন সে ক্লাস টেনে পড়ে। তার অনেক আগে থেকেই বাবা এবং মায়ের সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে, মা উত্তর কলকাতায় বাবার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তিতিরকে নিয়ে চলে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার ভাড়ার বাড়িতে। সস্তায় জোকার কাছে জমি কিনেছে তারপরে, একটা সময়ে সেই বাড়িতে চলে গেছে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। ওই সময় থেকেই তিতির বুঝতে শিখেছে তার জীবনে বাবা থেকেও নেই, বরং অনেক বেশি করে রয়েছেন শঙ্করলাল বলে এক গুরুত্বপূর্ণ ভদ্রলোক।

বাবা মানুষটা কেমন তা বোঝার সুযোগ পায়নি তিতির কখনও। সব সময়েই তাকে বলা হয়েছে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। তিতিরের

বাবা বাউডুলে, নেশাখোর—এই ধরনের মানুষের সঙ্গে সভ্য সমাজের কারও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। বাবা মাঝে-মাঝে বাড়িতে ফোন করে তিতিরের সঙ্গে কথা বলতে চাইত, বাবার সঙ্গে কথা বলা বারণ ছিল তিতিরের। কখনও-কখনও মা বাড়ি না থাকলেও বাবা ফোন করত, সেই সময়েও মা'র ভয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলত না তিতির। মা জানতে পারলে ভীষণ রাগারাগি করবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল তিতির।

ওই সময়ে তিতির মা'কে একটু-একটু করে দূরে চলে যেতে দেখেছে। অফিসের কাজের ব্যস্ততা, মাঝে-মাঝে অফিসের কাজে ট্যুরে যাওয়া। সেইসঙ্গে মা'র সঙ্গে শঙ্করলালের অবৈধ সম্পর্ক। ছোটবেলায় ওই সম্পর্কের কথাটা ভালো করে না বুঝলেও পরে একটু-একটু করে বোধগম্য হয়েছে তিতিরের। আস্তে আস্তে নিজেকে আরও একা বলে মনে হয়েছে তার। বাড়ি ছেড়ে আসার সময়ে সেই কারণে একটুও দুঃখ হয়নি তিতিরের। সে তো একাই থাকত বাড়িতে, বাইরে এসে নতুন করে আর কী একা হওয়ার আছে তার!

মা'র সঙ্গে বাবার ডিভোর্স হয়নি। মা যে কেন বাবার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রটুকু বজায় রেখেছিল, তা এখনও বোঝে না তিতির। একটা বয়সের পর বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ এই বিষয়গুলো হয়তো সত্যিই ম্যাটার করে না। শঙ্করলালও তো মা'র জন্য বিবাহবিচ্ছেদ করে মা'কে বিয়ে করার কথা ভাবেনি, সেও তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আইনগতভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না করেই।

কিংবা হয়তো বাবার প্রতি ভালোবাসার একটা ছিটেফোঁটা রয়ে গেছিল মা'র মনের মধ্যে। কম বয়সে বাবার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল মা, সেই কম বয়সের ভালোবাসার কথা মা হয়তো কোনওদিন ভুলতে পারেনি। পরিস্থিতির ফেরে বাবাকে ছাড়তে হয়েছে মা'র, কিন্তু হয়তো বাবাকে সত্যিই ভালোবাসত শেষ দিন পর্যন্ত। ভালোবাসা একেবারে না থাকলে বাবার দুঃসবাদটা পেয়ে ওই রকমভাবে কি মা ডুকরে কেঁদে উঠতে পারত?

রুমির বাবার মতো, তিতিরের বাবারও মৃত্যু হয়েছিল গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক রাতে রাস্তা পার হওয়ার সময়ে একটা গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল বাবাকে। খবরটা এসেছিল টেলিফোনে, তাদের জোকার বাড়িতে। মা সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে সরকারি সফরে, তিতির তার

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়াশুনা করছিল। রাতের নিস্তন্ধতা খান খান করে বসার ঘরে ফোন বেজে উঠেছিল। ফোন করেছিল বাবার কোনও এক বন্ধু, জানিয়েছিল বাবার অবস্থা ভালো নয়, তাকে একটা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খবরটা পেয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল তিতির। যার সঙ্গে তাদের বাড়ির সম্পর্ক নেই, তার একটা খারাপ খবরে কী ভাবে রি-অ্যাক্ট করবে বুঝতে পারছিল না তিতির; ভেবে পাচ্ছিল না এত রাতে ফোন করে মাকে খবরটা তার জানানো উচিত হবে কি না।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত মা'র মোবাইলে ফোন করেছিল তিতির। ফোনটা ধরেছিলেন শঙ্করলাল। তিতিরের কথা শুনে মা'কে ফোনটা দিয়েছিলেন। এবং পরের দিন সরকারি সফরের মাঝপথে মা চলে এসেছিল কলকাতায়। শঙ্করলালের যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে বাবাকে সরকারি হাসপাতালের আই সি ইউতে ট্রান্সফার করা হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার। মা'কে সেই সময়ে বাবার জন্য কাঁদতে দেখেছে তিতির।

বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলা বারণ ছিল তিতিরের, কিন্তু মা'ই তিতিরকে নিয়ে গেছিল হাসপাতালে বাবার সঙ্গে দেখা করাতে। ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভরতি ছিল বাবা, তার পাশে বসে বাবার হাতটা হাতে তুলে নিয়ে মা কেঁদেছিল। তিতির বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বেডের পাশে, চুপ করে। বাবার চোখ বন্ধ ছিল, তিতিরের সঙ্গে তার চোখাচুখি হতে পারেনি। তিতির বারবার করে চেয়েছিল বাবা চোখ খুলুক একবার। তার মনে হচ্ছিল চোখ খুলে বাবা তাদের দুজনকে দেখতে পাবে। তারপর যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে, বাবা ফিরে আসবে তাদের জীবনে।

বাস্তবে তা হয়নি। সাতদিন হাসপাতালে ছিল বাবা, তারপর এক সময়ে মৃত্যু হয়। ভোররাতে হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর খবর এসেছিল। তিতিরকে শ্মশানে যেতে হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও মৃত্যুর পরে মুখাঙ্গি করার অধিকার বর্তেছিল একমাত্র তারই ওপর।

নিজের কথা রুমিকে বলে যাচ্ছিল তিতির আপনমনে। তার কণ্ঠস্বরে কোনও আবেগ ছিল না, সে যেন নিজের কথা নয়, অন্য কারও

জীবনবৃত্তান্ত বলে চলেছে। রুমি কিন্তু তিতিরের কথা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেছিল। তারপর একটা সময়ে বলেছিল, ‘আমরা কেন অন্যদের মতো স্বাভাবিক হতে পারলাম না রে তিতির? মনে হয়, আমাদের জীবনের ওপর সব সময়ে একটা অভিশাপ লেগে রয়েছে। আমাদের জীবন কখনও ঠিক হবে না?’

তিতির চুপ করে বসে রইল। সত্যি কি তাদের জীবনটা অভিশাপ? নাকি আসলে প্রত্যেকের জীবনই নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কাটে, সেটা কোনওরকম ব্যতিক্রম নয়? নিজের প্রতি দুঃখবোধ এক ধরনের সেলফ ইন্ডালজেন্স, অভিশাপকে দোষ দিয়ে নিজেকে করুণা করা কোনও কাজের কথা নয়। যা আছে, তার মধ্যেই নিজের জীবন গড়ে নেওয়া সম্ভব, তিতির স্বাধীনভাবে সেটাই তৈরি করবে একটু-একটু করে।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে তার তামাক অ্যাশট্রে'র মধ্যে ফেলে দিল তিতির। তারপর মন দিয়ে তাতে গাঁজার তামাক ভরল। গাঁজা ভরা তামাকটা ধরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধোঁওয়া বুকের মধ্যে চেপে রাখল তিতির। রুমির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘খাবি নাকি একটু? খেলে বেশ নেশা হয়, সবকিছু ভুলে থাকা যায়। কারও ওপর রাগ করতে ইচ্ছে করে না আর।’

তিতির আজ সারাদিন ধরে নেশা করেছে। তার স্টকের গাঁজা ফুরিয়ে গেছিল, সে কারণে অরিন্দমের সঙ্গে মিটিং শেষ করে রাত ন’টার সময়ে সে অর্কর বাড়ি গেছিল। তিনদিন সে কলকাতায় থাকবে না, এক প্যাকেট সঙ্গে না থাকলে তিতিরের অসুবিধে হত। অর্ককে টাকা দিয়ে তার থেকে একটা বড় প্যাকেট তুলে নিয়েছে তিতির, তিনদিন এই দিয়ে দিব্যি চলে যাবে। নেশার ঘোরটা সব সময়ে মাথার মধ্যে জিইয়ে রাখতে চায় তিতির, সে দেখেছে বেঁচে থাকার এই এক অদ্ভুত পন্থা।

রুমি সিগারেট পর্যন্ত খায় না, তিতিরের কথায় হেসে বলল, ‘আমি খাব না।’

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘তুই কিন্তু বড্ড বেশি খাচ্ছিস তিতির। অ্যাডিকশন হয়ে যাচ্ছে তোরা। দিস ক্যান বি আ বিগ ট্রাবল লেটার অন।’

তিতির হাসল। সিগারেটে আবার একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, ‘আর কী ট্রাবল হবে আমার জীবনে? এই অ্যাডিকশন ছাড়া বেঁচে থাকা মুশকিল

হত আমার। আই অ্যাম আ ক্রিয়েটিভ পার্সন, আমি তোর মতো নর্মাল হতে পারব না কোনওদিন। নেশা করলে আমার মাথা খোলে। আজ সে কারণে নতুন প্রোপোজাল দিতে পেরেছি, সেই প্রোপোজাল অরিন্দম মুখার্জি নিজে অ্যাপ্রভ করেছে, বুঝলি?’

রুমি কিছু বলল না, চুপ করে তাকিয়ে রইল তিতিরের মুখের দিকে।

তিতিরও চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপর হাসতে হাসতে বলল, ‘তোর আর আমার মধ্যে অনেক তফাত। তুই ম্যানেজমেন্ট পড়ে বিরাট অফিসার হবি, কর্পোরেট লাইফ কাটাবি। আমার ওইরকম কোনও অ্যাম্বিশন নেই। জাস্ট নিজের মতো করে থাকতে চাই, ইন মাই ওন লিটল ওয়ার্ল্ড। এর বেশি কিছু চাই না আমি।’

১৯

বাংলা সিনেমা নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামায়নি তিতির, অরিন্দম মুখার্জির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না। বর্ধমানে পৌঁছে তিতির চমকে গেল, সিনেমা হলে ঢোকার মুখে কয়েক হাজার লোক, তারা অরিন্দমকে এক বলক দেখবে বলে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে!

ভিড় দেখে অরিন্দম খুশি হল, কিন্তু মুখে এমন একটা ভাব করল যেন এই ভিড়ে তার খুব অসুবিধে হচ্ছে। রাত আটটার সময়েও চোখে একটা সানগ্লাস পরে নিল অরিন্দম—ভাবটা এমন যে সানগ্লাস পরা থাকলে লোকে তাকে চিনতে পারবে না। অরিন্দমের সানগ্লাসটা ভালো করে নজর করল তিতির। দামি বিদেশি ব্র্যান্ড, এই সানগ্লাসটার দাম প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হবে। কয়েকদিন আগে এই ব্র্যান্ডের সানগ্লাসের দাম ইন্টারনেটে দেখেছিল তিতির।

সানগ্লাসটা পরে তিতিরের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, ‘এই ভিড় ঠেলে সামনের হলটায় ঢুকতে হবে। পারবি তো?’

সংশয়ের চোখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দিল তিতির, তাকে ইতস্তত করতে দেখে অরিন্দম বলল, ‘গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে মারা যাবি। লোকে এসে জানলার কাচের ওপর দুমদুম করে আওয়াজ করবে,

তিষ্ঠাতে পারবি না এখানে!’

তারপর তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘টুপিটা পরে নে। আমার সঙ্গে নাম। আমার হাত শক্ত করে ধরে থাকবি, ভিড়ের মধ্যে ছিটকে গেলে মুশকিলে পড়বি কিন্তু!’

দুপুরবেলা রোদের মধ্যে বেরিয়েছিল তিতির, সেই জন্য সে মাথায় একটা টুপি পরে নিয়েছিল আজ। সকাল থেকে তার অনেক ঘোরাঘুরি গেছে, সকাল সকাল সে রুমির সঙ্গে থানায় গেছিল এফ আই আর করতে। থানায় গিয়ে অবাধ হয়েছিল তিতির, থানা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ধারণা থাকে তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই! থানার মতো দেখতে নয় জায়গাটা, বরং ব্যাক্সের অফিসের মতো দেখতে অনেকটা। পুরো থানাটা সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশনড, তিতিরদের অপেক্ষা করতে হয়েছে সোফায় বসে, কর্পোরেট অফিসে যেমন করতে হয়। তিতির শুনেছিল, রাজ্যের কয়েকটা থানাকে নাকি এখন মডেল থানা হিসেবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, এই থানাটা তার মধ্যে একটি।

সাজানো-গোছানো জায়গা হলেও থানার কর্মচারীরা অবশ্য কাজ করতে যথারীতি অনেক সময় নেন। সে কারণে থানায় অনেক সময় লেগে গেছিল, পুলিশ অফিসারেরা রুমি এবং তিতিরকে অনেক জেরা করেছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। ওদের ভাবটা এমন ছিল যেন এটিএম থেকে টাকা চুরি যাওয়ার জন্য রুমিরাই দায়ী।

থানা থেকে বাড়ি ফিরে কোনওরকমে স্নান সেরে, সামান্য কিছু খেয়ে, একটা ছোট ব্যাগে কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তিতির। চারটের সময় অফিসের সামনে থেকে তাকে অরিন্দমের গাড়ি পিক-আপ করে নিয়েছে। অরিন্দমের সঙ্গে একই গাড়িতে করে বর্ধমান এসেছে তিতির, অন্য একটা গাড়িতে আছে ডিরেক্টর প্রভঞ্জনবাবু আর এই ছবির প্রযোজক, পরিবেশক প্রেমাংশু দাগা—তাদের সঙ্গে শক্তিগড়ের কাছে একটা ধাবায় চা খেতে দাঁড়িয়ে দেখা হয়েছে তিতিরের। সেই সময়ে আর একটা গাড়িতে করে সিনেমার হিরোইন রূপালি আসছে বলে শুনেছে তিতির, কিন্তু তার গাড়ি এখনও সে দেখতে পায়নি।

কোনওদিনই সাজগোজের দিকে ঝোঁক নেই তিতিরের। রোজকার মতো আজও তার পরনে জিনস এবং টি-শার্ট। টি-শার্টটা অবশ্য নতুন

কিনেছে তিতির, আজই প্রথমবার পরল। লাল রঙের টি-শার্ট, বুকের ওপর সাদা দিয়ে লেখা 'ফ্র্যাংজাইল—হ্যান্ডল উইদ কেয়ার।' এই লেখাটা দেখে মজা লেগেছিল বলেই একটা দোকানে ঝুলতে থাকা টি-শার্টটা টুক করে কিনে নিয়েছিল তিতির। টি-শার্টটা দেখে অরিন্দমেরও মজা লেগেছে বলে মনে হয়েছে তিতিরের। কারণ আজ গাড়িতে ওঠার পরেই অরিন্দম এক ঝলক তার বুকের দিতে তাকিয়ে নিয়েছিল। তারপর অরিন্দমের মুখে যে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তা চোখ এড়ায়নি তিতিরের। ভেতরে ভেতরেও সেও হেসেছিল, টি-শার্টে কিছু লেখা থাকলে যে-কোনও ছেলেই একটি মেয়ের বুকের দিকে তাকায়; অরিন্দম মুখার্জিও যে তার ব্যতিক্রম নয় তা সে দিব্যি বুঝতে পেরেছে আজ।

ভিড়ের মধ্যে গাড়িটা আটকে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে, সামনের দিকে আর এগোনো সম্ভব নয়। ড্রাইভার বিপিন দীর্ঘদিন অরিন্দমের সঙ্গে রয়েছে, সে এইরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অভ্যস্ত। ওই ভিড়ের মধ্যেই অ্যাক্সিলেটর টিপে গাড়িটা থেকে গোঁ গোঁ করে ভয়ানক শব্দ বার করতে লাগল বিপিন, ভাবটা এমন যে এখনই স্পিড তুলে সে লোকজনকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে যাবে। গাড়ির ওই ভয়ানক গর্জনে কাজও হল, গাড়ির সামনের দিক থেকে লোক ক্রমে সরতে লাগল, গাড়ি একটু-একটু করে এগিয়ে চলল হলের একেবারে সামনের দিকে।

এখন গাড়ির কালো কাচের ভিতর থেকে হলের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। হলটা আলো দিয়ে সাজানো, বাইরে সিনেমার বিরাট হোর্ডিং। সেই হোর্ডিং থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম, তার হাতে একটা পিস্তল। কপালের কাছটা ফেটে গেছে অরিন্দমের, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওই অবস্থাতেই অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরেছে নায়িকা রূপালি, সে অরিন্দমকে শুশ্রূষা করার পরিবর্তে ক্যামরার দিকে তাকিয়ে লাস্যময়ী হাসি দিচ্ছে।

নিজের বিরাট হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে একবার দেখল অরিন্দমও। সে নিজের এই ধরনের বিরাট হোর্ডিং দেখে অভ্যস্ত, তার মুখে এই ছবি দেখে কোনও ভাবান্তর হল না। হোর্ডিং থেকে চোখ নামিয়ে সে একবার গাড়ি থেকে হলের দূরত্বটুকু মাপল মনে মনে, সেইসঙ্গে চারিপাশের ভিড়ের চেহারাটা একবার দেখে নিল। তারপর বিপিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর এগোতে পারবে বলে মনে হয় না!'

বিপিন ঘাড় নাড়ল, গাড়ি নিয়ে সত্যিই আর এগোনো সম্ভবপর নয়। তারপর বলল, ‘পারবেন দাদা, এইটুকু যেতে?’

অরিন্দম বলল, ‘পারব।’

অরিন্দমের কথা শুনে গাড়ির অ্যাক্সিলারেটরে গোঁ-গোঁ শব্দ করে আওয়াজ তুলল বিপিন, তারপর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের দিকের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। তিতিরের হাতটা ধরে এক ঝটকায় গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল অরিন্দম, তারপর বলল, ‘আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসবি।’

বিপিন গাড়ি চালানোর সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয় অরিন্দমের বডিগার্ডের কাজও করে। সে তার হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে নিয়েছে। লাঠিটা অনেকটা পুলিশের লাঠির মতো দেখতে, সম্ভবত গাড়ির সামনের সিটে কোথাও রাখা ছিল। ওই লাঠি দিয়ে অল্প করে ঠেলে-ঠেলে ভিড় সরিয়ে জায়গা করতে লাগল বিপিন, সেই জায়গা দিয়ে একটু একটু করে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল অরিন্দম। অরিন্দম ভিড়ের মধ্যে কারও দিকে তাকাচ্ছে না, সে শুধু শক্ত করে তিতিরের হাতটা চেপে ধরে আছে।

অরিন্দমকে দেখে ভিড় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ভিড়ের মধ্যে অবিরাম ‘গুরু, গুরু’ বলে ধ্বনি উঠেছে। দুয়েকজন হাত বাড়িয়ে অরিন্দমকে ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যারা কাছে রয়েছে তারা অরিন্দমের গায়ে হাতও দিচ্ছে—বোধহয় দেখার চেষ্টা করছে এই রূপোলি পরদার নায়ক আসলে কতটা রক্তমাংসের মানুষ। তিতিরকে তারা কী ভাবছে কে জানে, তিতিরকেও লোকে ছুঁয়ে দেখতে চাইছে। কে একজন তিতিরের একটা হাত খিমচে দিল, তিতির কোনওরকমে তার হাত ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল।

কলকাতার ভিড়ের বাসে অনেক লোকেই তিতিরের গায়ে হাত দেয়। সেখানে তিতির ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা শোনাতে ছাড়ে না সেইসব লোকেদের। এখানে ভিড়ের যা নমুনা, তাতে তার উপায় নেই। তা ছাড়া অরিন্দম তাকে বাচ্চা ছেলেদের যেভাবে ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যায়। সেভাবে হিড়হিড় করে সামনের দিকে টানছে ভিড়ের মধ্যে কে তার গায়ে হাত দিয়েছে তা ঘুরে দেখার কোনও উপায় নেই তিতিরের! সে শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য অরিন্দমের গা ঘেঁষে এল। অপরিচিত মানুষের শরীরের ছোঁওয়া

থেকে অরিন্দমের শরীরের স্পর্শ তার কাছে অনেক শ্রেয়।

বিপিনের করে দেওয়া পথ ধরে অরিন্দম অনেকটা সরীসৃপের মতো এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে, তিতিরের কানে আসছে ভিড়ের মধ্যকার নানান টুকরো-টুকরো মন্তব্য। বেশির ভাগ কথাই অরিন্দমকে ঘিরে, একজন-দুজন তিতিরকে নিয়েও মন্তব্য করছে। তিতিরকে দেখিয়ে একজন বলল, ‘সঙ্গে এটা কে রে? হিরোইন? নাম কী?’

তার উত্তর এল, ‘হিরোইন নয়। বউ মনে হয়। ভালো দেখতে মাইরি, অরিন্দমদার চয়েস আছে।’

তিতিরের হাসি পেল, সেইসঙ্গে তার কান লাল হয়ে উঠল একটু। সে আরও ঘনিষ্ঠ হল অরিন্দমের। ভিড় থেকে তাকে আড়াল করতে অরিন্দম তিতিরের কাঁধে দিয়ে তাকে আরও কাছে টেনে নিল। এবং তারপরই সিনেমা হলের গেটের সামনে পৌঁছে গেল। এক লাফে সিঁড়িতে উঠল অরিন্দম, তিতিরকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা হলের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ভিতরে কাঁচুমাচু মুখে অপেক্ষা করছিলেন হলের ম্যানেজার, অরিন্দমকে দেখে বিব্রত হয়ে বললেন, ‘আপনি আসবেন এই খবরটা কী করে যেন রটে গেল। এত ভিড় হবে বুঝতে পারিনি, পুলিশ বলে রাখলে ভালো করতাম।’

পুলিশের বিষয়টায় পাত্তা দিল না অরিন্দম। তিতিরের মনে হল ফ্যানদের ভিড় ঠেলে হল পর্যন্ত আসতে তার বেশ মজা লেগেছে। তিতিরের অত কিছু ভালো লাগেনি ব্যাপারটা, সে ঘেমে গেছে ইতিমধ্যেই। ভিড়ের মধ্যে তার একটু-একটু টেনশনও হচ্ছিল, এখন সে হাঁপাচ্ছে সামান্য। তিতিরের দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে সানপ্লাসটা খুলে নিল অরিন্দম। একটু হেসে জিগ্যেস করল ‘কী রে, ঘাবড়ে গেছিস?’

তিতির একটু হেসে বোঝানোর চেষ্টা করল সে ঘাবড়ায়নি। অরিন্দম এখনও তিতিরের হাতটা ধরে আছে, সেই হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে বলল, ‘এরকম হয়। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই।’ তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে বলল, ‘আপনার ঘরে চলুন। এই মেয়েটার জন্য কোন্ড ড্রিন্ks বলুন। আর আমাকে চা দিন। আপনাদের ওই অসাধারণ বর্ধমান টি। ওটা খাব বলেই এতদূরে এসেছি।’

হলের ম্যানেজার হাসলেন। তারপর বললেন, ‘সব রেডি আছে। একটু জলখাবারও খাবেন চলুন...।’ তারপর তিতিরের দিকে কৌতূহলী হয়ে

তাকালেন। তিতিরের সঙ্গে অরিন্দম ম্যানেজারের পরিচয় করিয়ে দেয়নি, সে কারণে ম্যানেজারের সম্ভবত তিতির কে তা নিয়ে কৌতূহলী। অরিন্দম সেটা বুঝতে পেরেছে মনে হল, কিন্তু তাও তিতিরের সঙ্গে পরিচয় করাল না। ম্যানেজার একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, ‘আপনি কী কোন্ড ড্রিস্ক খাবেন? অরেঞ্জ না লেমন?’

তিতির হেসে বলল, ‘আমিও চা খাব। কিন্তু তার আগে একটু বলবেন টয়লেটটা কোথায়?’

তিতিরের এখন টয়লেট যাওয়া সত্যিকারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেটা প্রাকৃতিক কারণে নয়। অরিন্দমের সঙ্গে গাড়িতে করে সে এসেছে প্রায় আড়াই ঘণ্টা, এই সময়টুকুতে সে তার নেশার বস্তু আত্মদান করতে পারেনি। সকাল থেকে রুমির সঙ্গে পুলিশের চক্রে গিয়ে আজ সারাদিনে মাত্র দুটো জয়েন্ট খেয়েছে সে। তার শরীর নেশা চাইছে এখন। মাথার মধ্যে ঝিমঝিমে নেশাটা থাকলে ভিড়ের মধ্যে কষ্ট হত না তিতিরের, অরিন্দমের স্পর্শটাও তার আরও ভালো লাগত।

ঠিক এইরকম সময়ে হালকা একটা চিন্তা মাথায় উঁকি দিয়ে গেল তিতিরের। সে আজ সকাল থেকে নেশা করতে পারেনি বলে তার শরীরে অদ্ভুত একটা আকুতি তৈরি হয়েছে। রুমি তাকে গতকাল রাতে অ্যাডিকশনের ব্যাপারে সাবধান করেছিল। সে কি গাঁজার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে? মাথা থেকে জোর করে এই চিন্তাটা সরিয়ে রাখল তিতির। সে নেশা করেনি বলে যাবতীয় উদ্বেগগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে। এর বিহিত করতে গেলে এখনই একটা জয়েন্ট খাওয়া প্রয়োজন।

সিনেমা হলের প্রোগ্রাম শেষ হতে হতে প্রায় দশটা বেজে গেল। সঙ্কে সাতটার সময়ে শো শুরু হয়েছে, সিনেমা শেষ হল ন’টা কুড়ি নাগাদ। শো শেষ হওয়ার একটু আগে সবাই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ঢুকে সামনের দিকের একটা সিটে বসল। ছবির শেষাংশটি দেখতে পেল তিতির। বাংলা মেনস্ট্রিম ছবি দেখার অভিজ্ঞতা বিশেষ নেই তিতিরের, কখনও কখনও টিভিতে সে অরিন্দমের সিনেমা দেখেছে; হলের চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে গেল!

বাংলা সিনেমা সম্পর্কে বরাবর এক ধরনের উন্মাসিক মনোভাব পোষণ করে এসেছে তিতির, সিনেমা হলের দর্শক কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে হই হই করে উঠছে—মুহুমুহু সিটি পড়ছে, হাততালির আওয়াজে কান

পাতা দায়। ছবিতে অরিন্দম ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই, দর্শক অরিন্দমকে দেখবে বলেই হলে এসেছে, এখন সিনেমা দেখতে দেখতে পয়সা উশুল করে নিচ্ছে।

অরিন্দম আসবে বলে হলের বাইরে যেমন উপচে পড়া ভিড়, হলের মধ্যেটাও তেমনি কানায় কানায় ভরতি। সপ্তাহের মধ্যে আজ শো হাউসফুল হয়েছে এতে হলের ম্যানেজার ভীষণ খুশি। শো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা করে দেওয়া হল অরিন্দম মুখার্জি এসেছে, দর্শকের সঙ্গে কথা বলবে। হলের দর্শক অপেক্ষা করতে লাগল, অরিন্দম আর রূপালি স্টেজে উঠে দর্শকদের অভিবাদন করল করজোরে। রূপালি কলকাতা থেকে আসেনি, সে শান্তিনিকেতনে শুটিং করছিল, এই হলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে বলে শুটিং শেষ করে সে গাড়ি নিয়ে বর্ধমানে এসেছে। সিনেমার পরিচালক প্রভঞ্জনবাবুও স্টেজে উঠল, দর্শককে উদ্দেশ্য করে হলের চেহারা দেখে, অরিন্দমের জনপ্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে গেল তিতির। বাংলা সিনেমা সম্পর্কে তার জ্ঞান খুব সীমিত, এর পর থেকে সে মন দিয়ে বাংলা মেনস্ট্রিম সিনেমা দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

অনুষ্ঠান শেষ করার পর হলের ম্যানেজার বারবার করে রাতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে লাগলেন। রূপালির পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, তার ভোরবেলা থেকে শুটিং আছে। অনুষ্ঠানের ঠিক পরেই সে গাড়ি করে রওনা হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের দিকে। প্রভঞ্জনবাবু এবং প্রেমাংশুও বর্ধমানে থাকতে উৎসাহী নয়, তারা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পরের দিনের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেবে ঠিক করল। রূপালির গাড়ির সঙ্গে তাদের গাড়িও রওনা হয়ে গেল। রাতের বেলা গাড়ি করে শান্তিনিকেতন যাওয়া মানে আরও ঘণ্টা দেড়েকের ধাক্কা, অরিন্দম রাতের বেলা আর পরিশ্রম করতে রাজি নয়। সে সকালে উঠে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পক্ষপাতী, তিতিরকে সঙ্গে নিয়ে সে জেলা ভবনে চলে এল। এখানেই অরিন্দমদের থাকার ব্যবস্থা করে হয়েছে, সেই সঙ্গে পানভোজনেরও এলাহি ব্যবস্থা। অতিথি আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেনি হলের ম্যানেজার। অরিন্দম মুখার্জির তিনি খুব বড় ভক্ত—সে কথা বারবার করে ভদ্রলোক স্মরণ করাতে লাগলেন।

নিজের থাকার ঘরটা দেখে চমকে গেল তিতির। তার ধারণা ছিল

জেলা ভবনের ব্যবস্থাপনা খুব সাংঘাতিক কিছু হবে না, কিন্তু তাকে বিশাল একটা সুইটে থাকতে দেওয়া হয়েছে। একটা ঘরে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ভিতরে একটা শোওয়ার ঘর। শোওয়ার ঘরে দেওয়াল জুড়ে আয়না, সেই আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল তিতির। কলকাতা থেকে এতদূর জার্নি করে আসার ফলে তাকে ক্লান্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যদিও তার মন এতটুকু ক্লান্ত নয়, তার মনে হচ্ছে আজকের রাতটা অন্যরকম হবে। সে আজ সারা রাজ জেগে অ্যাডভেঞ্চার করতে উৎসাহী।

অরিন্দমের কথা মনে হল তিতিরের। সে শুনেছে অরিন্দম খুব নিয়মনিষ্ঠ একজন মানুষ, সে কি তিতিরের সঙ্গে সারারাত অ্যাডভেঞ্চার করতে রাজি হবে? অরিন্দমের সঙ্গে গাড়িতে অনেক গল্প করতে করতে এসেছে তিতির, অরিন্দমকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। গাড়িতে অরিন্দম টেলিভিশনের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছে, বলেছে তিতিরের কনসেপ্ট তার ভালো লেগেছে, ওই প্রোগ্রামের ব্যাপারে তার নিজের কিছু আইডিয়াও সে তিতিরের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। তিতিরের কনসেপ্ট থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে সে ওই প্রোগ্রামে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রূপালিকেও বিচারক করবে, প্রোগ্রাম পরিচালনা করার ভার দেবে প্রভঞ্জনদাকে। অরিন্দম বলেছে, ‘তুই ঠিকই বলেছিস, টেলিভিশনে সিনেমার লোকেরা কাজ করলে তার লুক অ্যান্ড ফিল পালটে যাবে। টেলিভিশনকে সিনেমাই সব থেকে বেশি টিআরপি দেয়, সিনেমার লোকে দিয়েই ওই টিআরপি উঠবে।’

অরিন্দমের বাকি কথাগুলোও খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তিতিরের। এক বছর ধরে রিয়েলিটি শো চলবে, সেই রিয়েলিটি শোয়ের মাধ্যমে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে বেছে নিয়ে তাদের সিনেমায় লঞ্চ করবে অরিন্দম। অরিন্দম মুখার্জির ব্যানারে সিনেমা তৈরি হবে বিজয়ী ক্যান্ডিডেট দিয়ে। এতে রিয়েলিটি শোয়ের মান বাড়বে, আর রিয়েলিটি শোয়ের বিজয়ীরা অন্যদের মতো হারিয়েও যাবে না ইন্ডাস্ট্রি থেকে। বস্তুত তিতিরের কথাটা মনে নিয়েছে অরিন্দম, সেটা ভেবে তিতিরের ভালো লাগতে শুরু করেছে। অরিন্দম মানুষটার মধ্যে একটা এক্স-ফ্যাক্টর আছে, আজ বর্ধমান শহরে তাকে ঘিরে উন্মাদনার বহর দেখে সেই ধারণাটা আরও দৃঢ় হয়েছে তিতিরের। এই মুহূর্তে অরিন্দমের কথা ভেবে তিতির উত্তেজিত হল মনে-মনে, অরিন্দমকে নিয়ে তার মাথায় নানারকম ফ্যান্টাসি

দানা পাকাতে শুরু করল একটু-একটু করে।

ভুরু কুঁচকে আয়নার দিকে তাকিয়ে তিতির নিজেকে দেখল আরও একবার। তারপর একটা জয়েন্ট ধরাল। অরিন্দমকে নিয়ে সে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে চায়, তার জন্য এখন আবার একটু নেশা করার প্রয়োজন আছে। একটুপরেই তাকে কেউ-না-কেউ ডাকতে আসবে অরিন্দমের সম্মানার্থে আয়োজিত পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য, তার জন্য এবার প্রস্তুত হতে হবে তিতিরকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের কথা ভাবতে-ভাবতে তিতির তার পোশাক খুলে ফেলতে লাগল একটা একটা করে। আজ দুপুরে সে ভালো করে স্নান করার সময় পায়নি, তার এখন একবার স্নান করা দরকার। স্নান করলে তার শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, সে সারারাত জেগে থাকতে পারবে অরিন্দমের সঙ্গে!

২০

খুব ছোটবেলায় একবার-দুবার মা'র সঙ্গে সরকারি পার্টিতে যেতে হয়েছে তিতিরকে। কিছুদিন আগে সে গেছিল কলকাতার এক অভিজাত হোটেলের লনে অরিন্দমের আয়োজিত একটা এলাহি পার্টিতে। বর্ধমানে অরিন্দমের জন্য আয়োজিত পার্টির সঙ্গে সেই সবার কোনও মিল নেই।

জেলা ভবনের বাইরের লনে আলো জ্বালিয়ে পার্টির ব্যবস্থা, সেখানে টেবল পেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু লোকজন বসে আছে। অনেক মহিলা অরিন্দমকে দেখবে বলে জমকালো শাড়ি পরে এসেছেন, বিসদৃশভাবে তাঁরা ভিড় করে রয়েছে অরিন্দমের সামনে। দুয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে, তাদের অবশ্য পার্টিতে উৎসাহ নেই, তারা দৌড়ে দৌড়ে নিজাদের মধ্যে খেলাধুলায় মত্ত। তিতিরের মনে হল শহরের গণ্যমান্য সরকারি অফিসারেরা তাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে এই পার্টিতে যোগ দিতে চলে এসেছেন। একটু দূরে বার কাউন্টারের কাছে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বর্ধমানের ওই হলের ম্যানেজার। তার মুখ দেখে মনে হয়, তিনি খুব টেনশনে রয়েছেন।

তিতির স্নান করে অল্প করে একটু সেজে নিয়েছে। ঠোঁটে অল্প একটু লিপস্টিকের আভা, তার টি-শার্ট জিনস ছেড়ে সে পরে নিয়েছে একটা

নীল রঙের চুড়িদার কুর্তা। একটু সেজেছে তিতির ইচ্ছে করেই, সে এই পার্টিতে অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল নিজের মতো করে। এই পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয়, অরিন্দমকে অনেক লোক যে ভাবে ঘিরে রেখেছে তাতে তার কাছে পৌঁছনোই একপ্রকার অসম্ভব। তিতির মনে মনে দমে গেল, সে শুকনো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লনের এক কোণে। এই পার্টিতে সে অরিন্দম ছাড়া কাউকে চেনে না, অরিন্দম ব্যস্ত হয়ে রয়েছে বলে তার মনে অভিমান জমা হতে শুরু করেছে। আগের পার্টিতে সে পূজার সঙ্গে ছিল, অনিমেঘদাও ছিল সেখানে। এই পার্টিতে কথা বলার মতোও তার সঙ্গে কেউ নেই।

দূর থেকে অরিন্দমের দিকে বারবার তাকাতে লাগল তিতির, তার মাথার মধ্যে অরিন্দমের জন্য মৃদু রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে এখন। সারাদিনের পর প্রায় খালি পেটে নেশা করেছে এটাই সম্ভবত অরিন্দমকে নিয়ে তার ফ্যান্টাসির মূল কারণ। তিতির অনুভব করল সে অরিন্দমকে কাছে পেতে চাইছে নিবিড়ভাবে, কিন্তু সেটা কিছুতেই—সম্ভব হবে না। অরিন্দম তার চারিপাশের মহিলাদের নিয়ে ব্যস্ত, তিতিরের কথা ভুলে গেছে সম্ভবত। এরই মধ্যে পকেট থেকে সেলফোন করে কাকে যেন ফোন করছে অরিন্দম।

তিতিরের সেলফোনটা এই সময়ে পুকপুক করে আওয়াজ করল। কোনও এসএমএস এল, তিতির কৌতূহলি হয়ে ফোনটা হাতে তুলল। তাতে এমনিতে এসএমএস কেউ পাঠায় না, সাধারণত হিজিবিজি নানারকম মার্কেটিংয়ের অফারই তার সেলফোনে আসে। এখন সম্ভবত রুমি এসএমএস পাঠিয়েছে, সে ঠিকমতো বর্ধমান পৌঁছেছে কি না তা খোঁজ নিতে চায় রুমি।

এসএমএস-টা দেখে তিতিরের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। অনেক ফ্যানের মধ্যে থেকেও অরিন্দম তাকে দেখেছে, তাকে মেসেজ পাঠিয়েছে। লিখেছে, 'ইউ আর লুকিং গর্জাস। টেক আ ড্রিন্ক প্লিজ, আই শ্যাল বি জয়েনিং ইউ ইন আ হোয়াইল।'

অরিন্দম তার দিকে একবারও তাকায়নি বলে মনে হয়েছিল তিতিরের, কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে ঠিক নয়। অরিন্দমের প্রতি অভিমানে এক লহমায় উধাও হয়ে গেল তিতিরের, সে বার কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অরিন্দমকে এসএমএস করল, 'আই অ্যাম জেলাস। আই হেট টু

সি ইউ উইদ আদার উইমেন।’

অরিন্দম মুখ তুলে তাকাল না এবারেও। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এসএমএস চলে এল, ‘ডোন্ট ওরি। আই অ্যাম অল ইয়োস।’

হুইফির গ্লাসে চুমুক দিয়ে তিতির হাসল আপনমনে। অরিন্দমের সঙ্গে তার প্রণয়ের খেলা শুরু হয়ে গেছে, গত কয়েক ঘণ্টা ধরে এই খেলা শুরু হওয়ারই প্রতীক্ষাতে ছিল সে। এই খেলা কতদূর গড়াবে তা এখনও জানে না তিতির, শুধু জানে অরিন্দম তার সঙ্গে খেলতে আগ্রহী। অরিন্দমের যে তাকে ভালো লেগেছে তাতে এখন আর সন্দেহ নেই তিতিরের।

নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অর্কর সঙ্গে একটু-একটু করে নেশায় জগতে জড়িয়ে পড়ার পর তিতির একটা জিনিস বুঝেছে। নিজের শরীরের তৃপ্তি খুঁজে নেওয়াটাও এক ধরনের নেশা, এই নেশার অন্যরকম একটা কিক আছে। নেশার ঘোরে যখন দুটো মানুষের শরীর মিলেমিশে এককার হয়ে যায় তখন উন্মীয়া এক অনুভূতির আত্মদান করা যায়। অর্ক তাকে এই নেশাটা করতে শিখিয়েছে, এই নেশাতেও ক্রমে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তিতির। আজ সে নেশা করতে চাইছে অরিন্দমের সঙ্গে, অরিন্দম কি এই নেশা তার সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজি হবে?

অরিন্দম কোনও আপত্তি করেনি। তিতিরের সঙ্গে শরীরের খেলায় সে খেলছিল অনেক রাতে, তার আগে পর্যন্ত তিতিরের সঙ্গে সে পূর্বরাগের খেলা খেলেছিল। এসএমএস-এর মাধ্যমে, চোখাচুখি করে। অরিন্দম বারবার করে দেখে নিতে চেয়েছিল তিতির তার প্রতি কতটা আকৃষ্ট হয়। তিতিররা আজকের জেনারেশন, এদের কাছে অরিন্দম এখনও যথেষ্ট কাম্য কি না তা বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল অরিন্দমের। তিতির তার কাছে আলাদা কোনও মানুষ নয়, তিতিরের বদলে ওই বয়সের অন্য যে কেউ হতে পারত অরিন্দমের এক্সপেরিমেণ্টের সাবজেক্ট।

অরিন্দমের এই খেলাটা তিতির তখন বোঝেনি। বুঝেছিল অনেক পরে, শরীরের খেলা যখন শেষ হয়ে গেছে, যখন তিতির মনে করতে শুরু করেছে অরিন্দমও সত্যি সত্যি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু তখন ভীষণ দেরি হয়ে গেছে, তখন আর তিতিরের ফিরে আসার কোনও উপায় ছিল না।

অর্কর সঙ্গে তার খেলা চলত সমানে-সমানে, অরিন্দম তাকে তুচ্ছ

করে তুলেছিল খেলার ছলে। তিতিরের আত্মসম্মান নিয়ে খেলা করেছিল সে, খেলাটা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেনি তিতির!

কলকাতায় অরিন্দমের ফিল্মের পার্টি চলেছিল প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত। বর্ধমান ছোট শহর, এখানে বারোটার সময়েই লোকে উঠি-উঠি করতে থাকে, সাড়ে বারোটার সময়ে জেলা ভবনের সামনের লন ফাঁকা হয়ে গেল। সেই সময়ে পার্টি সাজ করে গোছগাছ করার জন্য রয়ে গেছে সামান্য কয়েকজন উর্দিধারী ক্যাটারারের লোক আর সেই হলের ম্যানেজার। একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলেছিল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দাদা! খুব ভালো পার্টি হয়েছে।’

করজোড়ে বিনয়ী ম্যানেজারবাবু কোনও দোষত্রুটি হয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বাড়ির পথে রওনা দিলেন, অরিন্দম তিতিরের দিকে তাকিয়ে হেসে জিগ্যেস করেছিল, ‘কি রে, তুই বোর হলি নাকি?’

তিতির মাথা নেড়ে জানিয়েছিল সে বোর হয়নি। সে গত দেড় ঘন্টা ধরে অরিন্দমের দিকে বারবার তাকিয়েছে, দূর থেকে লক্ষ করেছে অরিন্দমের প্রতিটি ভাবভঙ্গি। তার নেশার ওপর হইস্কির পরত পড়েছে, অরিন্দমকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে-দেখতে তার নেশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটেছে, তার পক্ষে বোর হওয়া সম্ভব ছিল না। সে এখনও মুগ্ধ দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে অরিন্দমের দিকে, অরিন্দমের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না তিতির।

মেয়েদের চোখের এই মুগ্ধতা পড়তে অরিন্দমের কোনও অসুবিধে হয় না। সে তিতিরের দিকে তাকিয়ে দেখল ভালো করে। তিতিরকে কখনওই সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু তার মুখে আলগা একটা লাবণ্য আছে। এখন নেশার ঝোঁকে তার চোখ দুটোয় সামান্য রক্তরঙের আভাস লেগেছে, ভ্যাপসা গরমে নাকের ওপর আর ঠোঁটের ওপরিভাগে জমে উঠতে শুরু করেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা। তিতির অরিন্দমকে পছন্দ করেছ—কিন্তু এখনও তার বোঝা বাকি এই বয়সের মেয়েরা এখনও তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করে কি না, তার সঙ্গে যৌন সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করে কি না। এই বয়সের মেয়েদের সঙ্গে অনেকদিন অরিন্দমের যোগাযোগ কমে গেছে, সে এদের বুঝতে চায় বলেই তিতিরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তিতির তার কাছে এক্সপেরিয়েন্টের গিনিপিগ।

অরিন্দম বলল, 'ঘরে চল এবারে, গরম লাগছে। তা ছাড়া রাতও হয়েছে অনেক।'

তিতির মাথা নাড়ল, জেলা ভবনের মূল দরজার দিকে এগোতে গিয়ে টাল হারাল একবার। করুন মুখে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নেশা হয়ে গেছে অরিন্দমদা। আমার ঘর খুঁজে পাব না। আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে তুমি?'

তিতিরের ঘরটা অরিন্দমের ঘরের ঠিক পাশেই, ঘরের দরজা খুলে দিয়ে অরিন্দম বলল, 'যা ঘুমিয়ে পড় এবারে। কাল সকাল দশটা নাগাদ বেরোবে আমরা, তার মধ্যে রেডি হয়ে নিস।'

তিতির বলল, 'তুমি ভেতরে এসো প্লিজ। একটু থাকো আমার সঙ্গে। সারা সপ্তাহ তো অন্যদের সঙ্গেই ছিলে।'

অরিন্দম তিতিরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই অরিন্দমকে ভালো করে আঁকড়ে ধরল তিতির পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল নিজের বেডরুমের দিকে। খাটের ওপর যত্ন করে তিতিরকে বসিয়ে দিয়ে অরিন্দম বলল, 'এবারে ঘুমিয়ে পড়। আমি ঘরে যাই।'

অরিন্দমের হাতটা ধরে টানল তিতির। একটু জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি চলে যাচ্ছে? আমাকে ভালো লাগে না তোমার?'

সামান্য হেসে অরিন্দম বলল, 'দ্যাট ইজ বিসাইডস দ্য পয়েন্ট। আমার তোকে ভালো লাগে কি না জেনে তোর কী হবে? তোর আমাকে ভালো লাগে কি না সেটা বল আমায়।'

'লাগে তো।'

'মাতলামি করছিস তুই। তুই আমার সিনেমাই দেখিস না কখনও, আমাকে তোর ভালো লাগবে কী করে?'

'দেখেছি, তোমার অনেক সিনেমা দেখেছি। তোমাকে স্ক্রিনের থেকে সামনাসামনি অনেক ভালো দেখতে, সত্যি বলছি।'

'আমার কী সিনেমা দেখেছিস তুই?'

'অবগাহন। তুমি ন্যাশনাল আওয়ার্ড পেয়েছিলে ওই সিনেমাটার জন্য।'

অরিন্দম এক ঝলক তাকাল তিতিরের দিকে। তারপর হাত উঠিয়ে ঠাস করে একটা চড় মারল তিতিরের গালে। বলল, 'আমাকে মিথ্যে কথা বলবি না। অবগাহন বলে কোনও সিনেমায় আমি কোনওদিন অ্যাক্টিং করিনি।'

অরিন্দম চড়টা বেশ জোরে মেরেছে। তিতিরের গাল জ্বালা করছে, সে তার গালে হাত দিয়ে অভিমানী চোখে তাকিয়েছে অরিন্দমের দিকে। অস্ফুটে জিগ্যেস করল, ‘আমি দেখেছি সিনেমাটা। তুমি ছিলে, মুম্বাইয়ের হিরোইন নন্দিনী ছিল। তোমাদের একটা কিসিং সিন ছিল।’

অরিন্দম হাসল। তিতির সিনেমাটা সত্যিই দেখেছে সম্ভবত, নামটা ভুল করছে। হেসে জিগ্যেস করল, ‘আর কি সিনেমা দেখেছিস তুই?’

‘আরও দেখেছি। টিভিতে। সিনেমার নাম ভুল বলেছি বলে তুমি আমাকে মারলে?’

অরিন্দম হেসে তিতিরের মাথায় হাত রাখল। তার চুলে বিলি কেটে দিতে-দিতে বলল, ‘আচ্ছা সরি বলছি। আর মারব না তোকে।’

অরিন্দমের হাতের স্পর্শে তিতিরের অভিমানভরা চোখ একটু-একটু করে ভরে উঠল জলে। অরিন্দমের হাতটা নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে মুখ ডোবাল তিতির। মুখ ঘষতে-ঘষতে বলল, ‘নন্দিনীকে যেভাবে চুমু খেয়েছিলে আমাকে সেভাবে চুমু খেতে পারো না তুমি?’

অরিন্দম বলল, ‘ইউ আর নট ইন ইয়োর সেন্সেস। এই অবস্থায় কিছু করতে চাই না আমি তোর সঙ্গে।’

তিতির বলল, ‘আমি সেন্সে আছি অরিন্দমদা। সেন্সে না থাকলে কখনওই বলতাম না। আমার তোমাকে ভালো লাগে অরিন্দমদা, আমি মাঝে-মাঝেই তোমায় স্বপ্নে দেখি, তোমার কথা ভাবি। তোমার সঙ্গে...’

অরিন্দম আর কথা বলেনি, তিতিরের চিবুক ধরে তার মুখটা তুলে নিয়ে এসেছিল নিজের মুখের কাছে। এর পরই তিতির ঠোঁট ছোঁওয়াল অরিন্দমের ঠোঁটে। অরিন্দম লক্ষ্য করেছিল, তিতিরের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে এখন, তার নিঃশ্বাসের গরম ভাপ লাগছে এসে অরিন্দমের মুখের ওপর। এর অব্যবহিত পরের মুহূর্তে অরিন্দমকে আঁকড়ে ধরে আলোষে চুম্বন করেছিল তিতির।

অরিন্দম মনে মনে হেসেছিল, একজন কমবয়সি মেয়ের ফ্যান্টাসিতে বাধা দেওয়ার তার কিছু ছিল না। রতিক্রিয়ার ব্রতী হয়েছিল দুজনে। তেতাল্লিশ বছরের একজন মধ্যবয়সি ফিল্মস্টারেয় সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় শরীরের কামনা চরিতার্থ করেছিল অর্ধেক বয়সের এক যুবতী। অরিন্দম নিশ্চিত হয়েছিল।

এরও অনেক পরে বিছানায় অরিন্দমকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে ছিল

তিতির। তার শরীর জুড়ে তখনও ভালোলাগার ঘোর, তৃপ্তির রয়ে যাওয়া আবেশ। তিতিরের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে পড়েছিল অরিন্দম। জামা-কাপড় গায়ে গলাতে-গলাতে বলেছিল, ‘আজ রাতে যা হয়েছে তা তুই ভুলে যাবি। আই ওয়ান্টেড টু প্রভ সামথিং টু মাইসেলফ, তোকে সেই কারণে আজ আমার দরকার ছিল। ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান এক্সপেরিমেণ্ট।’

অরিন্দমের কথায় শরীরের নেশার ঘোর ছেঁড়া মেঘের মতো সরে যেতে শুরু করেছিল তিতিরের মন থেকে। অবাক হয়ে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করেছিল, ‘কিসের এক্সপেরিমেণ্টের কথা বলছ তুমি?’

‘তুই বুঝবি না। বোঝানোর চেষ্টাও করব না আমি। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক ইউ ফর টুডে। সেইসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, অরিন্দম মুখার্জি কাউকে ঠকায় না, ইউ উইল বি পেইড ইয়োর রেমুউনারেশন ফর টু-নাইট।’

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল তিতিরের গলা, ‘মানে! কিসের রেমুউনারেশন?’

‘আজ রাতের জন্য তুই কুড়ি হাজার টাকা পাবি। ফর স্লিপিং উইদ মি। কাল শান্তিনিকেতন রওনা হওয়ার আগেই টাকা পেয়ে যাবি। আর যা হয়েছে ভুলে যাবি একেবারে। অরিন্দম মুখার্জির নামে কোনও স্ক্যাভাল নেই, আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং টু গো আউট। তুই কাউকে কিছু বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না অবশ্য, আই নো হাউ টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট।’

স্তব্ধ হয়ে গেছিল তিতির! তার চোখ জ্বালা করে উঠতে শুরু করেছিল। মনে হয়েছিল অরিন্দম তাকে ঠকিয়েছে, আজ বিকেল থেকে তার সঙ্গে এখন পর্যন্ত যে খেলাটা অরিন্দম খেলেছে সেটা অরিন্দমের অভিনয় ছিল। নন্দিনী নামে হিরোইনের সঙ্গে চুস্বনদৃশ্যে অভিনয় করার মতো। অরিন্দমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তিতির, অরিন্দমের মধ্যে সেই আকর্ষণের লেশটুকু ছিল না। অরিন্দম তার সঙ্গে স্রেফ খেলা করেছে, এখন টাকা দিয়ে তাকে অপমান করতে চাইছে!

তিতির বলেছি, ‘আমি টাকা নেব না অরিন্দমদা। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনসান্ট মি লাইক দিস। আই অ্যাম নট আ স্লাট। ডোন্ট ডু দিস টু মি।’

অরিন্দম হেসে বলেছিল, ‘তা হয় না তিতির। আই হ্যাভ সার্টেন প্রিন্সিপলস ইন মাই লাইফ। দেয়ার আর নো ফ্রি ল্যাঞ্চেস।’

অরিন্দম তার ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ডুকরে কেঁদে উঠেছিল তিতির। গত কয়েক মাসে সে অর্কর সঙ্গে মিশেছে, তার সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করেছে, নেশার ঝাঁকে নিজেকে কখনও তার জন্য খারাপ বলে মনে হয়নি। আজ মনে হল সে নোংরা একটি মেয়ে, নোংরা না হলে অরিন্দম তাকে এইভাবে অপমান করার সাহস পেত না।

ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেট বার করে কাঁপা-কাঁপা হাতে তার মধ্যে থেকে তামাক বার করে সিগারেটের মধ্যে ভরতে শুরু করল তিতির। সে এখন একটার-পর-একটা জয়েন্ট খাবে, খেতে খেতে একটা সময়ে নেশার ঝাঁকে তার ব্ল্যাক আউট হয়ে যাবে। আজ রাত কাটানোর জন্য এইটুকু করতেই হবে তিতিরকে। নইলে সে কিছুতেই ঘুমোতে পারবে না, ভুলতে পারবে না তাকে আজ রাতে একজন এসে অপমান করে গেছে।

২১

স্নান করে বেরিয়ে জামা-প্যান্ট পরে বসার ঘরে এসে শঙ্করলাল দেখল টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে বসে রয়েছে নন্দিতা। নন্দিতাকে দেখে অবাক হয়ে শঙ্করলাল বলল, ‘তুই কখন এলি?’

নন্দিতা বলল, ‘একটু আগে। তুমি আজ অনেকদিন পর অফিস জয়েন করছ, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে। এর পর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন তো আর রোজ রোজ আসা যাবে না।’

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে শঙ্করলাল বলল, ‘ভালো করেছিস। তুইও ব্রেকফাস্ট খাবি তো, নাকি? তোর জন্য ব্রেকফাস্ট বানায়নি দেবারতি?’

‘জিগ্যেস করেছিল। আমি খেয়ে বেরিয়েছি বাবা, এখনও খিদে পায়নি। তুমি খেয়ে নাও, আমি গল্প করি তোমার সঙ্গে।’

শঙ্করলাল হেসে টোস্ট করা পান্ডুরুটিতে কামড় দিল। শঙ্করলালের পছন্দ মতো কড়া করে টোস্ট করেছে দেবারতি, কিন্তু মাখন লাগিয়েছে

যৎসামান্য। শঙ্করলালের আজকাল বেশি খাওয়া বারণ হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়ার ওপর নানান নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়েছে। আগে রোজ সকালে ব্রেকফাস্টে পাউরুটির সঙ্গে একটা ডিমসেদ্ধ আর সসেজ খেত শঙ্করলাল, এখন তার বেশি প্রোটিন খাওয়াও বারণ। হার্ট অ্যাটাকের ধাক্কা মোটামুটি সামলে উঠেছে শঙ্করলালে, কিন্তু এখন থেকে আজীবন তাকে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সৎযত থাকতে হবে। তার অত্যন্ত প্রিয় ধূস্রপানও তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে পুরোপুরি।

রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে বেরিয়ে এল দেবারতি। ট্রে-তে করে সে সাজিয়ে এনেছে নন্দিতা আর তার নিজের জন্য চা, শঙ্করলালের জন্য দুধের গ্লাস। দুধের গ্লাসটা শঙ্করলালের প্লেটের পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে দেবারতি বলল, ‘দুধটা ফেলবে না। সকাল থেকে অলরেডি দু-কাপ চা খেয়েছে, এখন আর চা দিলাম না সেইজন্য।’

করণ মুখে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে শঙ্করলাল বলল, ‘দেখেছিস, খালি শাসন করে! খেতেই দেয় না ইচ্ছেমতো!’

দেবারতি নন্দিতাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়েছে, সেই চায়ে চুমুক দিয়ে নন্দিতা বলল, ‘এই বয়সে তোমার শাসন দরকার একটু। দেবারতিদি ঠিকই করে।’

নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেবারতি বলল, ‘আর কী! আজ থেকে তো আবার তুমি স্বাধীন। আর তো শাসন করার কেউ থাকবে না, এবার নিজেরটা নিজেকেই করতে হবে। কাজের লোকেদের সব বুঝিয়ে দিয়েছি, এবারে তুমি জেদ করলে তুমিই বুঝবে।’

শঙ্করলাল হাসল একটু। বলল, ‘আরে বাবা, পারব। আন্ডার-এস্টিমেট করবে না আমায়। আর দরকারে পড়লে তুমি তো আসবে, নাকি আসবে না?’

নন্দিতা দেবারতির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘ও আপনি বুঝি ফিরে যাচ্ছেন আজ?’

দেবারতি বলল, ‘হ্যাঁ। তিন মাস ধরে এখানে রয়েছি। বাড়ি তাল্য বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এবারে তো ফিরে যেতেই হবে, তাই না?’

নন্দিতা চুপ করে গেল। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল দিল্লিতে প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে, সেই সময় থেকে দেবারতিই বাবার সঙ্গে আছে। দিল্লির হাসপাতালে দিন পনেরো থাকার পর কলকাতায় এই সন্টলেকের

বাড়িতে ফিরেছে বাবা, এখানে রেখেই তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে দেবারতি। নন্দিতা আর ভাই মাঝে-মাঝে এসে বাবাকে দেখে গেছে, কিন্তু এখানে এসে থাকার কথা তারা কখনও ভাবেনি। পুরো দায়িত্ব দেবারতির হাতে ন্যস্ত করে তারা নিশ্চিত্তে থেকেছে। দেবারতি বাবার কেউ হয় না, তা সত্ত্বেও বাবার প্রতি ভালোবাসায় তার কোনও খাদ নেই। এই মানুষটাকে মনে-মনে শ্রদ্ধা করে নন্দিতা।

গত এক মাস ধরে বাবা বাড়িতে বসেই অফিসের কাজকর্ম করছিল, এখন ডাক্তারেরা বলেছে শঙ্করলাল পুরোপুরি কাজে যোগ দিতে পারে। ডাক্তারেরা বলেছে এমনিতে ভয়ের কোনও কারণ নেই, বাইপাস সার্জারির পর সুস্থ জীবনযাপন করতে কারও কোনও অসুবিধে হয় না। রুটিনমাফিক সাবধানে থাকা আর খাওয়াদাওয়ার সামান্য কিছু বিধিনিষেধ মেনে চললে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বাবার এমন কিছু বয়স হয়নি, বাবার শরীরে অন্য কোনও সমস্যাও নেই। ডাক্তারেরা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন শঙ্করলালকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

চা খেয়ে দেবারতি ঘড়ি দেখল একবার। তারপর বলল, ‘তুমি তো দেরি করে বেরোবে। তোমরা গল্প করো, আমার অফিস যাওয়ার সময় হল।’

ভিতরের ঘর থেকে বিরাট একটা সুটকেস নিয়ে এসে বসার ঘরে পুনরায় এসে দাঁড়াল দেবারতি। গত তিন মাসে এই বাড়িতে থাকার সময়ে তার অনেক জামা-কাপড় এখানে নিয়ে আসতে হয়েছিল দেবারতিকে। আজ সেসব গোছগাছ করে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে তার। শঙ্করলালের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, তার সত্ত্বেও এইভাবে এক সঙ্গে কখনও থাকেনি সে এর আগে। এবারে তাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে, এখন শঙ্করলাল সুস্থ হয়ে হয়ে ওঠার পর এইভাবে এখানে থেকে যাওয়া দৃষ্টিকটু দেখায়। আইনের চোখে শঙ্করলাল এখনও বিবাহিত, তার বাড়িতে অনন্তকাল থেকে যাওয়া দেবারতির পক্ষে সম্ভব নয়।

নন্দিতা আর শঙ্করলাল বাড়ির গেট পর্যন্ত ছেড়ে দিল দেবারতিকে। দেবারতি তার বিরাট ব্যাগটা নিয়ে তার অফিসের গাড়িতে উঠে পড়ল। ব্যাগটা সারাদিন গাড়িতেই থেকে যাবে, অফিসের কাজ শেষ করে এই গাড়ি করেই দেবারতি ফিরে যাবে বাড়ি। আজ অন্যদিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তে চায় দেবারতি। বাড়ির তালা

খুলে বাড়ির গোছগাছের জন্য সময় ব্যয় করতে হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে লেক গার্ডেনের বস্তু থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে কাজের মেয়ে কবিতাকে। বাড়িতে কেউ ছিল না বলে কাজের মেয়েটাকে দু-মাস ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

নন্দিতা ছিল বলে শঙ্করলালকে ভালো করে বিদায় জানাতে পারেনি দেবারতি, তার আসলে এই বাড়ি থেকে বেরোনের সময়ে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। আজকাল দেবারতির কথায়-কথায় চোখে জল আসে, নন্দিতা ছিল বলে ওই চোখের জল সম্বরণ করতে পেরেছে দেবারতি। অন্য কারও কাছে সে তার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না কখনও। তিতিরের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিন যে গাড়িতে উঠে সে কেঁদেছিল, সে কথা শঙ্করলালকে বলেনি দেবারতি। শঙ্করলালের শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত একদিনও তার সামনে চোখের জল ফেলেনি দেবারতি।

দেবারতির এখন একটু-একটু কান্না পাচ্ছে, কিন্তু দেবারতি মুখ শক্ত করে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। সে কিছুতেই কাঁদবে না এখন— শঙ্করলাল সুস্থ হয়ে উঠেছে, তার কথা ভেবে কাঁদলে শঙ্করলালের অমঙ্গল হবে। ইদানীং এইরকম সব অদ্ভুত-অদ্ভুত কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে দেবারতি।

দেবারতি চলে যাওয়ার পরে আরও ঘণ্টাদুয়েক বাবার সঙ্গে রইল নন্দিতা। তারপরেই বাবার লাল আলো লাগানো গাড়ি এসে উপস্থিত হল ঘরের দরজার সামনে। অফিস যাবে বলে বাবা তৈরি হয়ে নিল, দেবারতির রেডি করে দিয়ে যাওয়া লাঞ্ছের প্যাকেট নন্দিতাই ভরে দিল বাবার অফিসের ব্যাগে। কাল থেকে এই লাঞ্ছের প্যাকেট বানানোর জন্য দেবারতি থাকবে না, বাবা আবার আগের মতো ফিরে যাবে সরকারের নিয়োজিত চাপরাশিদের সেবায়। দেবারতি অবশ্য সপ্তাহান্তে আসবে, কিন্তু এর পর থেকে তার আসাটাও হবে নন্দিতার ভিজিটের মতো।

বাবার হাত ধরে গাড়ি অবধি এল নন্দিতা। তার নিজের গাড়িটাও অপেক্ষা করছে, বাবাকে বিদায় জানিয়ে এর পর সেই গাড়িতে করে নন্দিতা যাবে সোনারপুরে তার হোমের কাজে। আজ হোমের ব্যাপারে বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, অনেকদিন পরে বাবা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে নন্দিতার কাজকর্ম কেমন চলছে। অরিন্দমের কথাও

জিগ্যেস করেছে বাবা, নন্দিতা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে অরিন্দমের প্রোডাকশনের ব্যবসার কথা। সেইসঙ্গে জানিয়েছে, অনেকদিন পরে অরিন্দমের নতুন সিনেমা বিরাট হিট করেছে। পঞ্চাশ দিন পার করেও হইহই করে চলছে সিনেমা, সকলে বলছে এই সিনেমা সিলভার জুবিলি না করে থামবে না। খবরের কাগজে অরিন্দমের জনপ্রিয়তায় নতুন জোয়ার এসেছে বলে বিরাট একটা আর্টিকলও লিখেছে সুকান্ত রায় বলে এক সাংবাদিক।

হাসতে-হাসতে নন্দিতা বলল, ‘মজার ব্যাপারে কী জানো, ওই সাংবাদিকই কয়েকমাস আগে কাগজে লিখেছিল অরিন্দম ফুরিয়ে গেছে। এখন আবার ও-ই উলটো কথা লিখেছে।’

অরিন্দমের সিনেমা হিট করার কথা শুনে শঙ্করলাল খুশি হল। খবরের কাগজে পরস্পরবিরোধী আর্টিকল বেরিয়েছে শুনে নন্দিতার মতো সেও হাসল মন খুলে। তারপর বলল, ‘আমি অনেকদিন সিনেমা দেখিনি জানিস? একদিন অরিন্দমের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবি আমায়?’

নন্দিতা বলল, ‘কবে যাবে বোলো। অরিন্দমকে বলে কমপ্লিমেন্টারি পাসের ব্যবস্থা করে রাখব। ক’টা পাস লাগবে জানিয়ে দিয়ে আমায়।’

বাবা ঘাড় নাড়ল, তারপর গাড়িতে ওঠার সময়ে জিগ্যেস করল, ‘তোর মা কেমন আছে রে?’

বাবার এই প্রশ্নে হঠাৎ করে একটু থমকে গেল নন্দিতা। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে দিল্লিতে গেছিল নন্দিতা, কলকাতায় ফিরে আসার পরে নিয়ম করে সে বাবার সঙ্গে দেখাও করে গেছে। মা’র কথা বাবা কখনও জিগ্যেস করেনি এর আগে। বাবার অসুস্থতার কথা শুনে মা তার বাড়িতে পুজো-পাঠ বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মা’ও মুখ ফুটে কখনও জিগ্যেস করেনি বাবা কেমন আছে। নন্দিতা বলল, ‘ভালোই আছে। একটু বাতের ব্যথায় কষ্ট পায় মাঝে-মাঝে। তার জন্য ফিজিওথেরাপিস্ট রাখা হয়েছে।’

‘তোর মা’র কিন্তু বয়স কম হল না। শৈবালকে বসিল রেগুলার একটা চেকআপ করাতে।’

‘বলব।’

‘এখনও পুজো-আচ্চা করছে রোজ?’

নন্দিতা হাসল, ‘পুজো করার অভ্যেস কি আর একেবারে চলে যায়?’

বয়সের সঙ্গে বাড়ে বরং। তোমার জন্যও রোজ দু-বেলা করে পুজো দিয়েছে মা।’

হাসতে-হাসতে মাথা নাড়ল শঙ্করলাল। বলল, ‘তোমার মা কোনওদিন আর বদলাবে না।’

নন্দিতাও হাসল। বলল, ‘কী দরকার বদলানোর? যে যা নিয়ে ভালো থাকে, সেটাই তো ভালো।’

শঙ্করলাল আর কিছু বলল না। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী নিরুপমার সঙ্গে এই পুজো-আচ্চা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল শঙ্করলালের। শঙ্করলাল নাস্তিক, ঘোর কমিউনিস্ট নিয়মাবলি মেনে সে কখনও দেবতার আরাধনায় বিশ্বাসী হতে পারেনি। নিরুপমাকে বহুবার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে ভগবান বলে আসলে কিছু হয় না। ওই যুক্তি কখনও মেনে নিতে পারেনি নিরুপমা, ভগবানের স্বপক্ষে কথা বলেছে, ঝগড়া করেছে শঙ্করলালের সঙ্গে। ভগবান আছে কি নেই এই নিয়ে বিরোধ বেধেছে দুজনের, ক্রমে মানসিক দূরত্ব স্থাপিত হয়েছে দুজনের মধ্যে।

বহু বছর আগের ওই কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায় শঙ্করলালের। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সমস্ত প্যাশন আশ্বে-আশ্বে স্তিমিত হয়ে পড়ে, এখন আর আস্তিকদের সঙ্গে কোনওরকম তর্ক-বিতর্কে জড়াতে চায় না শঙ্করলাল। সারা পৃথিবীতে বামপন্থীরা ক্রমে অস্তমিত, এখন মাঝে-মাঝে বামপন্থা নিয়েই সংশয় জাগে শঙ্করলালের মনের মধ্যে। পার্টিও ধর্ম নিয়ে আগেকার কটুর অবস্থান থেকে সরে এসেছে দীর্ঘদিন, দলের এখনকার মত হল ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত অভিরুচি, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ থাকতে পারে না। এই বয়সে এসে শঙ্করলালও সে কথা মনে নিয়েছে।

নন্দিতার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে অল্প একটু হাসল শঙ্করলাল। বলল, ‘ঠিকই বলেছিস তুই! যে যার মতো করে ভালো থাকবে সেটাই তো ভালো।’

ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে শঙ্করলাল নন্দিতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। বলল, ‘আসিস মাঝে-মাঝে। তোরা এলে ভালো লাগে।’

নন্দিতা হাত নাড়ল, ঘাড় নেড়ে জানাল বাবার সঙ্গে দেখা করতে সত্যিই মাঝে-মাঝে আসবে এখানে। বাবার গাড়িটা রওনা হওয়ার পর নিজের গাড়িটার দিকে পায়ে পায়ে এগোল নন্দিতা। হার্ট অ্যাটাকের ফলে

বাবা অনেকটা রোগা হয়ে গেছে, গত দু-মাসে মাথার মাথার চুলও যেন কমে গেছে আরও। একটা সময়ে বাবা কত সুপুরুষ ছিল, এখন বয়সের ছাপ পড়েছে বাবার চেহারায়ে।

দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে-উঠতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নন্দিতার। তারপর মনে-মনে বলল, 'তুমিও ভালো থেকে বাবা। নিজের মতো করে...'

২২

মণিদা বলে লোকটার ফ্ল্যাটে আজকাল নিয়মিত যেতে শুরু করেছে তিতির। এখানে প্রথমবার সে এসেছিল পূজার সঙ্গে, আজকাল অনেক সময়ে সে একাও চলে আসে এখানে। অনেকদিন পিজি অ্যাকোমোডেশনে ফিরে যায় না আর, রাত কাটায় এই ফ্ল্যাটেই।

রুমির পরীক্ষা হয়ে গেছে, তার এমবিএ রেজাল্ট বেরোতে একমাস মতো বাকি। এই সময় রুমির কলকাতা শহরে করার কিছু নেই, সে গুয়াহাটিতে তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রুমি নেই বলে পিজি ইস্টেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না তিতিরের, সে চলে আসে মণিদার এখানে, নেশার টানে। গাঁজা এবং চরসের ধাপ পেরিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে তিতিরের অভিষেক হয়েছে অন্য একটি নেশায়, সেই নেশা তিতিরকে বারংবার টানতে থাকে মণিদার ফ্ল্যাটের দিকে। মণিদার কাছে সবসময়ে সবরকম নেশার সামগ্রী মজুত থাকে।

তার অফিসের টেলিভিশন প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাতে এতটুকু মন নেই তিতিরের। নানা অছিলায় মাঝে-মাঝেই অফিস যায় না, শরীর খারাপ হয়েছে বলে খবর পাঠিয়ে দেয় রাঘবকে দিয়ে। এর মধ্যে দুদিন অনিমেষদা তাকে ডেকে খুব বকাবকি করেছে, তাতেও কাজ হয়নি। অনিমেষদার বকাবকির সময়ে নির্লিপ্ত মুখে তাকিয়ে থেকেছে তিতির। অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হয়েছে অফিসের দু-একবার। তিতির অরিন্দমকে চেনে না এরকম একটা মুখ করে এড়িয়ে গেছে।

বর্ধমানের ওই ঘটনাটার পর থেকেই কাজে মন চলে গেছে তিতিরের। সেদিন সারারাত জেগে ছিল তিতির, সকালবেলা তার ঘরে ক্যাশ কুড়ি

হাজার টাকা ক্যাশ পৌঁছে দিয়ে গেছিল অরিন্দম। কোনও কথা বলেনি তিতির, খামে ভরা ওই টাকা ব্যাগে ভরে নিয়ে সে লোকাল ট্রেনে করে কলকাতা ফিরে এসেছিল। আরও দুদিন অরিন্দমের সঙ্গে কাটাতে ইচ্ছে হয়নি তিতিরের। কলকাতায় ফিরে ওই টাকাটা সে দিয়ে দিয়েছিল রুমিকে। বলেছিল, ‘তুই কুড়ি হাজার টাকা হারিয়েছিলি, আমি সেই টাকা জোগাড় করে এনেছি অরিন্দমের কাছ থেকে। এই টাকাটা তোর কাছে রেখে দে, মা’কে বলে দিস তোর টাকা চুরি হয়নি, ব্যাঙ্ক ভুল করেছিল। তোর মা বকাবকি করবে না আর।’

বর্ধমান থেকে ফিরে আসার একদিন দু-দিনের মধ্যেই নতুন নেশায় হাতেখড়ি হয়েছিল তিতিরের। পূজার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল অর্কের ফ্ল্যাটে। পূজাকে দেখে প্রথমেই রুমির টাকা চুরি যাওয়ার কথা মনে পড়েছিল তিতিরের, তাই সে আড়ষ্টভাবে কথা বলছিল প্রথমদিকে। পূজার ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা ছিল না, তাই দেখে অবাক হয়েছিল তিতির। রুমির টাকা চুরি করলে তিতিরের সঙ্গে নিশ্চয় এত সবলীলভাবে কথা বলত না পূজা, তার হাবভাবে কোনও না কোনও লক্ষণ ফুটে উঠত। সেই সময়ে তিতিরের মনে হয়েছিল, রুমি হয়তো অন্য কোনওভাবে টাকা হারিয়েছে, ওই টাকা চুরি যাওয়ার জন্য পূজা কোনওভাবেই দায়ী নয়।

পূজার সঙ্গে একটু-একটু করে সাবলীলভাবে কথা বলতে শুরু করেছিল তিতির, সেই সময়ে পূজা তাকে অন্য একরকমের নেশার কথা বলেছিল। সেই নেশার সন্ধানে তিতির পূজার সঙ্গে এসেছিল মণিদার কাছে। মণিদার কাছ থেকে সাদা রঙের মিহি পাউডার চেয়ে নিয়ে তিতিরের হাতে দিয়ে পূজা বলেছিল, ‘ট্রাই দিস। দিস ইজ কোক। এক্সপেনসিভ স্টাফ। ইউ উইল বি অন ক্লাউড নাইন।’

কোকেনের কথা তিতির জানে না এমন নয়। অনেক সিনেমায় সে কোকেনের নেশা দেখেছে, খবরের কাগজে পড়েছে মুম্বাই এবং দিল্লির উঁচু মহলে কোকেনের আনাগোনা এবং সমাদর আছে। বছর দুয়েক আগে কোকেনের নেশা করে দিল্লির এক রাজনীতিবিদের ছেলের মৃত্যু ঘটেছে এই ঘটনার কথাও কাগজে পড়েছে তিতির। কোকেন পৃথিবীর অন্যতম নিষিদ্ধ বস্তু, তা যে কলকাতাতেও পাওয়া যায় সে ব্যাপারে কোনও ধারণা ছিল না তিতিরের। পূজা হেসে বলেছিল ‘ট্রাই ইট। নাক দিয়ে টেনে

নেওয়ার চেষ্টা করিস না, ওটা অভ্যেস না থাকলে খুব মুশকিল। অল্প একটু আঙুলে নিয়ে মাড়িতে ঘষে নে!’

ভয়ে ভয়ে আঙুলে করে একটুখানি সাদা পাউডার তুলেছিল তিতির। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছিল, ‘কিছু হবে না তো?’

পূজা বলেছিল, ‘ইয়োর সেন্সেস উইল বি নাম্ব। টোটাল ব্লিস।’

সেন্সেস উইল বি নাম্ব। চেতনা ভোঁতা হয়ে উঠবে তার! পূজার এই কথাটাই উত্তেজনা জুগিয়েছিল তিতিরকে। তার মনে হয়েছিল, নিজের চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। চেতনার স্তরগুলো তাকে বারবার বিরক্ত করতে থাকে, সে কারণেই নিজের চেতনা থেকে দূরে চলে যাওয়া দরকার। তার বাবা, মা, পারিপার্শ্বিক, অরিন্দম বারংবার উঁকি মেরে যায় তার চেতনার মধ্যে। তিতির সর্বতোভাবে এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে নিস্তার চায়, চেতনার অবলুপ্তি চায়, বেঁচে থাকতে চায় নিজের মতো করে। তার কাউকে দরকার নেই জীবনে, চেতনারও নয়। টোটাল ব্লিস।

অরিন্দম তাকে যা অপমান করেছিল তা ভুলতে তিতিরের সময় লেগেছিল মাত্র কয়েকটা দিন। সামান্য কয়েক গ্রাম সাদা পাউডার সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তিতির নিজের চেতনা ভোঁতা করে দিতে চেয়েছে নিজের হাতে। নিজের চেতনাকে বিসর্জন দিতে তাকে রোজ আসতে হয়েছে মণিদার কাছে। তার নতুন করে আর কিছু পাওয়ার নেই জীবনে, হারানোরও নেই। সে শুধু তার নেশার বস্তুটাকে হারাতে চায় না। ওটার জন্যই এই মুহূর্তে তার বেঁচে থাকা সার্থক।

অর্ক বারবার তাকে সাবধান করেছিল। বলেছিল, ‘বাড়াবাড়ি করিস না। এই নেশায় জড়িয়ে পড়লে খুব মুশকিল হয়। এর থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।’

তিতির বলেছিল, ‘বেরোতে চাই না আমি। আমার দরকার নেই বেরিয়ে আসার।’

অর্ক বুঝিয়েছিল এই নেশা করতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মণিদা প্রথম-প্রথম বিনে পয়সায় খাওয়ায়, তারপরে একটা সময়ে মেয়েদের জড়িয়ে দেয় অন্য কাজে। মণিদা এসকট সার্ভিস চালায়, সেখানে মেয়েরা সমাজের উচ্চ মহলের পুরুষদের কাছে শরীর বিক্রি করে। শরীর বিক্রির টাকা থেকে নেশার টাকার জোগান করে অনেকে। অনেকে নেশা করে

না, কিন্তু টাকা রোজগারের মোহে জড়িয়ে পড়ে এই পেশায়। বাইরে শুধু মডেল কিংবা অভিনেতার একটা ভড়ং রেখে দেয়। পূজা যেমন।

এসকট সার্ভিস কথাটা অর্কর কাছেই প্রথম শুনেছিল তিতির, সে জানত না আধুনিক ভদ্রসমাজে বেশ্যাবৃত্তির অন্য একটি নাম আছে।

অনেকদিন আগে পূজা তাকে বলেছিল কলকাতা শহরে ইচ্ছে হলেই টাকা রোজগার করা যায়। সিনেমা এবং সিরিয়ালে অভিনয় করে যে পয়সা পাওয়া যায়, তাতে কারও পক্ষে নাকি সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পূজা তার জামাকাপড়ের পিছনে খরচ করে, একটা গাড়ি কিনেছে কয়েকমাস আগে, এখন আনোয়ার শাহ কানেক্টরের কাছে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে। টাকা রোজগার না করতে পারলে এত সব করা যায়? পূজা বলেছিল, ‘অরিন্দম মুখার্জি মাস গেলে তোকে দশ হাজার টাকা দেবে। এতে চলে কারও?’

পূজার কথাটা একটু-একটু করে বুঝতে পেরেছে তিতির। পূজা তার থেকে মাত্র দু-বছরের বড়, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার সুবাদে তার বাড়িতে একদিন নিশিাপনও করেছে তিতির। অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম পূজার, সে তার মধ্যবিত্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে এই পথ বেছে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। একটা রিয়েলিটি শো’তে বিজয়ী হয়েছিল পূজা, তারপর মোহে পড়ে সে চলে এসেছিল গ্ল্যামারের কল্লজগতে। মডেলিংয়ের কাজ, সিরিয়ালে অভিনয় করতে-করতে বুঝেছে এই গ্ল্যামারের জগতে টিকে থাকতে গেলে অনেক কিছু করতে হয়, খুঁটির জোর অথবা ট্যালেন্ট ছাড়া এগোনো মুশকিল। পূজা বুঝে নিয়েছে তার ট্যালেন্ট অত কিছু নেই, কাজ করতে গেলে যে ধরনের ডিসিপ্লিনের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয় তারও অভাব রয়েছে তার। সুতরাং সহজ পথটা বেছে নিতে সে দ্বিধা করেনি কোনও।

পূজা বলেছিল, ‘আই নিড আ লাইফ। অ্যান্ড টু লিড আ লাইফ ইউ নিড মানি। দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। মেয়েদের জীবনে একজন বাবু থাকে। বাবু ধরে নিতে হয়। আমি মণিদাকে ধরে নিয়েছি, তুইও ধরে নে মণিদাকে। মণিদা খুব প্রোফেশনাল, তুই চাইলে আমি আলাপ করিয়ে দেব ভালো করে।’

তিতির জিগ্যেস করেছিল, ‘আমায় কী করতে হবে?’

সময় কাটাতে হবে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে। মেনলি কর্পোরেট ক্লায়েন্ট।

অনেকেই কলকাতার বাইরে থেকে আসে, তখন একজন মহিলার কোম্পানি খোঁজে। কোনও রিস্ক নেই। সময় কাটাবি, দরকার পড়লে শুবি। মণিদা তোর কাছে টাকা পৌঁছে দেবে। মাসে তিন-চারটে দিন, তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবি। তোর অরিন্দম মুখার্জি দেবে? ভেবে দেখিস।’

টাকা নিয়ে অত কিছু লোভ নেই তিতিরের। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর মা’র কাছে আর হাত পাতেনি, নতুন করে মা’র কাছে হাত না পাততে হলেই সে সম্ভুষ্ট থাকবে। তার পি জি অ্যাকোমোডেশনের টাকা, খাওয়াদাওয়া আর নেশার টাকাটা জোগাড় হলেই যথেষ্ট। নেশার টাকাটা অবশ্য এই মুহূর্তে খুব কম কিছু নয়, একটু-একটু করে যে জড়িয়ে পড়েছে অত্যন্ত দামি একটি নেশার সঙ্গে। এখনও পর্যন্ত মণিদা এর জোগান দিয়েছে, কিন্তু অচিরেই তা বন্ধ হবে যাবে। কোনও একদিন অরিন্দমের মতো মণিদাও বলে উঠবে, ‘দেয়ার আর নো ফ্রি লাক্সেস।’

পূজা বলেছিল, ‘তুই নিজেকে নিয়ে এত ভাবিস কেন রে? ভগবান তোকে শরীর দিয়েছে, সেই শরীরটাকে কাজে লাগা। তুই তো নিজের ইচ্ছেয় করছিস, এতে প্রবলেমটা কোথায় তোর? অনেকে তো মেয়েদের সঙ্গে জোর করেও করে। মেয়েদের অপমান করে। তোর ক্ষেত্রে সেরকম হবে না কখনও।’

তিতির চুপ করে ছিল। অপমান করার কথা তার মনে আছে ভালো করে। তার শরীরকে, তার চেতনাকে সর্বতোভাবে অপমান করেছিল অরিন্দম। তার ভালোলাগার সুযোগ নিয়ে। তিতির আর কারও কাছে নতুন করে অপমানিত হতে রাজি নয়। যে যা করবে নিজের ইচ্ছেতে করবে। নিজের কাজের পরিবর্তে সে টাকা নেবে নিজের ইচ্ছেয়।

পূজার কাছ থেকে এইটুকু শিখে নিতে অসুবিধে হয়নি তিতিরের। টাকা কামানোর নেশাও জীবনের অন্যতম নেশা হয়ে দাঁড়াতে পারে কারও কাছে। ওই নেশায় পা দিয়ে টাকা রোজগার করার কোনও পন্থাকেই খারাপ বলে মনে হয় না। বন্ধুর এটিএম কার্ডের থেকে টাকা তুলে নেওয়াও অন্যায় নয় পূজার কাছে। সে যে রুমির টাকা নিয়েছে তার পূজা নিজের থেকেই একদিন স্বীকার করেছিল তিতিরের কাছে। পূজার বক্তব্য, ‘কেউ যদি কেয়ারলেস হয়, আমি তার ফায়দা তুলব না কেন? আমার কাছে কারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনও দাম নেই।’

বিশ্বাস, অবিশ্বাস—ছোট থেকে এই দুটো শব্দ শুনে এসেছে তিতির। প্রত্যেকের জীবনে কেউ কেউ থাকে যাকে বিশ্বাস করতে হয়, অবিশ্বাস করলে ঠকতে হয় সারাজীবন। ভুল। মা'কে সে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই বিশ্বাসের মূল্য মা কোনওদিন দেয়নি। তিতিরের কথা না ভেবে মা নিজের সংসার ভেঙেছে, অন্য একজনের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। ছোটবেলা থেকে তিতির বাবাকে পায়নি, মা তার দিকে ফিরে দেখার সময় পায়নি কখনও, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস ক্রমে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরিন্দমকে ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছিল তিতিরের, তাকে বিশ্বাস করেছিল। অরিন্দমও তার বিশ্বাসের মূল্য দেয়নি।

পূজার কথায় তার দিকে তাকিয়ে তিতির মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারছি তুই কী বলছিস। আমাকে মণিদার সঙ্গে কথা বলিয়ে দে। টাকার দরকার আছে আমারও।'

বিকেল নাগাদ তিতির বুঝতে পারল আজ শুটিং শেষ হতে দেরি হবে। গত তিনদিন ধরে মধ্যমগ্রামের কাছে একটা নতুন গড়ে ওঠা স্টুডিওতে তিতিরদের রিয়েলিটি শো'র শুটিং শুরু হয়ে গেছে। প্রথম দুদিন শুটিং নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল, গতকাল থেকে রুটিনে পড়ে গেছে সব কিছু, আজকে শুটিং যথাসময়ে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হবে না, অরিন্দম নিজে শুটিং করতে ফ্লোরে এসে পৌঁছেছে প্রায় চার ঘণ্টা পরে। যে শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল দশটায়, তা শুরু করতে করতে দুটো বেজে গেছে। অরিন্দম এমনিতে খুব নিয়মনিষ্ঠ, আজ তার কোথায় একটা নেমস্তম্ভ ছিল বলে আসতে দেরি হয়ে গেছে।

তিতিরের হিসেবমতো আজকের শুটিং সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে প্যাক-আপ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে রাত এগারোটার আগে শুটিং শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সাড়ে চারটের সময়ে মাত্র একটা এপিসোডের শুটিং শেষ হয়েছে, এই শো-এর ডিরেক্টর প্রভঞ্জনদার আজ যেন শুটিং নিয়ে কোনও তাড়া নেই, একটা এপিসোড হয়ে যাওয়ার পরে মেক-আপ রুমে ঢুকে তিনি অরিন্দম আর রূপালির সঙ্গে গল্প-গুজবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিতিরের ভয়ানক রাগ হতে শুরু করেছে ভিতরে-ভিতরে।

সাড়ে পাঁচটা অবধি শুটিং শুরু হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। তিতির আর এই শো-এর অন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাঘব পরের এপিসোডে

যারা অংশ নেবে তাদের রেডি করে দিয়েছে। তাদের ফ্লোরে নিয়ে এসে পোজিশন মার্কিং করে দেওয়া হয়েছে, কে কীভাবে কথা বলবে কী পারফরম্যান্স করবে তার রিহাসার্সালও হয়ে গেছে। শুটিং শুরু করতে দেরি করার আর কোনও কারণ নেই, তবু শুটিং শুরু হচ্ছে না। অরিন্দম মুখার্জির এখন নাকি মুড নেই, একটু মেজাজ ঠিক না হলে তার নাকি শুটিং ফ্লোরে আসতে ইচ্ছে করছে না। সকলে অপেক্ষা করছে অরিন্দমের মুড ঠিক হওয়ার অপেক্ষায়।

তিতির আজ সকাল সাতটার সময়ে শুটিং ফ্লোরে এসেছে, এখন সন্দের মুখে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন এই শো-টার পিছনে সে ভয়ানকরকম খেটেছে, তার জন্য প্রোডাকশন কোম্পানির কেউ এসে তাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়নি। বরং সামান্য কোথায় কোনও ভুলত্রুটি হলেই কথা শুনতে হয়েছে তাকে। তিতির একটা জিনিস বুঝে গেছে, এই পেশায় ভালো কাজের ক্রেডিট নেওয়ার জন্য অনেক লোক আছে, কাজে কোথাও ভুল হলেই তার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় অন্য লোকের ওপর। আজ অরিন্দম দেরি করে এসেছে বলে কাজের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু অরিন্দমকে এ নিয়ে বলার কেউ নেই।

আজ বিকেল থেকে তিতিরের ক্লান্ত বোধ করার অন্য একটা কারণও আছে। কাল সন্ধ্যাবেলা সাতটার সময়ে শুটিং প্যাক-আপ হওয়ার অব্যবহিত পরেই মণিদার ফোন এসেছিল। মণিদার কথায় তাকে যেতে হয়েছিল আলিপুরে একটি কর্পোরেট কোম্পানির গেস্ট-হাউসে, ক্লায়েন্টের প্রয়োজন মেটাতে। সেখান থেকে বেরোতে বেরোতে রাত একটা হয়ে গেছিল, পিজি অ্যাকোমেডেশনে ফিরে অল্প ঘুমিয়েই সকালে উঠে তাকে আবার চলে আসতে হয়েছে এখানে। শুটিংয়ের জন্য গত কয়েকদিন মণিদার কাছে গিয়ে তার নেশার সামগ্রী সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি তিতির, তার নিজের স্টকে যা ছিল আজ সকালে শেষ হয়ে গেছে। আজ তার মণিদার কাছে যাওয়া প্রয়োজন, শরীর এই মুহূর্তে নেশা চাইছে, তার শরীরে অ্যাড্রিনালিনের। টান ধরতে শুরু করেছে, বিকেলের একটু পর থেকে। মণিদার কাছে গতকালের কাজের জন্য তিতির টাকাও পাবে। তা ছাড়া আজ দেবলীনা আর পূজারও আসার কথা মণিদার ওখানে, সারারাত ধরে বন্ধাবিহীন নেশার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। শুটিং করতে সে কারণে আর ভালো লাগছে না তিতিরের।

আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর তিতির বিরক্ত বোধ করতে শুরু করল। এই বিরক্তি অচিরেই রূপান্তরিত হল রাগে, তিতির রাঘবকে বলল, ‘আমার আর শুটিং করতে ভালো লাগছে না। ফালতু সময় নষ্ট করছে সকলে মিলে। আমি শুটিং করতে চাই না আর। তুই অনিমেষদাকে বলে দিস, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।’

তিতির ব্যবহারে রাঘব ঘাবড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করে বলল, ‘বেরিয়ে যাচ্ছিস মানে! শুটিং প্যাকআপ হয়নি এখনও। এই ভাবে চলে যাওয়া যায় না মাঝপথে।’

‘আই গিভ আ ড্যাম। এখানে কেউ প্রোফেশনাল নয়, আমরা শট রেডি করে বসে আছি, বাবুরা গল্প করছে মেক-আপ রুমে। আমি এইভাবে কাজ করব কেন?’

এই ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কয়েক বছর কাজ করা হয়ে গেছে রাঘবের, গত তিন বছর সে অনিমেষদার সহকারী হিসেবে কাজ করেছে, তার এখানকার কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে। সে তিতিরের অস্থিরতা দেখে প্রমাদ গুলল, তাড়াতাড়ি করে ফ্লোরে ডেকে নিয়ে এল অনিমেষদাকে।

অনিমেষদা এই প্রোগ্রামটার পরিচালক নয়, সে এই অনুষ্ঠানে রয়েছে ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্ট হিসেবে। তিতিরের কথায় বিরক্ত হয়ে অনিমেষদা বলল, ‘কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেখছি তোর কাজে কোনও মন নেই। যখন-তখন ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে যাস তুই, কোনও কাজ করতে বললে ঠিকমতো করিস না। কী হয়েছে কী তোর?’

মুখ গোঁজ করে তিতির বলল, ‘আমার কিছু হয়নি। আমার আজ অন্য জায়গায় যাওয়ার আছে, আমার নেমন্তন্ন আছে একজনের বাড়িতে। আমায় যেতে হবে।’

‘ওরকম হয় না। এই কাজের একটা নিয়ম আছে। প্যাক-আপ না হলে এইভাবে বাড়ি চলে যাওয়া যায় না। তোর যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে ফোন করে বলে দে তুই আজ আসতে পারবি না।’

তিতির তাকাল অনিমেষদার দিকে। ফোন করে পূজাকে জানানো যায় সে আজকের পার্টিতে আসতে পারছে না। জানানোই যায়, মণিদার থেকে টাকা সে পরে কালেক্ট করে নেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা অসম্ভব বলে মনে হল তিতিরের কাছে। তার নেশার উপকরণ ফুরিয়ে গেছে, ওই

উপকরণ জোগাড় না পর্যন্ত তার শান্তি নেই। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে শুরু করেছে, মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে, তাকে এখান থেকে বেরিয়ে মণিদার বাড়িতে যেতেই হবে। ওখানে সারা রাত উদ্দাম পার্টি হবে, সেই পার্টিতে যে করে হোক পৌঁছাতেই হবে তাকে।

‘আই ওয়ান্ট টু চেজ মাই হাই, ড্যামিট। শুটিংয়ে কী হল না হল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আই ওয়ান্ট মাই ব্লিস।’ নিজের মনে এই কথাগুলোর আওড়াল তিতির। মুখে বলল, ‘শুটিং প্যাক-আপ করতে দেরি হবে, তার জন্য আমি দায়ী নই অনিমেঘদা। আমার নেমন্তন্ন আছে, আমায় যেতে হবে। সকালে অরিন্দমদার নেমন্তন্ন ছিল বলে অরিন্দমদা আসতে দেরি করেছে, অরিন্দমদার জন্য আমি সাফার করতে পারব না। আই অ্যাম সরি।’

তিতিরের কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেল অনিমেঘদা! বলল, ‘তুই বাড়াবাড়ি করছিস তিতির। অরিন্দমদা এখানকার এক নম্বর স্টার, চ্যানেল এই প্রোগ্রামটা করছে অরিন্দমদা আছে বলে। তুই আমি এখানে কেউ না...’

তিতির বলল, ‘এই প্রোগ্রামটা আমার ডিজাইন করা। অরিন্দমদাকে এই প্রোগ্রামটা করার কথা আমি বলেছিলাম, তোমাদের কারও মাথায় আসেনি সেটা...’

অনিমেঘদার মুখে রাগের লাল রং ফুটে উঠতে শুরু করেছে এবারে। সাধারণত অনিমেঘদা ঠান্ডা মাথার মানুষ, এখন সে রাগে কাঁপতে শুরু করেছে থরথর করে। অনিমেঘদার গলার স্বর কয়েক ধাপ চড়ল এবারে, রীতিমতো ধমকের সুরে ত্রুদ্ধ গলায় অনিমেঘদা বলল, ‘তিতির।’

অনিমেঘদার ধমকানিতে তিতিরের গলার স্বরও তীক্ষ্ণ হল। অনিমেঘদা যতটা চিৎকার করেছিল তারও দ্বিগুণ চৈঁচাল সে। বলল, ‘কী তিতির? আমার ওপর চৈঁচাবে না একদম। আমার একটা সম্মান আছে, কোনও ফিল্মস্টারকে আমি কেয়ার করি না। আমার সঙ্গে একদম গলা তুলে কথা বলবে না, আমি কারও চাকর নই। কারও দয়ায় আমি কাজ করতে আসিনি এখানে।’

তিতিরের মুখটাও লাল হয়ে উঠেছে এবারে, ভিতরে-ভিতরে রাগ হতে শুরু করেছে ভয়ানকরকম। অনেক ছোটবেলায় তিতিরের রাগ হত এরকম, তখন সে রাগে জিনিসপত্র ছুড়ে ভাঙতে শুরু করত। এখন তার ইচ্ছে করছে সামনের চেয়ারটা ছুড়ে মারে অনিমেঘদার দিকে, তাতে তার রাগ

কমবে কিছুটা। তিতির চোখ বুজল, তার শরীরে অস্বাভাবিক কাঁপুনি হতে শুরু করেছে। কোনওরকমে হাত মুঠো করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল তিতির।

শুটিং ফ্লোরে এইরকম চেষ্টামেচি আগে কখনও হয়নি, প্রত্যেকে চুপ করে গেছে। রাঘব ভয় পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেঘদার পাশে, তার মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। অনিমেঘদা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, সে তিতিরের কাছ থেকে এইরকম ব্যবহার আশা করেনি।

চেষ্টামেচি শুনে মেক-আপ রুম থেকে ফ্লোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অরিন্দম। সে অনিমেঘদার সঙ্গে তিতিরের চেষ্টামেচি শুনেছে সম্ভবত। এখন অরিন্দম এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। প্রভঞ্জনদা আর রূপালিও চলে এসেছে ফ্লোরে, তারা এগোনোর সাহস পাচ্ছে না। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে স্থানুবৎ।

অরিন্দম এগিয়ে এসে অনিমেঘের পিঠে হাত রাখল। তিতিরের দিকে তাকালও না একবার। খুব শান্ত গলায় অনিমেঘকে বলল, ‘একে ছেড়ে দাও অনিমেঘ। বলে দাও কাল থেকে আর আসার দরকার নেই। এর কাজ করার অ্যাটিচুড নেই, একে দিয়ে আমাদের হবে না। ওর যা টাকা বাকি আছে কাল কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও ওর কাছে।’

তিতির আর কোনও কথা বলল না, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অরিন্দমের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের ব্যাগটা কাঁধে তুলে বেরিয়ে গেল শুটিং ফ্লোর থেকে।

২৩

একটু-একটু করে জ্ঞান ফিরছে তিতিরের। ছিন্নভিন্ন চেতনাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এদিক-ওদিক হারিয়ে ছিল, এখন সেগুলো সংস্কার হতে ক্রমে জোড়া লাগতে শুরু করেছে। তিতিরের মাথার মধ্যেটা অসহ্যরকম ব্যথা করছে, পেটের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে উপছে ভয়ানকরকম। তিতিরের গা গুলোচ্ছে ভীষণভাবে। মনে হচ্ছে পেটের মধ্যকার সব কিছু এফুনি বমি হয়ে উঠে আসবে। জল তেষ্ঠা পাচ্ছে তিতিরের, মনে হচ্ছে তার সারা গা জ্বরে পুড়ে যাবে।

চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল তিতির। চোখ খুলতেই জানলা দিয়ে এক রাশ আলো ঢুকে এসে তিতিরের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, যন্ত্রণায় সে চোখ কুঁচকাল আবার। তার মধ্যেই দেখতে পেল দুটি মুখ ঝুঁকে রয়েছে তার মুখের ওপর। একজন আবার গ্লাসে করে জল নিয়ে এসে মাঝে-মাঝেই তার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। তিতিরকে চোখ খুলতে দেখে একজনের মুখে স্বস্তির ভাব ফুটল। বলল, ‘যাক, জ্ঞান ফিরেছে।’

এই জায়গাটা কোথায় মনে করতে পারছে না তিতির! এই লোকগুলো কে তাও সে বুঝতে পারছে না। একটি লোক তিতিরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘কী হয়েছিল তোর? আত্মহত্যা করতে গেছিলি কেন? কী খেয়েছিস?’

তিতিরের এবার মনে পড়তে শুরু করেছে একটু-একটু। কাল সারারাত কোথায় ছিল সেই স্মৃতি একটু-একটু করে ফিরে আসতে শুরু করেছে। সে মণিদার কাছে গেছিল। অনেক অনেক নেশা করেছিল সারারাত ধরে। তারপর একটা সময়ে তার সবকিছু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছিল।

তিতির উঠে বসল ধড়মড় করে। তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল একটা সোফার ওপর, সোফায় উঠে বসার পর তিতির বুঝতে পারল সে এখন যেখানে রয়েছে সেটা পুলিশ স্টেশন। এই সোফাটায় বসে সে আগে অপেক্ষা করেছিল, সে এখানে আগে এসেছে রুমিকে সঙ্গে নিয়ে, তার টাকা চুরি দেওয়ার ডায়রি করতে।

তিতির চিন্তিত হল। সে তো মণিদার ফ্ল্যাটে ছিল কাল, এখন সে এই থানায় এসে পৌঁছল কী করে? তিতির পুনরায় তার স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল, এবং সেই সঙ্গে খেয়াল করল তার শরীরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট দানা পাকাচ্ছে পেটের মধ্যে, ক্রমে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করেছে তিতিরের, সে কষ্ট থেকে বাঁচতে ক্রমে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল।

তিতিরের মনে পড়ল অর্ক এই ব্যাপারটা নিয়েই তাকে সাবধান করে দিত বারবার। বলত নেশাটা বেশি করলে শরীরে কষ্ট হতে শুরু করে, তখন নেশা না করলে পাগল পাগল লাগতে থাকে। এটাকে উইদড্রয়াল সিন্ড্রোম বলে। এই অবস্থার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটাই উপায় আছে—দাঁতে আবার কিছুটা সাদা পাউডার ঘষে নেওয়া। তিতিরের সঙ্গেই ব্যাগে ওই বস্তুটা আছে, আরও রয়েছে মণিদার দেওয়া দশ হাজার টাকা।

তিতির এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্যাগটা খোঁজার চেষ্টা করল, দেখতে না পেয়ে হতাশভাবে বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালো লাগছে না। আমায় বাড়ি যেতে হবে।’

শক্ত মুখে পুলিশ অফিসার জিগ্যেস করলেন, ‘নাম কী তোমার? কোথায় থাকো তুমি?’

তিতির চুপ করে তাকিয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির মুখের দিকে। নিজের নাম বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারার আগেই তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল আবার। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল সোফায়। তার ভয়ানক পেট ব্যথা করছে, শক্ত করে নিজের পেট চেপে ধরে সারা শরীরে মোচড় দিতে লাগল তিতির।

কলকাতা শহরে ভোরের আলো ফুটেছে অল্প কিছুক্ষণ হল, থানার ভিতরের ঘর থেকে মাঝে-মাঝেই তিতিরের গোঙানির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে অফিসার-ইন-চার্জ মৃদুল মুখার্জির ঘরে। ঘন্টাখানেক আগে এই মৃদুলবাবুর জিপে করেই তিতিরকে নিয়ে আসা হয়েছিল থানায়। তিতির রাস্তায় আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ওসির জিপ দেখে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মৃদুলবাবুর মনে হয়েছিল মেয়েটি মাতাল কিংবা আত্মহত্যা করতে চাইছে।

তিতিরকে জোর করে জিপে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল থানাতে, জিপে আসতে-আসতে জ্ঞান হারিয়েছিল মেয়েটি। আজকাল কলকাতা শহরে মাতালদের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। কয়েকদিন আগেই মাতাল অবস্থায় গাড়ি নিয়ে বাইপাসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল একটি কমবয়সি মেয়ে। তিতিরকে সে কারণেই মৃদুলবাবু মাতাল ভেবেছিলেন, তার মুখে মদের গন্ধ না পেয়ে সে কারণে আশ্চর্য হয়েছিলেন একটু।

থানার সেকেন্ড অফিসার ঘরে এসে খবর দিলেন তিতিরের জ্ঞান ফিরেছে। সেকেন্ড অফিসার এই থানায় অনেকদিন আছে, তার নাম অমিত সমাদ্দার, থানার বড়বাবুর থেকে সে এই এলাকার সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত। মৃদুলবাবু খুব বেশিদিন এই থানায় আসেননি, এই অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হতে তাঁর এখনও কিছুদিন সময় লাগবে।

সেকেন্ড অফিসারের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে মৃদুলবাবু জিগ্যেস করলেন, ‘কিছু জিগ্যেস করতে পারলে? কেসটা কী বলো তো? ইমমরাল ট্র্যাফিক নয় তো? মেয়েটা অত রাতে কী করছিল রাস্তায়?’

অমিত সমাদ্দার মাথা নেড়ে বললেন, ‘না না সেক্স ওয়ার্কার নয়। তা হলে চিনতাম। এই এলাকায় ও সব নেই।’

‘মেয়েটাকে চেনেন নাকি? কোথায় থাকে?’

একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল অমিত। তারপর বলল, ‘এলাকার নয়। খুব সম্ভবত বেহালার। যতদূর মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আগে দেখেছি। এটিএম থেকে টাকা চুরি গেছে বলে থানায় ডায়রি করতে এসেছিল।’

‘হুম। খোঁজ নাও মেয়েটা কে। একটা জিডি করে রাখা যাক, নাকি? গড়বড়ের কেস কি না কে জানে!’

অমিত একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘একটা কথা বলব স্যার? মেয়েটার ব্যাপারে থানায় কোনও রেকর্ড রাখবেন না। এ ড্রাগ কেস মনে হচ্ছে, পাতাখোর। ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেসে আমাদের না ঢোকাই ভালো।’

অমিতের কথায় শিউরে উঠলেন মৃদুলবাবু। বছর দশেক আগে মধ্যমগ্রাম থানায় তিনি যখন পোস্টেড ছিলেন তখন একবার ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেসে ফেঁসে গেছিলেন মৃদুলবাবু। একটি বছর আঠেরোর ছেলেকে চুরির অভিযোগ থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশ তার নিয়মমতো কয়েক ঘা দিয়েছিল ছেলেটাকে, সেই সময়ে ছেলেটা উইদড্রয়াল সিনড্রোমে ভুগতে শুরু করে, তার শরীরে খিঁচ ধরতে শুরু করে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা তুলতে শুরু করে। মৃদুলবাবু ভেবেছিলেন ছেলেটা নাটক করছে, তাকে লক-আপেই বন্দি করে রেখে দিয়েছিলেন। অনেক রাতে দেওয়ালে মাথা ঠুঁকে ছেলেটা মারা যায়, পরের দিন পুলিশ লক-আপ থেকে তার মৃতদেহ বার করে। লক-আপে ওই ছেলেটার মৃত্যু নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। মানবাধিকার কমিশন পর্যন্ত গড়িয়েছিল বিষয়টা। তারপর থেকেই ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেস শুনলেই মৃদুলবাবু ঘাবড়ে যান।

মুখ শুকনো করে মৃদুলবাবু বললেন, ‘উরি বাবা রে। শিগগির বিদেয় করো মেয়েটাকে। এখানে না রাখাই ভালো। আর কোনও কিছু খাতায়-পত্রে তুলো না বাবা, এ সব কেসে আমি নেই...’

অমিত বলল, ‘হ্যাঁ স্যার। একটু সকাল হোক, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি সোনারপুরে। ওখানে একটা রিহাব সেন্টার আছে, আমাদের হেল্প করছে এর আগেও।’

‘তাই করো। যা করার তাড়াতাড়ি করো। আর যতক্ষণ না ওখান

থেকে কেউ আসে ততক্ষণ মেয়েটার দিকে নজর রেখো। দেওয়ালে মাথা-ফাতা ঠোকে না যেন।’

অন্য ঘরে তিতির তখনও শুয়ে ছিল সোফার ওপর। তার শরীরের যন্ত্রণা ইতিমধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, তার কণ্ঠ থেকে গোঙানির সঙ্গে মাঝে-মাঝেই নির্গত হচ্ছে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার। তিতিরের মুখ থেকে গাঁজলা উঠছে একটু-একটু, একবার সে মুখ ফিরিয়ে বমিও করেছে অজ্ঞাতসারে। ওই অবস্থায় দুজন মহিলা পুলিশ চেপে ধরে রয়েছে তিতিরকে, একজন মাঝে-মাঝে তার চোখ-মুখে জল দিচ্ছে। তিতির শুনতে পাচ্ছে তাকে ঘিরে কথাবার্তা হচ্ছে। কে একজন এখনই ডাক্তার ডাকার কথা বলছে, একজন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়ার কথা বলছে।

তিতিরের গতকাল রাতের কথা মনে পড়ছে অসংলগ্নভাবে। শুটিং থেকে বেরিয়ে সে সটান চলে এসেছিল মণিদার ফ্ল্যাটে, সেখানে তার নেশার বস্তু সংগ্রহ করে সে নিশ্চিত হয়েছিল। রাত বাড়ার পরে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল পূজা এবং দেবলীনা। আরও একটি মেয়ে ছিল, তাকে চেনে না তিতির, নাম জানার চেষ্টাও করেনি সে। অর্ক ছিল না পার্টিতে, কিন্তু চার-পাঁচটি ছেলে ছিল—তারাও নাকি মণিদার সঙ্গে এসকট হিসেবে কাজ করে। ওরা পান্না দিয়ে মদ এবং গাঁজা-চরস খাচ্ছিল, তিতির তার নিজের নেশাতেই বিভোর হয়ে ছিল।

পূজা তাকে বলছিল, ‘বেশি খাস না, ওডি হয়ে যাবে।’ ওডি কথাটার মানে জানে তিতির, কোকেনেরে নেশা ওভার-ডোজ হয়ে গেলে তাতে শরীরে প্রবলেম হয়, মানুষের নাকি হ্যালুসিনেশন হতে পারে, অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। খুব বেশি ওভার ডোজ হলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুও ঘটে যায় অনেক সময়ে। এ সবই তিতিরের জানা, তবু নেশায় বাঁধন টানতে ইচ্ছে হয়নি তিতিরের, পূজার সাবধানবাণী কানে তোলেনি সে।

এর আগেও একবার মণিদার ওখানে বাঁধনহারা পার্টিতে গেছিল তিতির, সেখানেই তার ভালো করে নেশার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এখন সে জীবনের অনেক ধাপ পেরিয়ে এসেছে, এখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে তিতিরের অসুবিধে হয় না। নেশা করতে করতে টিভি-তে ব্লু ফিল্ম দেখছিল সকলে মিলে, তার সঙ্গে পান্না দিয়ে চলছিল এর-ওর সঙ্গে শরীরের খেলা। ছেলেগুলোকে চেনে না তিতির, কিন্তু তাতে এখন তার

অসুবিধে হয় না, সে অনায়াসে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। টাকার বিনিময়ে করে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে, এখন করছিল নিজের সুখের প্রয়োজনে।

একটা সময়ে আস্তে-আস্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল সকলে, নেশার ঘোরে একে একে ঘুমিয়ে পড়ছিল, সেই সময়ে নিজের পোশাক ঠিক করে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল তিতির। মনে আছে, তার সঙ্গে তার ব্যাগটা ছিল, ওই ব্যাগটা সে আঁকড়ে রেখেছিল নিজের কাছে। ওই ব্যাগে তার নেশার মহার্ঘ্য বস্তুটা ছিল, ওটাকে হাতছাড়া করতে মন চায়নি তার।

গভীর রাতে কলকাতার রাস্তায় যানবাহন চলে না বিশেষ, ফাঁকা রাস্তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তিতির। সেই সময়ে তার বাবার কথা মনে পড়ে গেছিল হঠাৎ করে। তার বাবা মদের নেশায় আক্রান্ত ছিল, এইভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে বাবাকে একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মেরেছিল। আজ রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই, কোনও গাড়ি থাকলে তিতিরকেও সেই গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে চলে যেতে পারত।

এইরকম সময়েই সম্ভবত ব্যাগটা নিজের অজান্তে কোথাও ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তিতির। তার মনে হয়েছিল ওই ব্যাগের প্রয়োজন ফুরিয়েছে জীবনে। ওই ব্যাগের মধ্যে টাকা রয়েছে, তার নেশার বস্তুটাও রয়েছে— তা থাক। আর তা দরকার নেই তিতিরের। এখনই একটা গাড়ি এসে চাপা দিয়ে চলে যাবে তিতিরকে। তিতির মুক্তি পাবে সব কিছুর থেকে, তার সঙ্গে বাবার দেখা হবে আবার...

দূর থেকে আলো জ্বলে একটা গাড়ি আসছিল। ওই গাড়িটাকে দেখে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গেছিল তিতির। এই গাড়িটাকেই খুঁজছিল সে। এই গাড়িটারই আসার কথার ছিল তার কাছে। তাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় পিষে যেতে পারে এই গাড়িটা।

চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে গাড়ির হেডলাইটের আলোয়। হর্ন দিচ্ছে গাড়িটা তিতিরকে সরে যেতে বলছে। তিতির সরবে না কিছুতেই। সে হাত তুলে দৌড়ে গেল গাড়িটার দিকে। কাঁচ করে সজোরে ব্রেক কষে গাড়িটা থেমে গেল তিতিরের সামনে এসে।

অদ্ভুত শরীরের কষ্টের মধ্যেও থানার সোফায় শুয়ে গাড়ির ওই ব্রেকের আওয়াজ যেন স্পষ্ট শুনতে গেল তিতির। আওয়াজটা ভীষণ জোরে

বিঁধল তিতিরের কানে। যন্ত্রণায় তিতিরের মুখ কুঁচকে উঠল। দু-হাতে কান চাপা দিল সে।

২৪

অফিস যাওয়ার পথে ছোট একটা ডি-ট্যুর নিয়ে পৌঁছনো যায় তিতিরদের পেয়িং গেস্ট অ্যাপার্টমেন্টে। আজ অফিসে যাওয়ার সময়ে দেবারতি ওই পথ ধরল, ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল টালিগঞ্জ হয়ে তারপর অফিসের রাস্তা ধরতে। তিতিরকে নিয়ে গত চার-পাঁচদিন ধরে অস্বস্তি জমা হয়ে রয়েছে দেবারতির মনে, একবার তিতিরের সঙ্গে দেখা করে দেবারতি তার অস্বস্তি দূর করতে চায়।

গত কয়েক মাসে তিতিরের সঙ্গে দেবারতির দূরত্ব বেড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। শঙ্করলালের বাড়ি থেকে জোকার বাড়িতে ফিরে আসার পরে তিতির একবার মা'র সঙ্গে দেখাও করে গেছে। সপ্তাহে দু-তিনদিন ফোন করে কুশল সংবাদ আদানপ্রদানও ছিল মা ও মেয়ের মধ্যে। বেশিরভাগ সময়ে দেবারতিই ফোন করে তিতিরের খোঁজ নিত, একবার-দুবার তিতিরও ফোন করত মা'কে। দেবারতির মনে হয়েছিল, তিতিরের এই বাড়ি থেকে চলে গিয়ে একা থাকাটা এক পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে। তিতির স্বাবলম্বী হয়েছে এখন, সেই সঙ্গে আলাদা থাকার ফলে মা ও মেয়ের সম্পর্কটাও আন্তে-আন্তে ভালো হয়ে উঠতে শুরু করছিল।

গত চার-পাঁচদিন ধরে তিতিরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি দেবারতির। তার মনে অস্বস্তি জমা হওয়ার সেটাই কারণ। পরশু থেকে তিতিরকে ফোনে বহুবার ধরার চেষ্টা করেছে দেবারতি, প্রত্যেকবারই দেখেছে তার সেলফোন বন্ধ। গত দুদিন ধরে ফোন বন্ধ করে রেখে তিতির কী করছে তা মাথায় ঢুকছে না দেবারতির! হাজার কাজের মধ্যে থাকলেও আজকের যুগে কেউ নিজের ফোন বন্ধ করে রাখে না। হঠাৎ করে শরীর টরির খারাপ হল না তো মেয়েটার?

আগের বার যখন তিতিরদের পিজ্জি অ্যাকোমোডেশনের ফ্ল্যাটে এসেছিল দেবারতি, তখন তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে বেশ পরিশ্রম করতে

হয়েছিল। এই এলাকায় ঠিকানা একটু এলোমেলো, এখানে বাড়ির নম্বর থেকে একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়। আজকে সেই পরিশ্রমটুকু করতে হল না দেবারতিকে, গলিতে ঢুকে তিতিরদের ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে নেমে ড্রাইভারকে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে দেবারতি এগিয়ে গেল তিতিরদের ফ্ল্যাটটার দিকে।

বেল বাজানোর অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে, তাকে আগের দিন দেখেনি দেবারতি। মেয়েটা প্রসাধনে ব্যস্ত, তার সারা মুখে সবুজ রঙের ফেস প্যাক লাগানো। ফেস-প্যাক লাগানো অবস্থায় কেউ কথা বলতে চায় না, তা সত্ত্বেও দেবারতি জিগ্যেস করল, 'তিতির আছে? আমি তিতিরের মা, ওর খোঁজ নিতে এসেছি।'

মেয়েটা কথা বলল না, শুধু মাথা নেড়ে জানাল তিতির নেই।
'রুমি আছে কি?'

পুনরায় মাথা নাড়ল মেয়েটা, জানিয়ে দিল রুমিও এখানে নেই।

'বাড়িতে আর কেউ কি আছে? যার সঙ্গে কথা বলা যায় তিতির কোথায় জানো কিছু? ওর ফোন বন্ধ রয়েছে কেন? রুমিই বা কোথায়, ওরও ফোন পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

ফেস-প্যাক লাগানো মেয়েটাকে এবার কথা বলতেই হল। এত সব কথার উত্তর মাথা নেড়ে দেওয়া যায় না। মেয়েটা অল্প করে মুখ খুলে সরু মুখ করে জানাল তিতির গত তিনদিন এখানে ফেরেনি, কারও সঙ্গে যোগাযোগও করেনি। রুমি কলকাতায় নেই, সে তার মা'র কাছে গুয়াহাটিতে গেছে।

তিতির তিনদিন বাড়ি ফেরেনি শুনে দেবারতি অবাক হল! জিগ্যেস করল, 'ওর জিনিসপত্র কোথায়?'

'সে সব এখানে আছে। নিয়ে যায়নি কিছু।'

দেবারতির ভুরু কুঁচকে উঠেছে দেখে মেয়েটা আবার বলল, 'চিন্তা করার কিছু নেই আন্টি। ও মাঝে-মাঝেই ফেরে না বাড়ি। শুটিংয়ের কাজে বাইরে যেতে হয়, অনেক সময়ে অফিসেই রাত কাটায়।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দেবারতি একবার অরিন্দম মুখার্জির প্রোডাকশন অফিসে তিতিরের খোঁজ নিয়ে যাবে কি না ভাবল। দেবারতি জানে তিতির সেখানে কাজ করে। যদিও ওই প্রোডাকশন কোম্পানির অফিসটা কোথায় তা জানা নেই দেবারতির। সেটা অবশ্য খুঁজে বার

করা খুব শক্ত কিছু নয়। নন্দিতাকে ফোন করেই ওই অফিসটা কোথায় সেটা জেনে নেওয়া যায়। নন্দিতাকে তিতিরের খোঁজ নেওয়ার কথাও বলা যায়।

নন্দিতা অবশ্য জানে না তিতির অরিন্দমের অফিসে কাজ করে। নন্দিতার সঙ্গে এখন বেশ হৃদয়তা আছে দেবারতির, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের মেয়ে কোথায় কাজ করে তা তাকে জানাতে চায়নি দেবারতি। তিতির নিজের এলেমে নিজে নিজেই প্রোডাকশন কোম্পানিতে চাকরি জুটিয়েছে, নন্দিতাকে তার বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো। তিতির তার মা'র সাহায্যপ্রার্থী নয়, নন্দিতাকে তার সম্পর্কে দেবারতি কিছু বলেছে শুনলে তিতির রেগে যেতে পারে। নন্দিতারও মনে হতে পারে নিজের মেয়েকে বাড়তি সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো দেবারতি তিতিরের কথা নন্দিতাকে বলছে। নন্দিতাকে এরকম কিছু ধারণা দিতে চায় না দেবারতি।

গাড়িতে করে অফিসে যেতে যেতে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে শুরু করল দেবারতি। তিতিরকে নিয়ে এখনই উদ্বেগ করার কিছু নেই, সে হয়তো কলকাতার বাইরে শুটিং করতে গেছে। তিতির বলেছিল তাকে কলকাতার বাইরে শুটিং করতে যেতে হতে পারে, এখন হয়তো সেই কাজটা পড়েছে। হঠাৎ করে কাজ ঠিক হয়েছে হয়তো, কলকাতা ছাড়ার আগে কাউকে বলে যাওয়ার সময় পায়নি। দেবারতি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, রাজ্যের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও সেলফোনের সিগনাল পাওয়া যায় না। তিতিররা হয়তো শুটিং করতে সেরকম কোনও জায়গায় গেছে, সে কারণে তার ফোন বন্ধ করা আছে।

তিতিরের ব্যাপারে নন্দিতাকে এখনই কিছু জিগ্যেস করার মানে হয় না। শঙ্করলালকেও এ ব্যাপারে জানানোর কিছু নেই। শঙ্করলালের আজকাল সব কিছু নিয়ে টেনশন করার বাতিক হয়েছে, তিতিরকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে হয়তো হুলস্থলু লাগিয়ে দেবে, পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের ফোন করতে শুরু করবে তিতিরকে খুঁজে দেওয়ার জন্য। শঙ্করলাল কয়েকমাস আগে একটা বড় ধাক্কা কাটিয়ে উঠিয়েছে, এখন অকারণে টেনশন করা অনুচিত হবে।

গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল দেবারতি। তিতিরকে নিয়ে চিন্তা করবে না এমন সিদ্ধান্ত নিলেও অস্বস্তিটা দূর করা

যাচ্ছে না কিছুতেই। হালকা একটা খচখচানি রয়েই যাচ্ছে মনের ভিতরে।

দেবারতি যে সময়ে তিতিরের কথা ভাবতে ভাবতে অফিস যাচ্ছিল, সেই সময়ে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল তিতির। পুলিশ স্টেশন থেকে দুদিন আগে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সোনারপুরের ড্রাগ-অ্যাডিক্ট রিহাবিলিটেশন সেন্টারে, এখানে গত দুদিন তাকে সেডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। মরার মতো পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে তিতির, তাকে কোনওরকমে অল্প করে তরল খাদ্য খাইয়ে দিয়েছে এখানকার নার্সরা। এই দুদিনে তার রক্ত পরীক্ষা সমেত ডাক্তারি পরীক্ষাও করানো হয়েছে, ভাগ্যক্রমে কোনও পরীক্ষাতেই দোষের কিছু পাওয়া যায়নি।

তিতির ঘুম ভেঙেছে খবর পেয়ে তিতিরকে দেখতে এল নন্দিতা। তিতিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘কেমন আছো এখন?’

এই মহিলাকে আগে কোথাও দেখেছে তিতির, কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না তার! এই মহিলার চেহারা অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব আছে, এর দিকে তাকালে আপনা হতেই এক ধরনের শ্রদ্ধার ভাব তৈরি হয় মনের মধ্যে। তিতির বলল, ‘মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে আমার।’

‘আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ড্রাগ উইদড্রয়াল আছে তোমার, পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগবে তোমার।’

তিতির মাথা নাড়ল। জিগ্যেস করল ‘এটা কি হাসপাতাল?’

নন্দিতা হেসে বলল, ‘হাসপাতাল নয়। এটা রিহাব সেন্টার। যারা নেশা করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য এখানে এই হোমটা আমরা তৈরি করেছি। এখানে থাকবে নিজের মতো করে, ভালো করে খাওয়াদাওয়া করবে। আস্তে আস্তে সেরে উঠবে তুমি। তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায় তোমার? সুইসাইড করতে যাচ্ছিলে কেন?’

তিতির নিজের বাড়ির কথাটা বলল না, শুধু বলল, ‘আমার নাম তিতির। আমি খুব নেশা করেছিলাম, সুইসাইড করতে যাচ্ছিলাম কি না তাই আমার মনে নেই এখন।’

তিতির যে নিজের পরিচয় দিল না সেটা লক্ষ করল নন্দিতা, কিন্তু কিছু বলল না। এই বয়সে নেশার পাল্লায় পরে অজ্ঞাতকুলশীল যাদের পুলিশ এখানে নিয়ে আসে, তারা অনেকেই নিজের পরিচয় দিতে চায় না প্রথমে। অ্যাডিক্টরা অনেক সময়েই অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না, সব সময়ে সন্দেহবাতিকে ভোগে। একটা পর্যায়ের পরে অবশ্য এই

সমস্যাটা চলে যায়, তখন নিজের থেকেই তারা কথা বলতে শুরু করে।

অল্প হেসে তিতিরের মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বলল, 'তিতির, তোমার বয়স কত? কুড়ি-একুশ হবে, তাই না? তোমার সামনে আস্ত একটা জীবন পড়ে আছে, এই সময়ে নেশায় জড়িয়ে পড়া কি ঠিক? অ্যাডিকশন একটা মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয়, তুমি কি নিজের জীবনটা নষ্ট করতে চাও?'

তিতিরের বাবার কথা মনে পড়ল হঠাৎ করে। মা বলত তার বাবার মধ্যে নাকি অনেক কিছু করার ক্ষমতা ছিল, স্রেফ নেশা করে করে মানুষটা ফুরিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। তিতিরের মধ্যেও অনেক সম্ভাবনা আছে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় না বাবার মতো। তা ছাড়া, মা বেঁচে থাকতে সে মরেও যেতে চায় না। মা তাকে যতই বকুক, তিতির জানে মা তাকে খুব ভালোবাসে, সে মরে গেলে মা খুব দুঃখ পাবে।

সে করুণ মুখে তাকাল নন্দিতার দিকে। বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে চাই'

নন্দিতা তিতিরের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'এই অ্যাটিচুডটা রেখো। অ্যাডিকশন থেকে ফিরে আসা যায়, সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করবে। তোমাকে একজন বিখ্যাত মানুষের গল্প বলব, শুনবে তুমি?'

তিতির মাথা নেড়ে জানাল সে শুনবে। তারপর তার সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে নন্দিতার মুখের দিকে তাকাল। নন্দিতা শুরু করল এক বিখ্যাত মানুষের গল্প। বহু বছর আগে সে তত বিখ্যাত ছিল না। মদের নেশায় আক্রান্ত হয়ে সে নিজের জীবনটা জলাঞ্জলি দিতে বসেছিল, আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল নিজেকে। তারপর নিজের চেষ্টায় সেই লোকটা কেমন করে ঘুরে দাঁড়াল, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। হয়ে উঠল জনপ্রিয় অভিনেতা।

এই গল্পটা নন্দিতা বহুবার বলেছে। যে কারও অ্যাডিকশনের চিকিৎসার সূচনা পর্বে এই গল্পটা বলে থাকে নন্দিতা। এই গল্পটা শুনলে পেশেন্টদের মন ভালো হয়, তাদেরও মনে হয় সেও পারবে এই নেশার অ্যাডিকশন থেকে বেরিয়ে আসতে।

অন্যদের মতো তিতিরও মন দিয়ে শুনল ওই বিখ্যাত মানুষের গল্পটা। তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

‘অরিন্দম মুখার্জি। বাংলা সিনেমার সুপারস্টার। ও যে অ্যাডিকশন থেকে এইভাবে ফিরে এসেছিল সে কথা জানতে তুমি? তুমি চেষ্টা করলে তুমিও পারবে।’

বড়-বড় চোখ মেলে তিতির তাকাল নন্দিতার দিকে। জিগ্যেস করল, ‘আপনি অরিন্দম মুখার্জির কথা জানলেন কী করে?’

নন্দিতা হাসল, ‘আমি জানাব না? অরিন্দম আমার হাজব্যান্ড। ওর সব কথা আমি জানি।’

তিতিরের মনে পড়েছে এবারে। নন্দিতাকে কেন তার চেনা চেনা লেগেছিল। অরিন্দমের ফিল্মের পার্টিতে নন্দিতাকে দেখেছিল সে। পার্টির ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নন্দিতা অরেঞ্জ জুস খাচ্ছিল একা একা। এই মহিলা তার মানে শঙ্করলালবাবুর মেয়ে। অরিন্দম মুখার্জি যে শঙ্করলালের জামাই, তা তিতির জানেন। কিন্তু সে যে শঙ্করলালকে চেনে এই কথাটা তিতির ঘুগাফুরেও কাউকে বলেনি। অরিন্দমকেও নয়। শঙ্করলালের কথা সে বাইরে কখনও বলে না। একমাত্র রুমি শঙ্করলালের কথা জানে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তিতির তাকিয়ে রইল নন্দিতার দিকে। তারপর বলল, ‘আপনি ঠিক বলছেন না সম্ভবত। অরিন্দম মুখার্জির সব কথা আপনি জানেন না, জানা সম্ভব নয়।’

নন্দিতা হাসল তিতিরের দিকে তাকিয়ে। ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের অনেক সময়ে কথাবার্তার ঠিক থাকে না, সে কারণে নন্দিতার হাসিতে প্রচ্ছন্ন প্রশ্নয় প্রকাশ পেল হয়তো বা। স্নেহের সুরে নন্দিতা বলল, ‘তাই নাকি? তুমি অরিন্দমকে চেনো নাকি?’

তিতির বলল, ‘চিনি। আমার এই অবস্থার জন্য অরিন্দমও অনেকটা দায়ী।’

এবার অবাক হল নন্দিতা। জিগ্যেস করল, ‘মানে? কী হয়েছিল তোমার? অরিন্দম কী করেছে তোমার সঙ্গে?’

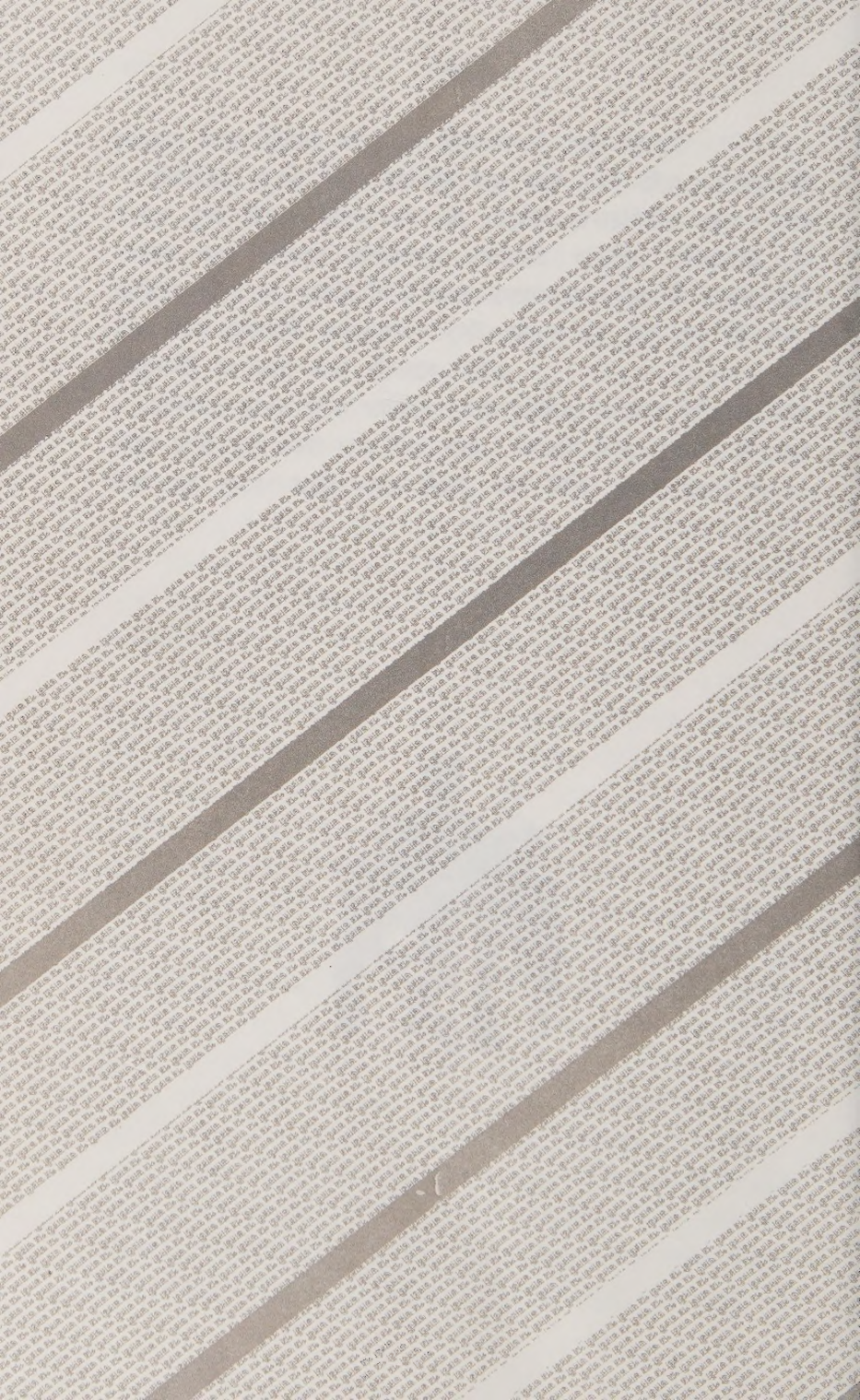
তিতির মাথা নাড়ল। অস্ফুটে বলল, কী করবেন শুনে? আপনি আমাকে বরং আমাকে একটা হেল্প করুন। আমার মা’র নাম দেবারতি রায়, তিনি স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসার। আপনি হয়তো চিনবেন আমার মা’কে। মা’কে একটা ফোন করুন, বলুন আমি আপনার এখানে আছি। মা আমার জন্য চিন্তা করছে নিশ্চয়। মা’কে ফোনে না পেলো আপনার

বাবাকে খবর দিলেও হবে, মা ঠিক খবর পেয়ে যাবো।’

তিতির মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নন্দিতা। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। এই মেয়েটা দেবারতিদির মেয়ে? তার মেয়ের কথা একবার কথাপ্রসঙ্গে দেবারতি বলেছিল নন্দিতাকে, সে বাড়িতে থাকে না। একটা পিজি অ্যাকোমোডেশনে থেকে কী একটা কাজ করে বলে দেবারতি জানিয়েছিল। সেই মেয়ের এই হাল হল কী করে! অরিন্দমই বা তার জন্য কীভাবে দায়ী?

নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল তিতি। তারপর নন্দিতার ধরে থাকা হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে বলল, ‘আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সেরে উঠব, কথা দিচ্ছি আপনাকে...।’





RESERVE

REMOVE TO



TORONTO
PUBLIC
LIBRARY



37131 168 128 338

জন্ম ২৯ মে ১৯৬৩, কলকাতায়।
পড়াশুনো সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল ও
প্রেসিডেন্সি কলেজ। কর্মজীবন শুরু করেন
সরকারি ব্যাঙ্কের প্রোবেশনারি অফিসার
হিসেবে। সেই চাকরি ভালো না লাগায়
আনন্দবাজার পত্রিকায় শিক্ষানবিশ
সাংবাদিক হিসেবে কাজে যোগ দেন।
সাংবাদিকতা করেছেন দীর্ঘদিন। এখনও
তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত।
২০০১ সালে চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি
ছবির জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম
ছবি ‘এক যে আছে কন্যা’। লেখালেখি
শুরু ছোটবেলায়। সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত
সন্দেশ পত্রিকায়। প্রথম ছোট গল্প
প্রকাশিত হয় সমরেশ বসু সম্পাদিত
মহানগর পত্রিকায়। ক্রমশ কাজের চাপে
লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়।
নতুন করে আবার লিখতে শুরু করেন
২০০৮ সালে। ওই সময় থেকে তাঁর
ছোট গল্প দেশ, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার,
সানন্দা, উনিশ কুড়ি, রবি প্রভৃতি
পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেতে শুরু করে।
প্রথম উপন্যাস ‘যৌবন যাপন’। ‘ছায়ানট’
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল
সানন্দা-তে।

প্রচ্ছদ শুভ্রনীল ঘোষ

সফল অভিনেতা অরিন্দম আর নন্দিতার সুখী পরিবারে
একমাত্র হতাশা—সন্তানহীনতা।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বিজ্ঞানী দেবারতির সঙ্গে
নন্দিতার বাবা রাজনীতিক শঙ্করলালের
ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

দেবারতির মেয়ে তিতির যা একেবারেই মেনে নিতে
পারে না। সে বাঁপ দেয় গ্ল্যামার-দুনিয়ার
অন্ধকার জগতে।

অরিন্দমের টার্গেট এখন যুবতী তিতির।
তারপর ?...

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হবে
রোম্যান্টিক থ্রিলার

ছায়ানট



9 788183 742610

www.bookspatrabharati.com

T2-BIF-296